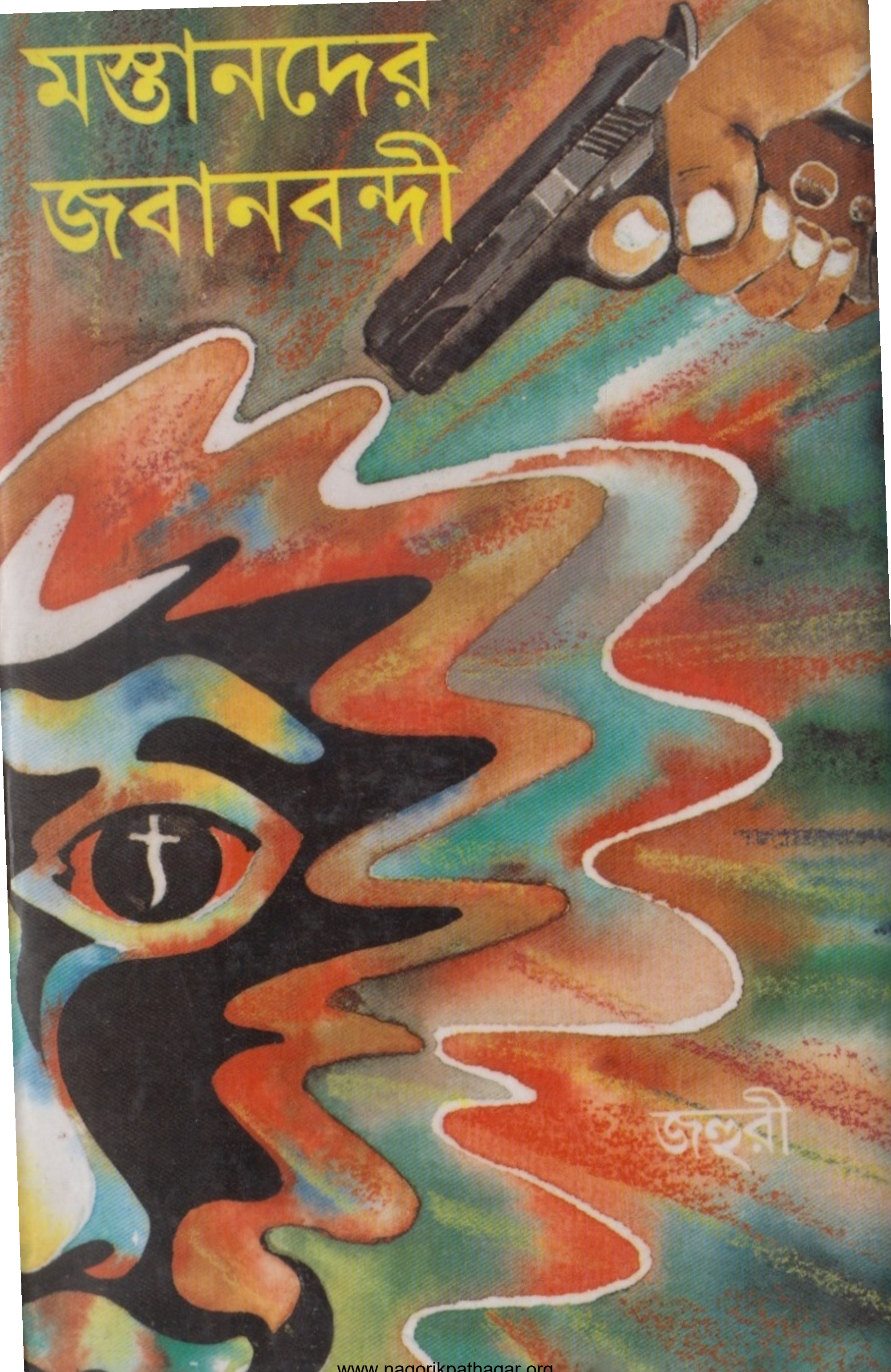

www.nagorikpathagar.org

মস্তানদের জবানবন্দী

জহুরী

আল হেরা প্রকাশনী

www.nagorikpathagar.org

— মস্তানদের জবানবন্দী —

প্রকাশনায়
আল হেরা প্রকাশনী
২/৩, প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
জুমাদাস্‌সানী-১৪১৪ হিজরী
অগ্রহায়ণ-১৪০০ বাংলা
নভেম্বর-১৯৯৩ ইংরেজী

কম্পিউটার কম্পোজ
এম-এস কম্পিউটার
৪৭৪/ক-১৫, ডিআইটি রোড,
মালিবাগ, ঢাকা-১২১৯

মুদ্রণ
আফতাব প্রেস
তনুগঞ্জ, সূত্রাপুর, ঢাকা

প্রচ্ছদ অংকণে
হামিদুল ইসলাম

মূল্যঃ সাদা ঃ ৭০.০০ টাকা
নিউজঃ ৪৫.০০ টাকা

পরিবেশনায়
মদীনা পাবলিকেশন্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আশা বুক কর্ণার
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রফেসার্স বুক কর্নার
১৯১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রীতি প্রকাশন
১৯১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

আজাদ বুক্‌স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

একাডেমী লাইব্রেরী
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম

আল আমিন লাইব্রেরী
কুদরত উল্লাহ্‌ মার্কেট, সিলেট

ইসলামীয়া লাইব্রেরী
সাহেব বাজার, রাজশাহী

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

www.nagorikpathagar.org

কাওসার

বোরহান

শিরীণ

ফয়সল

মস্তান—ভাইরাসে আক্রান্ত সমাজ—পরিবেশে তোমাদের নিষ্কলুষ জীবন যাপন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার করুণা ছাড়া আর কিছু নয়। দুনিয়ার জিন্দেগীর বাকি দিনগুলোতেও রহমানুর রহিম যেন তোমাদের এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন, তাঁর দরবারে আমার এই মোনাজাত। এ আশা নিয়ে মস্তানদের জবানবন্দী তোমাদের হাতে তুলে দিলাম।

তোমাদেরই আব্বা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

প্রকাশক হিসাবে কিছু কথা বলতে হয়, তাই আমার এ বলা। জহুরী সাহেবের (১) অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (২) খবরের খবর–এই দু'খানা পুস্তক প্রকাশের পর মস্তানদের জবানবন্দী প্রকাশ করলাম। তাঁর বইয়ের পাঠক–প্রিয়তা সম্পর্কে নতুন করে আমার বলার কিছুই নেই।

মস্তানদের জবানবন্দী প্রকাশের আগে আমি পান্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়েছি। পড়ার পর এই পুস্তক প্রকাশের প্রবল আগ্রহ আমার জাগে এবং এই পুস্তক আমার দ্বারা প্রকাশিত হোক, এই ইচ্ছাও লেখক প্রকাশ করেন।

আমি পাণ্ডুলিপি পাঠ করে যে কথা বুঝেছি, তাহলো এই, পুস্তকখানা মস্তানদের বিপক্ষে নয় বরং পক্ষে। আলোচনার বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেখক মস্তানদের অধঃপতনের জন্য সমাজ ও রাষ্টকে দায়ী করেছেন, কোন মস্তানকে দায়ী করেননি। মস্তানদের কথাকে নিজের ভাষায় দরদের সাথে ফুটিয়ে তোলেছেন তিনি। লেখক বলেছেন, ''মায়ের গর্ভ থেকে কেউ মস্তান হয়ে জন্ম নেয়নি, আমাদের গড়া সমাজে যারা মস্তান হয়েছে, এজন্য দায়ী ও অপরাধী আমরা, যারা এই সমাজ গড়েছি।'' লেখকের এই বক্তব্যের সংগে আমি সম্পূর্ণ একমত। আপনারাও হয়তো দ্বিমত পোষণ করবেন না।

মস্তানদের জবানবন্দী মস্তানদের আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রামাণ্য দলিল। এ পর্যন্ত যারা মস্তানদের নিয়ে যত লেখালেখি করেছেন, প্রায় সবাই লিখেছেন মস্তানদের বিপক্ষে, কিন্তু মস্তানদেরও বক্তব্য থাকতে পারে, এমন চিন্তাও অধিকাংশ লেখক করেন নি। এদিক দিয়ে জনাব জহুরীর মস্তানদের জবানবন্দী এক ব্যতিক্রম পুস্তক। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে বাজারে এটাই প্রথম পুস্তক।

সকল পাঠক পাঠিকাকে পুস্তকখানা পাঠ করার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

ফারুক আহমদ

আল হেরা প্রকাশনী

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। মস্তানদের জবানবন্দী প্রকাশিত হলো। মুখবন্ধে আমার যে বক্তব্য থাকার কথা, তা পুস্তকের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এসেছে। তাই চর্বিত চর্বণ থেকে বিরত থাকলাম।

গোটা পুস্তকের সারমর্মের সার কথাটি হলো এই, মায়ের গর্ভ থেকে কেউ মস্তান হয়ে জন্ম নেয় না। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশই অনেককে মস্তান বানায়। আমরা আজ যাদের মস্তান হিসাবে দেখছি, তাদের প্রত্যেকেই মুরব্বীদের সৃষ্ট পরিবেশের শিকার। এই স্বীকৃত সত্য ও বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই এ পুস্তক রচনা।

১৯৭২ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত আমাদের যে সমাজ পরিবেশ, তারই চিত্রায়ন হচ্ছে মস্তানদের জবানবন্দী। মস্তানদের বিভিন্ন মস্তানী কর্মকাণ্ডের নির্ঘন্ট নয় এই পুস্তক। কে কিভাবে কোন পরিবেশে মস্তান জীবনে প্রবেশ করে, এমন দশজন মস্তানের জবানবন্দী নিয়ে রচিত এই পুস্তক। কেউ কেউ প্রশ্ন রাখতে পারেন, মস্তানরা সমাজে কি কি উৎপাত উপদ্রব করে, সেসব ঘটনাবলী এই পুস্তকে নেই কেন? আমি আগেই বলেছি, এ কোন ঘটনা–নির্ঘন্টের পুস্তক নয়; মস্তানরা কি কি কর্ম করে, তা প্রতিদিনের পত্র পত্রিকায় আমরা পাঠ করি এবং স্বচক্ষে দেখে থাকি আর স্ব কর্ণে শুনেও থাকি। এজন্য আমি ঘটনার দিকে যাইনি।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নেয়া দেড় শতাধিক মস্তানের জবানবন্দী থেকে মাত্র ১০জনের সাক্ষাৎকার পেশ করেছি। মস্তানরা আমাদের সন্তান। আমরা সমাজকে যেভাবে গড়ে তোলেছি, তারা সেই গড়ে তোলা সমাজের ফসল। এ ফসল যদি খারাপ ভাবি, তাহলে ফসলের উৎপাদকরাই যে দায়ী, ফসল নয়, এসত্যকে আমাদের স্বীকার করতে হবে। রোগাক্রান্ত সন্তানের প্রতি পিতার যে দরদ থাকে, আমি সেই দরদী পিতার মন নিয়ে তাদের দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতার কথা তোলে ধরেছি।

পুস্তকে উল্লেখিত একটি জবানবন্দীও কাল্পনিক নয়, আমার এ কথায় আপনারা পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। এই পুস্তকে আমি কোন মস্তানের নাম উল্লেখ করিনি।

www.nagorikpathagar.org

পুস্তকখানা পাঠ করে কার কেমন লাগবে, তা আমি জানিনা, তবে এই পুস্তক রচনা করতে গিয়ে আমাকে অনেক মেহনত করতে হয়েছে, এমনকি জীবনের ঝুঁকিও নিতে হয়েছে।

আমাদের সমাজ মস্তান-মুক্ত হোক, মস্তান উৎপাদনের কারখানা ও ইনষ্টিটিউশনগুলো বন্ধ হোক, মস্তান রিক্রুটকারী ও লালন পোষণকারীদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে পুস্তকখানা সর্বস্তরের পাঠক পাঠিকার হাতে তুলে দিলাম।

এই পুস্তক প্রকাশে আমি বিশেষভাবে ঋণী হয়ে পড়েছি বন্ধুবর জনাব আবু নঈম, আমার সহকারী আব্দুল ওয়াহেদ খান, মোস্তাফিজুর রহমান, এম-এস কম্পিউটারের জনাব মোহাম্মদ শহীদুর রহমান ও মোহাম্মদ নজিবুর রহমান (কামাল) এর কাছে। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হতো কিনা তাতে সন্দেহ আছে। প্রকাশক জনাব ফারুক আহমদের কাছে তো অবশ্য কৃতজ্ঞ।

রাব্বুল আলামীনের কাছে আমার মোনাজাতঃ হে পরোওয়ারদেগার, এই বান্দার মেহনত আপনি কবুল করুন।

জহুরী

স্থায়ী ঠিকানাঃ
গ্রাম ও ডাকঘরঃ কদমরসুল
থানাঃ গোলাপগঞ্জ
জেলাঃ সিলেট

বর্তমান ঠিকানাঃ
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

www.nagorikpathagar.org

লেখকের প্রকাশিত বই

১। অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (তৃতীয় মুদ্রণ)

২। জহুরীর জাক্সিল (পহেলা বালাম) দ্বিতীয় মুদ্রণ

৩। ধূম্রজালে মৌলবাদ

৪। খবরের খবর

৫। প্রেস্টিজ কনসার্ণাড (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

৬। তিরিশ লাখের তেলেসমাত

৭। মস্তানদের জবানবন্দী

প্রকাশের অপেক্ষায়

১। ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন

২। জহুরীর জাক্সিল (দোসরা বালাম)

৩। আদব আলীর বেআদবী মাফ করবেন

www.nagorikpathagar.org

— সূচী—

প্রথম ভাগ

এই জবানবন্দী তাদের উদ্দেশ্যে পেশ করছি — ১১
মস্তান শব্দের উৎপত্তি ও আদি পরিচিতি — ১২
স্বাধীনতা—উত্তর বাংলাদেশে মস্তানদের উদ্ভব — ১৪
মস্তানদের শ্রেণীবিভাগ — ১৬
মস্তানী এক ধরনের ব্যবসা — ১৭
মস্তান ক্ষমতা—কেন্দ্রের কাছাকাছি — ১৯
মস্তান চক্রের সংগঠন — ২১
মস্তান ঃ অবৈধ স্বার্থচক্র — ২৩
মস্তানদের উত্থান পর্ব — ২৫
কোথাও প্রতিরোধ নেই — ২৯
সংসদেও মস্তান — ৩০
মস্তানদের ঠিকানা — ৩২
'আমি' সর্বানামের মুখোশে — ৩৪
'আমরা' বনাম 'আপনারা' — ৩৮
মস্তানদের মনের কথা — ৩৮
জবানবন্দীর পূর্ব কথা — ৪১
কেন এই জবানবন্দী? — ৪৪

দ্বিতীয় ভাগ ঃ জবানবন্দী

অশ্লীল পত্রিকা আমাকে মস্তান বানিয়েছে — ৪৭
রাজনীতি আমাকে মস্তান বানিয়েছে — ৭০
ভিসিআর আমাকে মস্তান বানিয়েছে — ৮৫
পতিতালয় আমাকে মস্তান বানিয়েছে — ৯৯
টেলিভিশন আমাকে মস্তান বানিয়েছে — ১১০
রূপসীরা আমাকে মস্তান বানিয়েছে — ১২১
সিনেমা আমাকে মস্তান বানিয়েছে — ১৩৪
মেলা/প্রদর্শনী আমাকে মস্তান বানিয়েছে — ১৪৫
নেশা আমাকে মস্তান বানিয়েছে — ১৫৩
বেকারত্বই আমাকে মস্তান বানিয়েছে — ১৬০

তৃতীয় ভাগ ঃ পরিশিষ্ট

সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ ১৯৯২ — ১৬৬
মস্তান এবং মস্তানী আইন — ১৭১
মস্তান সম্পর্কে বিভিন্ন পেশার ৫২৩ জনের অভিমত — ১৭৬

www.nagorikpathagar.org

প্রথম ভাগ

জবানবন্দীর পূর্বকথা

কেউ কখনো মায়ের গর্ভ থেকে মস্তান হয়ে জন্ম নেয়নি। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশই জন্ম দিয়েছে মস্তান। মস্তানরা আমাদের হাতে গড়া পরিবেশেরই ফসল, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালকরাই এর উৎপাদক।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

এই জবানবন্দী তাদের উদ্দেশে পেশ করছি

■ এই জবানবন্দী ঐ বিবেকবানদের বিবেকের কাছে পেশ করছি, যেসব বিবেক সব সময় উচ্ছল প্রাণের একশ্রেণীর উচ্ছৃংখল তরুণকে 'মস্তান' বলে গালি দেয়, ঘৃণা করে, ইতরপ্রাণীর চেয়েও অধম ভাবে, কিন্তু তাদের এই অধঃপতনের জন্য কারা দায়ী, তা নিয়ে ভাবে না। কার দোষে কিভাবে আর কোন পরিবেশে তারা মস্তান হলো, সেকথা কেউ কোন মস্তানকে কাছে ডেকে এনে সোহাগ করে দরদী মন নিয়ে জিজ্ঞাসাও করে না।

■ এই জবানবন্দী তাদের উদ্দেশ্যেও নিবেদিত, যারা বর্তমানের মস্তানদের নিয়ে আগামী দিনে গবেষণা করবেন, প্রবন্ধ, ফিচার লিখবেন, ইতিহাস রচনা করবেন। তাদের গবেষণা ও লেখালেখির সময় হাতের কাছে যেন থাকে অপর পক্ষেরও বক্তব্য, যাতে তাঁরা সঠিক তথ্য অবহিত হতে পারেন, দুপক্ষের বক্তব্য সামনে রেখে সঠিক বিচার করতে পারেন।

■ এই জবানবন্দী আগামী দিনের অনুসন্ধিৎসু মনগুলোর উদ্দেশেও পেশ করছি, যারা বর্তমানের মস্তানদের উপর কোন মন্তব্য করার আগেই যেন জানতে পারেন যে, মস্তানরা মায়ের গর্ভ থেকে মস্তান হয়ে জন্ম নেয়নি, তাদের মস্তান বানিয়েছে যারা, তারাই মস্তানদের গালি দিয়েছে, ঘৃণা করেছে, এড়িয়ে চলেছে, ওদের মানুষ হতে দেয়নি, বরং নজর-নেয়াজ দিয়ে লালন করেছে।

www.nagorikpathagar.org

'মস্তান' শব্দের উৎপত্তি ও আদি পরিচিতি

মস্তান শব্দের উৎপত্তি পারস্য তথা ইরান দেশে। ফার্সী ভাষার মস্‌ত, মস্‌তানা আর বাংলাদেশের 'মস্তান' একই বংশোদ্ভুত, একই জাতভুক্ত এবং একই রক্ত সম্পর্কিত। ইরান দেশের মানুষের মুখের ভাষায়, লেখায় এবং তাঁদের অভিধানে আবহমানকাল থেকে এই শব্দটি যে ভাব ও অর্থ প্রকাশ করে আসছে, তা এখনও অব্যাহত, এর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৭১ ইংরেজী সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বাংলাভাষার অভিধানেও এই মস্তান শব্দ একই ভাব ও অর্থ প্রকাশ করতো। ১৯৭২ সালের শুরু থেকে বাংলাদেশে মস্তান শব্দের ভাব ও অর্থের পরিবর্তন ঘটতে থাকে রাজনৈতিক কারণে। এই পরিবর্তনের ফলে দেশের সাধারণ মানুষ গুণ্ডা-বদমায়েশদের মস্তান নামে সম্বোধন করতে থাকেন। যারা সে সময় ছিল বয়সে তের থেকে উনিশ, এমনকি উনত্রিশ তিরিশ, তাদেরই একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হাবভাবে ঘোষণা করলো, আমরা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে করি না কুর্ণিশ। গায়ে-গতরেও তারা ছিল বেশ মোটা-তাজা, চুল-দাড়ি ছিল ছাড়া ছাড়া, চোখ তাদের সব সময় চঞ্চল থাকতো শিকারের সন্ধানে। জোর করে তারা চাঁদা আদায় করতো, লুটপাট করতো, গাড়ী-বাড়ী দখল করতো। অপকর্মের এই কর্মীবাহিনীকে তখনও অনেকে গুণ্ডাবাহিনী বলতো। এই 'গুণ্ডা' শব্দটি ধীরে ধীরে 'মস্তান' শব্দের মাঝে লীন হয়ে যায়। গুণ্ডা শব্দটি মস্তান শব্দের মধ্যে আত্মস্থ হওয়ার কারণে মস্তান ডবল শক্তিতে প্রবল হয়ে উঠে। উল্লেখ্য, তখনও কিন্তু 'মস্তান' শব্দের আভিধানিক অর্থের পরিবর্তন ঘটেনি, শুধু ব্যবহারিক অর্থেরই পরিবর্তন ঘটে। ফলে গুণ্ডা শব্দের সমার্থক হয়ে পড়ে মস্তান শব্দটি। মস্তান আর গুণ্ডা এবং গুণ্ডা আর মস্তান-এই দুয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকেনি। গুণ্ডা শব্দটি দেশের সাধারণ মানুষের ব্যবহার থেকেও ধীরে ধীরে বাদ পড়ে যায়। মস্তান শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ অত্যধিক হওয়ার কারণে ১৯৭১ সালের পর ওপার বাংলায় যত অভিধান নতুনভাবে রচিত হয় বা পুরানো অভিধানের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, সেসব অভিধানে মস্তান শব্দের অর্থ করা হয় 'গুণ্ডা।' কলিকাতা থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় একটি অভিধানে মস্তান শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, A rowdy acting officiously as the leader of a Locality. অর্থাৎ, একটি এলাকার নেতা হিসাবে যে গুণ্ডাগিরী করে, সে মস্তান। ফার্সীতে মস্‌ত শব্দের অর্থ মাতাল, উন্মাদ, দিওয়ানা, মত্ত। প্রাচীন বাংলা অভিধানেও মোটামুটিভাবে এসব অর্থই লেখা ছিল। কিন্তু আধুনিক বাংলা

www.nagorikpathagar.org

অভিধানে মস্তান শব্দের অর্থ এভাবে করা হয়েছেঃ যৌবন মদে মত্ত, মাতাল, গায়ের জোরে সরদারী করতে অভ্যস্ত, উপদ্রবকারী ইত্যাদি। উইলিয়াম গোল্ডস্যাক তাঁর A Mussalmani Bengali-English Dictionary-তে মস্তান শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Drunkard (মাতাল) ব্যবহার করেছেন; আর মস্তানী শব্দের ইংরেজী তরজমা করেছেন Drunkenness, Intoxication.

ফার্সী, উর্দু, ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলাভাষার অভিধানে মস্তান শব্দের যে সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা দেয়া আছে, তাতেও মাতলামি, পাগলামি আর গুণ্ডামি আচরণই প্রাধান্য পেয়েছে। এমন আচরণের ধারক-বাহকদেরই মস্তান নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ইরান দেশে তিন শ্রেণীর লোককে মস্তান বলা হয়।

(১) যারা মদ গিলে রাস্তাঘাটে মাতলামি করে, জনসাধারণকে উত্যক্ত করে এবং জনপদের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করে, তারাই মস্তান।

(২) যারা পীরের আস্তানায় পড়ে থাকে, পীরের জন্য যেসব নজর-নেয়াজ আসে, তা থেকে খায়, পীরের আস্তানায় সরদারী করে, আস্তানার কাজকর্ম করে, তারাও মস্তান।

(৩) বিভিন্ন মাজারে যারা মাজার-মোতাওয়াল্লীদের নিয়োগকৃত শৃংখলা-রক্ষাবাহিনী, তারাও মস্তান নামে অভিহিত।

একটা ব্যাপার কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয়, মাজারের বা পীরের আস্তানার মস্তানরা পীরের আস্তানা বা মাজার এলাকার বাইরে সাধারণত মস্তানী করে না। নিজ নিজ সীমানায়ই তাদের যাবতীয় কর্মতৎপরতা থাকে সীমাবদ্ধ। ব্যতিক্রম হয়তো এ শ্রেণীর কোন কোন মস্তানের ক্ষেত্রে দেখা যায়; কিন্তু তা ব্যতিক্রম মাত্র।

আমাদের দেশেও দু'শ্রেণীর লোককে মস্তান বলা হতো। যারা বেকার; যাদের উদ্দেশ্যহীন বিচরণ, তবে তারা সমাজে কোন উপদ্রব সৃষ্টি করতো না, আজ এই ঠিকানায়, কাল অন্য ঠিকানায়-গন্তব্যহীন জীবন। পীরের দরবারে আর মাজারেও এরা পড়ে থাকতো, এমন লোকদেরই মস্তান বলা হতো। এরা সাধারণত বিয়ে-শাদী করে না, ঘর-সংসার বাঁধে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মস্তান তারা, যারা পীরের আস্তানা আর মাজারের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে জীবন কাটায়। জিন্দা পীরের আস্তানায় যেসব মস্তান থাকে, সেসব মস্তান রিক্রুট করা হয় মুরীদদের মধ্য থেকে মোটা-তাজা দেখে। এই মুরীদরা থাকে বেকার, সংসারের দায়-দায়িত্বহীন উদাসীন, বাউল প্রকৃতির। কারণ,

www.nagorikpathagar.org

তাদের অধিকাংশই অবিবাহিত। নজর-নেয়াজ যা আসে, তারা শৃংখলা করে পীর পর্যন্ত পৌছায়। পীর আর মস্তানরা ভাগাভাগি করে খায়, তবে পীরের জন্য থাকে সিংহভাগ।

আসল বা নকল মাজারেও মস্তানরা স্থায়ীভাবে বাস করে। মাজারের রক্ষণাবেক্ষণ করাই তাদের মূল দায়িত্ব। বিনিময়ে তারা পায় ফ্রি আহার-বাসস্থান আর কিছু অর্থকড়ি; ক্ষেত্রবিশেষে বা মাজারভেদে তারা পায় অকাম-কুকামেরও সুযোগ-সবিধা। কিন্তু একটা কথা সত্য, সমাজে তাদের তেমন কোন উৎপাত নেই। তা অতীতে যেমন ছিল না, বর্তমানেও নেই।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মস্তানদের উদ্ভবঃ নব্য মস্তানদের উদ্ভব ঘটেছে এই বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের পর থেকেই। সুতরাং বলা যায়, ১৯৭২ সালের পর থেকে যেসব অভিধান প্রকাশিত হয়েছে, সেসব অভিধানে মস্তান শব্দের পরিচিতি প্রসঙ্গে গুণ্ডা বা উচ্ছৃংখল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে যাদের মস্তান বলা হয়, তাদের পরিচয় মাতাল বা ভবঘুরে নয়, খাঁটি এবং অকৃত্রিম গুণ্ডা-বদমায়েশ ও সন্ত্রাসী।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। বৈধ শাসনব্যবস্থাকে অরাজকতা ও সন্ত্রাস একেবারে গিলে ফেলে। গাড়ী-বাড়ী ও জমি জবর দখল করার রীতিমত মওসুম শুরু হয়ে যায়। নারী ধর্ষণ, অপহরণ, ডাকাতি, ছিনতাই, লুট, খুন অবাধ ও সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রশাসনের কর্মকর্তারা অসহায়ের মত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশাসন অবশ্য টুকটাক পদক্ষেপ নিতেন, কিন্তু তা হতো নামকাওয়াস্তে। এই লুটেরা ও খুনীদের দলীয় পরিচিতি ছিল মাত্র একটি। তখন বিশেষ দলটি ছাড়া অন্য কোন দলও ছিল না। দেশ-মুক্তির কৃতিত্বের একক দাবীদার দলটির সদস্য বলে নব্য মস্তানরা দাবী করতো। পুলিশ তাদের কাউকে অপকর্মে লিপ্ত অবস্থায় পাকড়াও করলেও মামলা নথিভুক্ত করার আগে টেলিফোনের অপেক্ষা করা হত। যখন মনে হতো যে, না, ধৃত যুবকের জন্য কোন টেলিফোন আসার সম্ভাবনা নেই, তখন কেইস লেখা হতো।

এই অরাজকতা সৃষ্টির ঐতিহাসিক কারণ আছে। এখানে তা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। সেই অরাজকতার আমলে লুটেরারা লুটপাট করেছে বিনাবাধায়, আইন ওদের বাধা দিতে আসেনি। কারণ, সে আমলে আইন থাকলেও তা ছিল অকার্যকর।

www.nagorikpathagar.org

বিশেষ রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট যুবকরা যখন লুটপাট করে ধনী হতে শুরু করলো, তখন এসব দৃষ্টান্ত সমাজে মহামারীর মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এই অরাজকতায় যারা তখনও জড়িত হয়নি, তারা ভাবলো, আমরা কেন বসে আছি। আইন তো কাউকে বাধা দিচ্ছে না। অভাব বিমোচনের এই সুযোগ তো আর হাতছাড়া করা যায় না। হাঁ, তারা এই সুযোগ হাতছাড়া করলো না। পা বাড়ালো তারা এ পথে। এগিয়ে চললো। তাদের সংগে এসে যোগ দিল অপেক্ষমাণ গ্রুপ। এভাবে সমাজ থেকে বেরিয়ে এলো বহু যুবক। তারা একটা শক্তিতে পরিণত হলো। লুটপাটকে তারা একটা পেশা হিসাবে বেছে নিল। চললো এই কাফেলার অগ্রাভিযান। বলার অপেক্ষা রাখে না, সে সময়ের রাজনীতিও ছিল সন্ত্রাসী রাজনীতি। এই রাজনীতিবিদদের অনুকরণ করে অনেক দুর্ধর্ষ বাহিনী সৃষ্টি হলো। লাল, নীল, হলুদ আর অমুক তমুক বাহিনী গড়ে উঠলো সন্ত্রাসী যুবকদের নিয়ে। প্রতিটি মহল্লার অলিতে-গলিতে টোল-ট্যাক্স আদায়ের জন্য গড়ে উঠলো ক্লাব নামক খাজনা আদায়ের অফিস। তারা বললো, আমরা যুদ্ধবিজয়ী বাহিনী। এদেশের সবকিছু আমাদের জন্য মালে-গনীমত। তারা যে রাজনৈতিক পরিচয় বহন করতো, সেই পরিচিতিই তাদের বেপরোয়া করে তুললো। থানা-পুলিশ তাদের অবাধ বিচরণে ও অবৈধ সম্পদ আহরণে কোন বাধা সৃষ্টি করত না বরং তাদেরই একটা শ্রেণী সহযোগিতা করে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে শুরু করলো। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে বেশ কিছুদিন চলার পর নতুন নতুন রাজনৈতিক দল জন্ম নিল। মস্তানরা সুবিধামত শক্ত খুঁটির রাজনৈতিক দল দেখে দল বদল করতে থাকলো।

কিছুদিনের মধ্যেই যখন দেশের রাজনীতি মস্তাননির্ভর হয়ে পড়ে, তখন মস্তানদের কদর আরো বাড়ে। দু'টাকার মস্তানের হাজার টাকা দাম উঠে। রাজনীতিবিদরাও মস্তান রিক্রুট শুরু করে দেন। মস্তানদের কদর বাড়ে, এর কারণও আছে। বিভিন্ন দলে দলাদলি শুরু হয়ে গেল। এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। তখন ডাণ্ডা মেরে প্রতিপক্ষকে ঠান্ডা করার আবশ্যকতা দেখা দিল। এ পর্যায়ে মস্তান ভাড়া করার আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভূত হলো। রাজনীতিবিদরা মস্তান রিক্রুটে মনোযোগ দিলেন। এভাবে বিভিন্ন দলে মস্তানরা ঢুকে পড়ল। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত গোটা দেশ মস্তানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। দেশে দু'বার সামরিক শাসন জারি হলেও মস্তানদের উপর কোন আঘাত আসেনি, মস্তানদের কদর কমেনি; বরং সামরিক শাসন মস্তানদের আরও সুবিধা করে দেয়। কারণ, যারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন, তারা জোর করে রাজনীতি

www.nagorikpathagar.org

করার নিয়তেই তা করেন। রাজনীতি করতে হলে মস্তান লাগবেই। আর এজন্য তারা মস্তান উৎপাদনে বাধা দেননি। মস্তানদের নির্মূল বা প্রতিহত করারও চেষ্টা করেননি। কারণ, তাদের তো প্রয়োজন মস্তানের। এজন্য দেখা যায়, উভয় সামরিক নেতাই যখন রাজনীতি শুরু করেন, তখন মস্তানরাই দলে অগ্রাধিকার পায়। উভয় সামরিক নেতা মস্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাদের পেশাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। কয়েকজন মস্তানকে মন্ত্রীও করেন। যাদের মন্ত্রী করেননি, তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মন্ত্রীর মর্যাদা দেন। কুখ্যাত কোন কোন মস্তানকে ভিআইপি করে বিদেশ সফর করিয়েও আনেন।

গণতান্ত্রিক শাসনামলেও মস্তানদের গুরুত্ব মোটেই কমেনি। বর্তমান রাজনীতিও আগাগোড়া মস্তাননির্ভর। এখন আর গুণ্ডা-বদমায়েশ, ষণ্ডা-পাণ্ডা শব্দের ব্যবহার নেই, মস্তান বললেই এদের বুঝায়। সুতরাং বাংলাদেশে বর্তমানে মস্তান এই পরিচয়েই পরিচিত।

মস্তান শব্দটি আমাদের দেশে যে অর্থে ব্যবহার হচ্ছে, যদিও তা মূল অর্থের কদর্থ মাত্র, কিন্তু ব্যবহারের প্রাবল্যে কদর্থই এখন আসল অর্থের মত ভাব-ব্যঞ্জনা প্রকাশ করছে। আসল অর্থ হয়তো গবেষকরা তাদের গবেষণামূলক নিবন্ধে ব্যবহার করবেন, তবে কদর্থের মস্তান শব্দটি যে ব্যবহারিক ভাব-ব্যঞ্জনায় সমাজে ইস্টাবলিশ্ড, তার কোন পরিবর্তন অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে বলে আশা বা আশংকা কোনটাই করা যায় না। ভাল ভাল শব্দের অর্থ কিভাবে বদলে যায়, এ ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আছে।

তেমন একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, তখন আইয়ুব খানের শাসনামল। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন চলছে। চার জন ছাত্রনেতা গণআন্দোলনের ঝড় তুলেছেন। এই চার জন ছাত্রনেতা হলেন জনাব তোফায়েল আহমদ, জনাব আ, স, ম আবদুর রব, জনাব আব্দুল কুদ্দুস মাখন এবং জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী। এই চার নেতাকে জনগণ বলতেন 'চার কুতুব।' অথচ কুতুব হচ্ছে কিতাবের বহুবচন। তাছাড়াও কুতুব-এর আরও অর্থ হচ্ছে দরবেশ, ধ্রুবতারা, উত্তর মেরু ইত্যাদি। কে ঘাঁটাঘাঁটি করে অভিধান, কুতুব শব্দের অর্থও কেউ তালাশ করলো না। চার নেতা 'চার কুতুব' খেতাবে অভিহিত হতে থাকেন। কিন্তু তাই বলে কুতুব-এর প্রকৃত অর্থ অভিধানে কখনো ব্যবহারিক অর্থে পরিবর্তিত হয়নি, যেমন মস্তান শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে।

মস্তানদের শ্রেণীবিভাগঃ মস্তানদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন অনেকে। আমি

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করে নিতে পারছি না। একই মস্তানকে যখন দেখি বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত, তখন তাকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলি তা ভেবে পাই না। যাকে দেখা গেছে এক দলের হয়ে অন্য দলের মিটিং ভাংগতে, তাকে অন্য সময় দেখা গেছে সন্ত্রাসবিরোধী মিছিলের অগ্রভাগে সন্ত্রাস বিরোধী শ্লোগানে, কখনো দেখা গেছে লুটপাটে, গাড়ী ভাংচুরে, অগ্নিসংযোগে, ছিনতাইয়ে, মারদাঙ্গায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাণ্ডা ঘুরাতে, নারীদের উত্ত্যক্ত করতে, এমনকি সরকারী দলের মিছিলেও।

রাজধানীতে যারা খবরের কাগজ বিক্রয় করে, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত সব এলাকায় কাগজ বিক্রি করতে পারে না। কারণ, এলাকা ভাগ করা আছে। যে এলাকার যে সীমানা যাদের জন্য বরাদ্দ, সেই নির্ধারিত সীমানায়ই তারা কাগজ বিক্রয় করতে বাধ্য। থানারও সীমানা আছে, চিহ্নিত সীমানায় চিহ্নিত থানার প্রশাসন সীমিত। শুনা যায়, ভিক্ষুকদেরও ভিক্ষা করার সীমানা নাকি চিহ্নিত। আমি স্বচক্ষে একবার দেখেছি, দুজন ভিক্ষুক অপর এক ভিক্ষুককে নাজেহাল করছে। তার অপরাধ, সে কেন এ এলাকায় ভিক্ষা করতে এসেছে। এভাবে কর্ম-সীমানায় সীমিত বিভিন্ন জনের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকাণ্ড। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু মস্তানদের বেলায়। তাদের সীমানা গোটা দেশ। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তারা চলে যেতে পারে, যেখানে খুশী সেখানে মস্তানী করতে পারে, যেকোন ধরনের মস্তানী চালাতে পারে, শুধু লাইনটা ঠিক রাখলেই হলো। এসব কারণেই মস্তানদের শ্রেণীবিভাগ করা কঠিন। তবে মাসোহারাভোগী পোষা মস্তানরা হরেক কাজে ব্যস্ত না থেকে তাদেরই নির্দেশ পালন করে, যাদের তারা নিমক খায়। এধরনের সুনির্দিষ্ট কাজের মস্তানদের কর্মভেদে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। কিন্তু ক্রস-কানেকশনে তাদেরও সাইন বোর্ডের পরবর্তন ঘটে।

মস্তানী এক ধরনের ব্যবসাঃ মস্তানদের নিয়ে অনেকেই অনেক লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন। মস্তান কি বস্তু, এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কি, সমাজে মস্তানদের প্রভাব কতটুকু, এ সম্পর্কেও জনগণ বিভিন্ন মাধ্যমে বেশ ওয়াকিফহাল। মস্তান দংশনের যাতনা আশী বিষের চেয়েও যে তীব্র, বিষময় ও যাতনাময়, যারা তাদের শিকার হয়েছেন, তারা বাকী জীবনের জন্য মস্তান-দংশন কি বস্তু তা স্মরণে রাখবেন ইনশাআল্লাহ।

কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, এক ধরনের ব্যবসায়ী বিনা পুঁজিতে ধূর্তামী বুদ্ধিকে পুঁজি বানিয়ে ব্যবসা করে। তদ্রুপ বিধ্বস্ত ও বরবাদ চরিত্রকে বলা যায়

www.nagorikpathagar.org

মস্তানদের পুঁজি। বেআদবী আর বেত্তমিজী হচ্ছে এ ব্যবসায়ের চালিকাশক্তি। তাই মস্তানীকে কোন কোন লেখক 'ব্যবসা' বলেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে এই, এ সমাজ ক্রমেই হয়ে উঠছে মস্তান-নির্ভর। পরিশ্রম, মেধা আর যোগ্যতার স্বাভাবিক প্রাপ্তি হচ্ছে বিঘ্নিত। উপরে উঠার অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ব্যবহৃত হয়ে সম্ভাবনাময় তারুণ্যের একটি অংশ মিশে যাচ্ছে মস্তানচক্রে। স্বাধীনতার পর এদেশের তরুণদের প্রাণশক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহারের কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। এ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি পরবর্তীতে কোন সময়েও। বরং বিভিন্ন সময় অসাধু জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা এবং ব্যবসায়ীরা তাদের সম্পদ ও ক্ষমতা বিস্তারে ব্যবহার করেছে তরুণদের। যারা হতে পারতো মহা আকাঙ্ক্ষার রূপকার, তারা আজ তাই মস্তান। প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় মস্তানী এক ধরনের ব্যবসা। মস্তানচক্রের তৎপরতা সে কারণে হয়ে উঠছে বাধাহীন, নির্বিঘ্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন-শৃংখলা রক্ষাবাহিনীও এদের প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছেন না বা নেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। সাপ্তাহিক বিচিত্রার অন্যতম প্রতিবেদক জনাব আসিফ নজরুল বিচিত্রার ২৮শে জুলাই (১৯৮৯) সংখ্যায় এসব মন্তব্য করেছেন। পূর্ণ প্রতিবেদনটি এখানে পেশ করছি আমার পরবর্তী আলোচনার দলিল হিসাবে।

সমাজের সর্বত্রই খুব দ্রুত একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। স্বস্তির ন্যূনতম সুযোগটিও নিঃশেষ হতে চলেছে এখানে। রাজনীতি ও অর্থনীতি থেকে শুরু করে সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ক্রমেই হয়ে উঠেছে পেশীশক্তি-নির্ভর। নতুন প্রপঞ্চ নয়, সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী নিয়ন্ত্রক শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে মস্তান, মস্তানচক্র। 'মেয়েদের উত্ত্যক্ত' করার সত্তর দশকের মস্তান কনসেপ্ট এখন আর নেই। এখনকার মস্তান সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রক। এখনকার মস্তান জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, বিরাট ব্যবসায়ী, চোরাচালানের শিকড় শক্তি। কখনোবা নিজেই জনপ্রতিনিধি কিংবা বিত্তশালী ব্যবসায়ী।

যে স্বপ্ন নিয়ে নয় মাসের স্বাধীনতাযুদ্ধ হয়েছিল, তা আজ অবলুপ্ত। মহৎ ইচ্ছা কিংবা নিয়মতান্ত্রিক পথের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এখন স্মৃতি রোমন্থনের বিষয়। গোটা সমাজ মেতে উঠেছে লক্ষ্যহীন, উদভ্রান্ত, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায়। যারা জিতে যাচ্ছে, তাদের রয়েছে প্রতিমুহূর্তে হারানোর ভয়। যারা হেরে যাচ্ছে, তাদের ভেতর ক্ষোভের আগুন জ্বলছে নিরন্তর। অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তির অসম, অসংলগ্ন ও চরিত্রহীন বন্টনের পরিণতি হচ্ছে মস্তাননির্ভর সমাজ। অসৎ

www.nagorikpathagar.org

সমাজনেতা, জনপ্রতিনিধি বা বিত্তশালী একসময় তাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহার করতেন মস্তানদের। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মস্তান জেনে গেছে উপরে উঠার পথ। এখন তাই সে নিজেই রাজনীতি অর্থনীতির হরিলুটের প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী। বিত্তশালী নেতা বা ব্যবসায়ীর অবস্থানে এসে নিশ্চয়তার জন্য সে নিজেই প্রমোট করছে নতুন মস্তানচক্রকে। ক্ষোভ বুকে নিয়ে অপেক্ষা করা এই প্রজন্ম পাচ্ছে পেশীশক্তির অভিভাবকত্ব, সচ্ছলতা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠার ক্রম ক্ষয়িষ্ণু পথের ভিড়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছে, সুযোগ কিংবা যোগ্যতা যাদের নেই, বিকল্প প্রলোভন হিসাবে মস্তান শিরোনাম তার জন্য হয়ে উঠেছে প্রলুব্ধকর। এই অসুস্থ প্রক্রিয়ায় যাদের বাধা দেয়ার কথা, তাদের মধ্যেই ঢুকে গেছে উঠতি মস্তানচক্রের গড ফাদাররা। শৃংখলা রক্ষা যাদের দায়িত্ব, ভাগাভাগির প্রলোভনে তাদেরও করা হয়েছে শৃংখলে বন্দী। মস্তানী এখন সবচেয়ে বড় ব্যবসা কিংবা সব বড় ব্যবসার অনিবার্য অনুষঙ্গ।

মস্তানরা ক্ষমতাকেন্দ্রের কাছাকাছিঃ অর্থ সম্পর্কিত সকল বৈধ ও অবৈধ সুবিধাপ্রাপ্তি বর্তমানে ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চলছে। উপরে উঠার উদভ্রান্ত প্রতিযোগিতায় তাই ক্ষমতার মোহটি প্রলুব্ধকর সকল পক্ষের কাছে। যেহেতু গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোতে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ নির্বাসিত হয়েছে। তাই ক্ষমতার লড়াই–তা যত ক্ষুদ্র কেন্দ্রেই হোক, আত্মপ্রকাশ করছে অসুস্থ নোংরা চেহারা নিয়ে।

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অসুস্থ প্রতিযোগিতা যখন স্বাভাবিক হতে চলেছে, তখন মস্তান নির্ভরতার বিষয়টিও গোপন থাকছে না। একটি ঘটনার কথাই ধরা যাক। ৬ জুলাই (১৯৮৯) কমিশনার পদে উপনির্বাচন হওয়ার কথা ছিল রাজধানীর শুক্রাবাদ–সোবহানবাগ এলাকায়। এই এলাকার অধিবাসীদের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সবচেয়ে সরব দু'জনের মধ্যে একজনের পরিচিতি মস্তান হিসেবে, আরেকজনের পরিচিতি মস্তানদের গড ফাদার হিসেবে। নির্বাচনে জেতার পথ হিসেবে ভোটারদের সন্তুষ্টি নয়, এরা নির্ভর করলেন পেশীশক্তির ওপর। ভোটারদের কাছে ভোট চাওয়ার বদলে তাই রাজধানীর মস্তানদের আনুকূল্য পাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলেন এরা। আগারগাঁও, শ্যামলী, মীরপুরের পেশাদার মস্তানরা এলেন প্রথমজনের পক্ষে, পুরান ঢাকা ও মোহাম্মদপুরের মস্তানরা এলেন দ্বিতীয়জনের পক্ষে। সুইডেনে অবস্থানরত রাজাবাজারের খুনের মামলার আসামী, রাজধানীর একজন প্রভাবশালী মস্তানের

www.nagorikpathagar.org

অনুগত বাহিনী দ্বিতীয়জনের পক্ষে যোগ দিলেন। অথচ রাজাবাজারের এই মস্তানের বিরুদ্ধে একসময় থানায় অভিযোগ করেছিলেন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দু'টি পক্ষই। সমঝোতা, বন্ধুত্ব, টাকা-পয়সার ভাগাভাগিতে দু'ভাগ হয়ে যায় ঢাকা শহরের মস্তানরা। শুক্রাবাদের রাস্তায় প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা, অর্ধ শতাধিক হোণ্ডার নিয়মিত দাপট, সংঘর্ষ, হানাহানির মধ্য দিয়ে উদ্যোগ-আয়োজন চলে নির্বাচনের। নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে গুলিবিদ্ধ হন গড ফাদারের এক কর্মী। কেস হয় মস্তান প্রার্থীর বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণহীন। নির্বাচনের তারিখ যায় পিছিয়ে। সংঘর্ষ এতেও থামেনি। ২১শে জুলাই বোমাবাজিতে নিহত হয় একজন। মস্তান প্রার্থী অবস্থা বেগতিক দেখে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন তার অগ্রজের সমর্থনে।

মস্তানরা কেন জড়িয়ে পড়েছিল সে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিংবা প্রার্থী দুজন কেন জড়িয়েছিলেন মস্তানদের? এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এ সমাজে মস্তান সাম্রাজ্যের যে টুকরো চিত্র পাওয়া যায়, এক কথায় তা ভয়াবহ। জানা গেছে, শুক্রাবাদের কাছাকাছি এলাকার একজন কমিশনার নারায়ণগঞ্জের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন শংকরে তার বাড়ির দখল পাইয়ে দিতে। কমিশনার একসময়ের ত্রাস সৃষ্টিকারী মস্তান, ফলে পাড়ার উঠতি মস্তানদের পৃষ্ঠপোষকতার গুরুত্ব ভালভাবেই বুঝেন। তার এবং শংকরের কাছাকাছি এলাকার ছেলেদের সঙ্গে রফা হল, বাড়ি দখলের তিন লাখ টাকা কমিশনার ও মস্তানদের মধ্যে সমান ভাগ হবে, শর্ত, বাড়ি দখল করে দিতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে ঠিকই হামলা চালায় মস্তানরা; কিন্তু দখল সম্পূর্ণ করতে পারেনি। অন্যপক্ষ দুর্বল নয় মোটেও। কমিশনার তাই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আগে থেকেই সমঝোতা ছিল, তবু স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে কাজ করলেন শুক্রাবাদের উপনির্বাচনে। ছেলেদের বোঝানো হল, শুক্রাবাদের মস্তান প্রার্থী জিততে পারলে শংকরের বাড়ি দখল পানির মতো সহজ হয়ে যাবে। শুক্রাবাদের মস্তানদের সঙ্গে থানার সম্পর্ক অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, শংকরের বাড়ি দখলের টাকার গন্ধ শোঁকা মস্তানদল তাই অপেক্ষা করছিল শুক্রাবাদের মস্তানের জয়ের জন্য।

একইভাবে মীরপুর, নবাবগঞ্জ, আজিমপুর, আগারগাঁওসহ সব এলাকার মস্তানরাই শুক্রাবাদের নির্বাচনে জড়িয়ে পড়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে। এসব মস্তানই পুরো ঢাকার প্রতিটি এলাকাকে নিজেদের মধ্যে অলিখিত ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে, অবস্থান নিশ্চিত রাখতে, কিংবা প্রভাববলয়

www.nagorikpathagar.org

বিস্তৃত করতে এদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা পুরনো ব্যাপার। সেই বন্ধুত্ব, সমঝোতার প্রক্রিয়ায় এক এলাকার প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পক্ষ বেছে নেয় অন্যান্য মস্তান। এসব মস্তানের নেতারা ব্যবসা ও রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত, অবস্থানগত কারণে প্রতিষ্ঠিত মস্তানরা সরাসরি এ্যাকশনে যেতে পারে না বলে প্রতি ক্ষেত্রেই এদের হাতে থাকে অনুগত মস্তানচক্র। এই মস্তানচক্রই কখনো মীরপুরের ঘাঁটি থেকে কাজ সেরে আসে মোহাম্মদপুরে। লালবাগের ঘাঁটি থেকে মালিবাগে, কিংবা শেখ সাহেব বাজার থেকে ফার্মগেইটে। এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই থাকছে স্থানীয় মস্তানদের সহযোগিতা। নীচের স্তরে বিনিময় মূল্য হয় অর্থের অংকে, উপরের স্তরে ব্যবসা হয় সমঝোতার ঋণে। এই সমঝোতার অর্থ অর্জনের প্রক্রিয়া গোটা দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

মস্তানচক্রের সংগঠনঃ মস্তানচক্রের গঠন প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র থাকলেও এর অভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ হচ্ছে ব্যবসায়িক বা আর্থিক সুবিধা। পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণ করলে আর্থিক ব্যাপারটির চরিত্র বোঝা যাবে। শহরের প্রতি পাড়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠন থাকে। মস্তানচক্রের সংগঠনের রাজনৈতিক চরিত্র থাকে না। একটি মস্তানচক্রে তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক দলের এধরনের সদস্যদের মূল লক্ষ্য ব্যবসায়িক। পাড়ায় পাড়ায় এদের সংঘর্ষ হয় আর্থিক স্বার্থে। রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য নয়। থানা-পুলিশের ঝামেলা এড়াতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা ক্ষমতাসীনদের অনুগত থাকে। ক্ষমতাসীনরা নিজেদের রাজনৈতিক কিংবা আরো বড় আর্থিক স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবহার করে এসব মস্তানকে।

নিম্নপর্যায় থেকে শুরু করা যাক। পুরনো ঢাকার এক কুখ্যাত মস্তানের যাত্রা শুরু ভিসিআর প্রদর্শনীর মাধ্যমে। সে সময় ঢাকায় ভিসিআরের সংখ্যা ছিল খুবই কম, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভিসিআর প্রদর্শনী ছিল অত্যন্ত লাভজনক। অবৈধ এবং অতি লাভজনক যেকোন কিছুতে ঝামেলা থাকে নানারকম। ভিসিআর প্রদর্শনকারী তখনও প্রতিষ্ঠিত মস্তান হয়ে ওঠেনি। ছবি দেখতে আসা উটকো লোকের ঝামেলা নিয়ন্ত্রণ এবং পাড়ার অন্যান্য মস্তানের লোলুপদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সে নিজেই প্রমোট করতে থাকে পাড়ার হতাশ, বিক্ষুব্ধ অসচ্ছল তরুণদের। অর্থ ছড়িয়ে এদের নিয়ে যেমন নিজস্ব মস্তানবাহিনী গড়ে তোলে ভিসিআর প্রদর্শনকারী, তেমনি একইভাবে কিনে নেয় স্থানীয় থানার লোকদের। পুলিশ ও

www.nagorikpathagar.org

মস্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে অর্থের বিনিময়ে। সে নিজেও আত্মপ্রকাশ করে আরো বড় মস্তানরূপে। তার ক্ষমতা ও প্রভাবকে ব্যবহার করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। বিনিময়ে দেয় অভিভাবকত্বের নিশ্চয়তা। ভিসিআর প্রদর্শনকালীন সময়ের ক্ষুদ্র মস্তান হয়ে ওঠে দুর্দান্ত, ভয়ংকর মস্তান। কমিশনার নির্বাচনে দু'হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মিছিল করে সে। ডাকাতি, ধর্ষণ, খুনের অসংখ্য অভিযোগে বিন্দুমাত্র বিব্রত হয় না সে, কারণ, তার প্রার্থী জিতে যায় নির্বাচনে। অতিষ্ঠ এলাকাবাসী মিছিল করে, থানায় ধর্ণা দেয়, দেয়ালে শ্লোগান লেখে, কিন্তু কিছুই হয় না আলোচ্য মস্তানের। পরবর্তী সময়ে সরকার পরিবর্তনের এক পর্যায়ে গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় যেতে হয় তাকে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু একবার নয়, আরো কয়েকবার গ্রেফতার হয় সে। প্রতিবার তাকে ছাড়িয়ে আনে কোন না কোন বিত্তশালী, প্রভাবশালী, জনপ্রতিনিধি। নির্বাচনের সময় তাকে দরকার, পাড়ার উঠতি মস্তানদের সামলানোর জন্য। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সম্পদ অক্ষুন্ন রাখতে এবং বিস্তৃত করতেও তাকে প্রয়োজন। জনশক্তি নয়, পেশীশক্তিতে আস্থাবান জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতাদের তাই বার বার প্রয়োজন পড়ে এসব মস্তানের। আলোচ্য মস্তান এখন নিজেই বিরাট এক মস্তানদলের নিয়ন্ত্রক। তার একসময়ের প্রধান দুই অনুচর এখন নিজেরাও বড় মস্তান। তারা অনুগত থাকেনি মূল মস্তানের প্রতি। আলোচ্য মস্তানদের গড ফাদার এখন সে এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, তাই তার দাপট সবচেয়ে বেশি। তাদের প্রমোটররা ক্ষমতায় এলে তারাও হয়ে উঠবেন সর্বেসর্বা শক্তিধর দানব।

মস্তান এখন শুধু জনপ্রতিনিধির শক্তির উৎসই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেই জনপ্রতিনিধি। যে এলাকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ দেখা যাবে, সে এলাকার জনপ্রতিনিধির স্থানটি দখলে আছে মস্তানদের। মীরপুরের কথা ধরা যাক। ১৯৮৯ সালের প্রথম ছয় মাসে থানার রেকর্ড অনুযায়ী মীরপুরে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ৫শ' ২৭টি, প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, মীরপুরের প্রভাবশালী ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের মস্তান নির্ভরতা। জনপ্রতিনিধি এবং প্রভাবশালীদের অনেকে একসময় নিজেরাই মস্তান ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পর অবাঙালীদের বাড়ী, জমি ও সম্পদ দখলের মধ্য দিয়ে এদের প্রথম অংশটি সম্পদশালী হয়ে ওঠে। অবৈধ মার্কেট তৈরী ও দখল, হাট, টার্মিনাল ও বাজার থেকে টোল আদায়, বাড়ী দখল করে দেয়ার প্রক্রিয়ায় পেশাদারী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে সম্পদশালী হয়ে ওঠে আরেকটি অংশ। সামাজিক আধিপত্য ও প্রতিপত্তি

www.nagorikpathagar.org

বিস্তারের লড়াইয়ে এরা অর্থ ছড়িয়ে দেয়। কিনে নেয় চিহ্নিত ও উঠতি মস্তানদের, গড়ে তোলে নতুন মস্তানশ্রেণী। মীরপুরে সিনেমা হলের মালিক একজন চলচ্চিত্র নায়কের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর অভিযোগ, তিনি বেহিসাবী টাকা-পয়সা ছড়িয়ে পাড়ার বিভ্রান্ত তরুণদের কিনে নিচ্ছেন, হাতে তুলে দিচ্ছেন অস্ত্র, নিশ্চয়তা দিচ্ছেন পুলিশী ঝামেলা এড়ানোর।

মীরপুরের এক মাজারের প্রাক্তন খাদেমের দুই পুত্র সম্পর্কেও এলাকাবাসীর একই অভিযোগ। মীরপুরের অনেক প্রতিনিধি ও প্রভাবশালী ব্যক্তির পূর্ব পরিচয় মস্তান হিসেবে, বর্তমান পরিচয় মস্তানদের প্রমোটর হিসেবে। এদেরই একজনের বিয়েতে তাই গুলি ছুঁড়ে উল্লাস করা হয়, একজনের বাড়ীতে বোমা তৈরী করতে গিয়ে মারা যায় মস্তান ভাগ্নে, একজনের বাড়ীতে আবিষ্কৃত হয় অস্ত্রসম্ভার। মীরপুরের মত এদেশের প্রতিটি এলাকার অধিবাসী আজ কম-বেশী জিম্মি হয়ে আছে মস্তানচক্রের কাছে। এই চক্রের উৎপত্তি ও বিকাশে যে বিপুল অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন থাকে, তার মাশুল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দিতে হচ্ছে গোটা জাতিকে।

মস্তান—অবৈধ স্বার্থচক্রঃ আগেই বলা হয়েছে, মস্তানী এখন পেশাদার পর্যায়ে। ঢাকার মস্তানরা অর্থের বিনিময়ে কাজ সেরে আসে চট্টগ্রামে, বরিশালের মস্তানরা কাজ সেরে আসে ফেনীতে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, কিংবা বড় ব্যবসায়ী তাদের সম্পদ ও প্রতিপত্তি বিস্তৃতির প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ করেন মস্তান বা মস্তানদের পরিচিত কারো সঙ্গে। এই 'পরিচিত' শ্রেণীটি মিডলম্যানের ভূমিকায় কাজ করলেও এর গুরুত্বও কম নয়। এধরনের একজন মিডলম্যানের বক্তব্য-'ঢাকার মস্তানদের আর্মস কালেকশন বেশি, তাদের ইমেজও আতংক সৃষ্টিকারী। ঢাকার ককটেল এক্সপার্ট ও আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী মস্তানদের ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দেয়া হয় ঢাকার বাইরে। ক্ষেত্রবিশেষে ঢাকার বাইরের মস্তানদেরও ভাড়ায় আনা হয় ঢাকাতে।'

প্রধানত নির্বাচনকালীন সময়ই ভাড়াটে মস্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ঢাকার নীলক্ষেতের ছেলে সাইফুল ফরিদপুরে নির্বাচনী সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছিল বছর তিনেক আগে। গফরগাঁও নির্বাচনী কেন্দ্রে হামলা চালানোর সময় প্রাণ হারিয়েছিল লালবাগের কাশেম, এসবই পত্রিকায় প্রকাশিত খবর।

ভাড়ায় মস্তানীর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের ব্যবহার করাও সম্ভব হয়। ভাড়ায় মস্তানী করতে যান এমন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে জানান তার

www.nagorikpathagar.org

অভিজ্ঞতার কথা। ''আদমজীতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয় আমাকে। প্রস্তাবকারী আমারই ক্লাসফ্রেন্ড, একটি শ্রমিক দলের সঙ্গে যুক্ত। আমার মত আরো কিছু ছেলে তার প্রস্তাবে রাজী হয় টাকার বিনিময়ে। বলা হয়েছিল, প্রতিদ্বন্দ্বীরা সশস্ত্র নয়, ককটেল ফাটিয়েই তাদের সভা ছত্রভঙ্গ করে দেয়া যাবে। আমি ককটেল বানাই না, ছোঁড়ার অভিজ্ঞতা আছে। নির্দিষ্ট দিনে পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক আমরা ককটেল চার্জ শুরু করি। সভা ভেঙ্গে যায়; কিন্তু কিছু লোক রুখে দাঁড়ায়। কাটা রাইফেলের গুলিবর্ষণ শুরু হয়। দেয়ালের আড়ালে ছিলাম বলে প্রাণে বেঁচে যাই। আমাদের সঙ্গে ছিল পাইপগান, এলএমজি। এসব দিয়ে কাটা রাইফেলের বিরুদ্ধে লড়াইর প্রশ্নই আসে না। কোনক্রমে পালিয়ে আসি আমরা। তারপর থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর যাই হোক, ঠিকমত প্রিপারেশন না নিয়ে বাইরে অপারেশনে যাব না।

ভাড়াটে মস্তানদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর শ্রেণীটি হচ্ছে পেশাদার খুনিরা। পরিচিত মস্তানদের মাধ্যমেও এদের সঙ্গে যোগাযোগ কষ্টসাধ্য কিছু নয়। পেশাদার খুনি রূপে পরিচিত এরকম একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিচিত্রার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করেন। এ পর্যায়ে তার বক্তব্য ...... আমি যা বলমু, আপনি লিখতে পারবেন না...।' সবটুকু শোনার পর অবশ্য বিচিত্রা প্রতিবেদককে এ ব্যাপারে তার অক্ষমতা সম্পর্কে একমত হতে হয়। পেশাদার খুনীটির একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া হল এখানে। "পাঁচ ছয় বছর আগের ঘটনা। আমার এক বিশ্বস্ত ছেলে আসে একটি প্রস্তাব নিয়ে। একজন স্মাগলারের সঙ্গে বেঈমানী করে তার সমস্ত মালামাল আটকে দিয়েছে কাস্টমস এর এক লোক। প্রস্তাব দেয়া হয় তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়া দেয়ার। পারিশ্রমিক এক লাখ টাকা। স্মাগলারের সঙ্গে সেই ছেলের মাধ্যমে দেখা করে দু'লাখ টাকা দাবী করি আমি। এক লাখ এডভান্স দিতে সে রাজী না হলে আমি কাজটি হাতে নেইনি। দু'এক সপ্তাহ পর খবর পাই, কাস্টমের লোকটিকে মেরে ফেলা হয়েছে। খোঁজ নিলে জানতে পারতাম কে করেছে কাজটি, তবে ততটা আগ্রহ বোধ করিনি। আপনি করলে কিভাবে করতেন কাজটি? প্রশ্নের উত্তরে অবহেলার হাসি হাসেন পেশাদার খুনী। বলেন, 'ইটের ভাট্টি চিনেন..... পুইরা ছাই করা হয়, চিহ্ন থাকে না......।'

এই নৃশংসতা পেশাজীবী মস্তানদের অতি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই অবশ্য সীমাবদ্ধ। আর্থিক স্বার্থের জন্য এর চেয়ে অনেক কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সুযোগ থাকে অন্যান্যের। এক সময় মস্তানদের অর্থ উপার্জনের বড় উৎস ছিল আদম

ব্যবসা। প্রতারক ব্যবসায়ীর বখরা হাতিয়ে কিংবা তার থেকে টাকা উদ্ধার করে দিয়ে প্রচুর টাকার সংস্থান হতো মস্তানদের। আদম ব্যবসার পর মস্তানদের বর্তমান অর্থ উপার্জনের অন্যতম উৎস হচ্ছে মাদকদ্রব্য ব্যবসা। মাদক ব্যবসায়ীসহ অন্য যে কোন অবৈধ ব্যবসা বা কালো টাকার সুবিধাভোগীরা নিজেদের নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালানোর স্বার্থে মস্তানদের অর্থের বিনিময়ে বশীভূত রাখেন। মস্তানদের গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণে অনেক সময় ব্যবসার ক্ষেত্রও গুটাতে হয় তাদের। জাফরাবাদ একসময় নারী ব্যবসার চিহ্নিত জায়গা ছিল। বেশ কিছু বাড়িতে গোপনে নারী ব্যবসা চলতো। বখরার ভাগ দিতে হত মস্তানদের। যে পাড়ায় যত বেশি মস্তান, অবৈধ কাজের সুবিধা সেখানে তত বেশি। এ কারণেই নারী ব্যবসা জাফরাবাদের পর মোহাম্মদপুর এবং মোহাম্মদপুরের পর এখন মীরপুরে স্থানান্তর হয়েছে।

মস্তানদের এসব অর্থ-উৎসের পাশাপাশি রয়েছে আরো কিছু নিয়মিত সংস্থান। পিডব্লিউডির নির্মাণ কাজ পাওয়ার পর সাধারণ কন্ট্রাক্টরের মত মস্তান কন্ট্রাক্টরকেও টাকা দিয়ে শান্ত রাখতে হয় অন্যান্য পেশাজীবী মস্তানদের। সকল নির্মাণ কাজে বখরা, বাড়ি দখল, বাজার, হাট; টার্মিনালের 'ট্যাক্স' আদায়। ছিনতাই রাহাজানি, পাড়ার বিবাদ মিটমাট, এসব হচ্ছে মস্তানদের অর্থ উপার্জনের অবাধ ক্ষেত্র। বড় মস্তান পায় নির্মাণ কাজের টেন্ডার, হাট, বাজার, টার্মিনালের ইজারা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সমিতির নেতৃত্ব। নিজের আর্থিক স্বার্থের ওপর হামলা এড়াতে এবং এর বিস্তৃতি ঘটাতে সে খুশী রাখে ছোট মস্তানদের, সামলে রাখে থানার ঝামেলা। তারও উপরে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত জনপ্রতিনিধি রাজনৈতিক দলের নেতা, বিত্তশালী ব্যবসায়ী। এই অবৈধ স্বার্থচক্রের বিষবাষ্পে ক্ষত ধরে বিবেক, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের। পরিশ্রম, যোগ্যতা, প্রতিভার স্বাভাবিক প্রাপ্তি হয় অসম্ভব। আরো বেশি বিভ্রান্ত হয় আজকের তারুণ্য। ফলাফল হিসেবেই নিজেই জড়িয়ে পড়ে মস্তানচক্রে। সমাজ হতে থাকে ক্রমশ মস্তাননির্ভর।

মস্তানের উত্থান পর্বঃ মস্তান কোন বিচ্ছিন্ন জগৎ-এর বাসিন্দা নয়। পাশের বাড়ি, নিজ পাড়া, কিংবা স্বজন-পরিচিতিজনদের মধ্যেই রয়েছে মস্তানদের ঠিকানা। হাতাশা, মোহ, এড্যাভেঞ্চার প্রবণতা কিংবা সঙ্গদোষ সৃষ্টি করছে মস্তান উত্থানের প্রেক্ষাপট। রায়ের বাজারে এক নামে চেনে এমন একজন মস্তান জানালেন তার উত্থানপর্ব। .....বাবা ছিলেন মৃদী দোকানদার। বড় ভাই এজি

www.nagorikpathagar.org

অফিসে কেরানীর চাকরি পেয়ে বিয়ে করলেন, আলাদা হলেন। অন্য দু'ভাই বাবার দোকানেই পালা করে বসতেন। বড় বোনের বিয়ে হয় হাজারীবাগের চামড়ার আড়ত-এর কর্মচারীর সঙ্গে। তার পরের বোন প্রেম করে বিয়ে করে পাড়ার এক বখাটে বেকারকে, সে বিয়ের বছর দুই পরে এক মেয়ে সহ ফেরত আসে তালাক নিয়ে।

১৯৭৬ সনের ঘটনা। আমি তখন পড়ি ক্লাস নাইনে। বাড়িতে আমার বড় আরো দু'বোন, কেউই পড়াশোনা করে না। আমার এক বন্ধুর বাবা বিরাট বড়লোক, তার দখলে আছে বিরাট এক বস্তি। বস্তির কিছু লোক ঝামেলা করতো, ঠিকমত ভাড়া দিত না। এসব অনেকদিন থেকেই শুনতাম। বন্ধুর বড় ভাই-এর সঙ্গে বস্তির ছেলেদের একদিন ঝামেলা হল, বেধড়ক মার খেয়ে হাসপাতালে গেলেন তিনি। পরদিন পুলিশ এসে গ্রেফতার করে বস্তির কিছু ছেলেকে। বস্তিবাসী ক্ষেপে ওঠে। আমার বাসা থেকে বারণ করা হয় বন্ধুটির সঙ্গে মিশতে। বাসায় সারাক্ষণই অভাব, চিৎকার ও ঝগড়াঝাটি। এসব অসহ্য লাগতো। বাড়ির কারো কথায় পাত্তাই দিলাম না। একদিন বস্তির পাশের মাঠে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে মার খেলাম বস্তির ছেলেদের হাতে। গ্রেফতার হয়েছে এমন এক ছেলের মা বটি দিয়ে আঘাত করে আমার পিঠে। রক্তাক্ত অবস্থায় বাসায় ফিরে কপালে জুটলো বাবার বেধড়ক কিল ঘুষি, মা'র শাপ শাপান্ত। স্কুলে তখন আমার বিরাট হোল্ড, গায়ের জোরে কেউ পারতো না আমার সঙ্গে। সিদ্ধান্ত নিলাম প্রতিশোধ নেব। একরাতে দু'জন বন্ধু নিয়ে আগুন লাগিয়ে দেই সেই বস্তির বেড়ার ঘরগুলোতে। এরপর পাড়ায় থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাড়ি, বড়লোক বন্ধু, বস্তিবাসী সবার ঘৃণার পাত্রে পরিণত হলাম। পালিয়ে গেলাম মামার বাড়িতে। সেখানেও আপদ হয়ে রইলাম। মামার বড় ছেলে তাদের পাড়ার বিরাট মস্তান। আমাকে ব্যবহার করা শুরু করলেন। তাদের ক্লাবের সঙ্গে অন্য ক্লাবের মারামারির দিন প্রথম হাতে নিলাম হকিস্টিক। মা এসে একদিন আমাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন, ততদিনে আমি বুঝে গেছি শত্রুর সঙ্গে কিভাবে টিকে থাকতে হয়। স্কুলে গিয়ে দেখলাম আমি রীতিমত হিরো হয়ে গেছি কিছু ছেলের কাছে। ভক্তের সংখ্যা বেড়ে গেল, স্কুলে যেতাম আড্ডা দিতে, পড়াশোনা একদম বাদ দিলাম। সিগারেট আগেই একটু আধটু খেতাম, এবার পুরোদমে। পয়সা দিত বন্ধুরাই। এটা প্রেস্টিজে লাগতো। বিভিন্ন দোকান থেকে জোর করে বাকী খাওয়া শুরু করলাম। প্রথম যে দোকানদার বাড়িতে এসে নালিশ করলো, তার দোকান ভেঙ্গে তছনছ করলাম। আস্তে আস্তে গোটা পাড়াতেই নাম ছড়িয়ে

পড়লো আমার। বাসা থেকেও অনুরোধ, শাসন, একসময় স্তিমিত হয়ে এল। পার্টনার টাকা মেরে দিয়েছে, বউকে সংসারের খরচ দেয়া হচ্ছে না, এলাকার হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে,–এসবকাজে ডাক পড়তে লাগল আমার। পাশের পাড়ার ছেলেদের সংগে সংঘর্ষ হল বাজারের ট্যাক্স তোলা নিয়ে। এলোপাতাড়ি স্ট্যাব করলাম, পরদিনই পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল। মেরে হাতের হাড্ডি ভেঙ্গে ফেললো আমার। দু'দিন পর থানায় এসে ছাড়িয়ে নিলেন একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা। তার সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল, থানা থেকে বেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা হল। তিনি এখন বড় নেতা, তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে আজো। কাটা রাইফেল স্টেন অনেক চালিয়েছি, এখন নিজে এ্যাকশনে যাই না। মহল্লার বিচারে–আচারে থাকি। গত মাসে পাড়ার এক গরীব মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য দিয়েছি পাঁচ হাজার টাকা। নিজে কন্ট্রাক্টরী করি, রিকশা আছে অনেকগুলি, বাড়ি ভাড়া দিয়েছি। ইচ্ছে আছে সামনে কখনো ইলেকশনে দাঁড়াবো ....।"

সদরঘাট এলাকার এক কুখ্যাত মস্তানের আরম্ভটাই ছিল অপরাধ প্রবণতার মধ্য দিয়ে। তার শৈশবে বাবা মারা যায়, মা বিয়ে করেছে এক মধ্যবয়স্ক লোককে। সৎ বাবা তাদের বাড়িতে আসতো কদাচিৎ, তাকে সহ্যই করতে পারতো না। বিড়ি ফোঁকা, মার্বেল দিয়ে জুয়া খেলা, মারামারি করার অভ্যাস অনেক ছোটবেলা থেকে। মা যে বাসায় কাজ করতো সে বাসায়ই চুরি করে সে প্রথম, ধরা পড়েনি। ১৯৮৩ সনে পাড়ায় যখন একটি রাজনৈতিকদলের নতুন শাখা খোলা হল, তখন মারামারি করে এলাকায় মোটামুটি নাম হয়ে গেছে তার, ছোটখাট একটা গ্রুপও ছিল তার। রাজনৈতিক দলটির স্থানীয় এক যুবনেতা পিক করলেন তাদের। জর্দার কোটা বানানো শেখানো হলো তাকে। এ কাজে প্রচুর পয়সা ছিল, তবে তাকে দেয়া হত কৌটা বিক্রির টাকার একটি অংশ মাত্র। একদিন রোদে বেশিক্ষণ শুকাতে গিয়ে একটি ককটেল ফেটে যায়, তার পুরো হাতের চামড়া ঝলসে যায়। ককটেল বানাতে অস্বীকার করে সে, ভয়ভীতি দেখায় তার দলের ছেলেরাই। এদের দু'গ্রুপের মধ্যে একদিন নেতৃত্ব নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। তার কদর বেড়ে যায়। শুধু বানানো নয়, ককটেল চার্জও শুরু করে সে। একসময় দু'গ্রুপের গোলমাল থেমে যায়। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন খুব খারাপ। প্রায় নিয়মিত সংঘর্ষ হত গুলিস্তান ও সংলগ্ন এলাকায়। সে এবার নিজেই কিছু ছেলেকে ককটেল বানানো শেখাতে শুরু করে, বড় একটি সংঘর্ষের সম্ভাবনা আঁচ করে তার হাতে তুলে দেয়া হয় একনলা একটি বন্দুক। সংঘর্ষের পর সেটি ফেরত দিতে হয়। কিন্তু অবস্থা আস্তে আস্তে এমন হয়ে দাঁড়ায়, সে

www.nagorikpathagar.org

চাইলেই যোগাড় করতে পারে যে কোন আগ্নেয়াস্ত্র। গত বছর সে দলে পোস্ট পেয়েছে। এলাকার ছেলেরা বিশ্বাস করে তার নিজের দখলেই এখন একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে।

সদরঘাটের এই ছেলের মত অসচ্ছলতাই সবসময় মস্তানের উত্থানপর্ব ঘটায় না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মস্তানের আগমন মধ্যবিত্ত পরিবার এবং কিছু ক্ষেত্রে বিত্তশালী পরিবার থেকে। ঢাকার হাজারীবাগের এক বিখ্যাত পরিবারের ছেলে মাস্তান হয়ে যায় নিছক এ্যাডভেঞ্চার করার ঝোঁকে। অনেকগুলো কন্যা সন্তানের পর বাবার শেষ বয়সে তার জন্ম। অতিরিক্ত স্নেহ প্রশ্রয় তাকে ছকে বেঁধে রাখতে পারেনি। ক্লাবভিত্তিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার শুরু। এরপর ভালবাসার মেয়েকে অপহরণ, প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাপড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হওয়া, পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলির স্প্রিন্টারে পায়ের হাড় চূর্ণ হওয়া। দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে আবার মাটিতে পা রেখে আবিষ্কার করলো তার দু'পায়ের দৈর্ঘ্য সমান নেই। তারপর সে আরো হিংস্র হয়েছে, বিভিন্ন গুরুতর মামলায় জড়িয়ে কয়েকবার থানাতে গেছে। বাবার টাকা, প্রভাব সবই আছে।

মগবাজারের এক মস্তান অতি সম্প্রতি মস্তানীতে জড়িয়ে গেছে ড্রাগ আসক্তির মধ্য দিয়ে। বাবার টাকা ছিল, ড্রাগের পয়সার অভাব হতো না প্রথমে। আসক্তি যখন চরমে, তখন সবাই সচেতন হলেন। দীর্ঘদিন ক্লিনিকে থেকে যখন সে ফিরে এল, তখন তার কিছুই ভাল লাগে না। পুরনো আড্ডায় যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বাসা থেকে টাকা পয়সা দেয়া একদমই বন্ধ। পাড়ার মস্তানচক্রে মিশে যায় সে।

নয়াটোলার এক বাড়িতে নারী ব্যবসা হত। তাদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে নিজেরাই হয়ে যায় প্রোটেকটর। টাকা পয়সা পাওয়া যায়, ড্রাগের খরচ এখন আর সমস্যা নয়।

নির্বাচন কেন্দ্র দখল করে বড় মস্তান হিসেবে উত্থান ঘটেছে লালবাগের এক টিনএজার বখাটের। তার প্রার্থী জিতে গেছে, এখন সে জনপ্রতিনিধির ডান হাত। ১২৫ সিসির হোন্ডা চালিয়ে রাস্তা দাবড়ায় সে, তার চোখের ক্রুরতায় নত হয়ে আসে বয়স্কদেরও দৃষ্টি।

মস্তানদের মস্তানীপর্বে প্রবেশ অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই আচমকা। পাড়ার নিরীহ গো বেচারা ছেলেটিকে সবচেয়ে হিংস্র মস্তানে পরিণত হতে দেখা গেছে বিভিন্ন কারণে। চারপাশের অনাচারের কারণে গভীর গোপনে জমতে থাকা অবরুদ্ধ ক্ষোভের কথা সে ছাড়া অনেকেই হয়তো জানতেই পারে না। এ সমাজে

www.nagorikpathagar.org

সুস্থ বিনোদন নেই, সুস্থ প্রতিযোগিতা নেই, সুস্থ স্বপ্ন নেই। কোনঠাসা যুবকের অবরুদ্ধ ক্ষোভ যখন বিস্ফোরিত হয়, তখন সে দৃশ্য ভয়ংকর। মতলববাজ জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক সংগঠন নেতা, কালোবাজারী অবৈধ ব্যবসার মালিকরা যুবকদের এই ভয়ংকরতাকে লালন করে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য। তাই যে ক্ষোভ হতে পারতো সমাজ কাঠামো বদলের প্রেরণা, তা হয়ে যায় ক্ষতবিক্ষত সমাজ কাঠামোর নতুন বিষবাষ্প। সিংহভাগ নির্বিরোধী মানুষের স্বস্তি ও স্বাচ্ছান্দ্যকে অবরুদ্ধ করার সুযোগ বেড়ে যায় মতলববাজদের। হাতিয়ার মস্তান, মস্তানচক্র। কিন্তু সচ্ছলতার বিনিময়ে মস্তান নিজেই হয়ে পড়ে সমাজপতির ব্যবসার সমৃদ্ধ উপকরণ।

কোথাও প্রতিরোধ নেইঃ যে কোন এলাকাতেই হোক, প্রতিটি বড় মস্তানই সুচিহ্নিত। পনের ষোল বছরের নিরীহ কিশোরও টগবগানো উৎসাহ নিয়ে আলাপ করে মস্তানদের প্রসঙ্গ নিয়ে। মস্তানকে চেনে না, মস্তানদের বাহাদুরীর খোঁজ রাখে না, এমন ছেলে অপাংক্তের বন্ধুদের কাছে। অথচ মস্তানদের চেনে না শুধু মস্তান প্রতিরোধের দায়িত্ব যাদের, তারাই। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে সদস্য মস্তানকে যত কম চেনেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ততবেশি সফল ও সচ্ছল। এ অবস্থা গোটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। যে কোন সংঘর্ষ বা অপরাধের ঘটনা ঘটলে মস্তান ধরা পড়ে খুব কমই, বরং পুলিশ এসে সাড়ম্বরে ধরে নিয়ে যায় পাড়ার নিরীহ ছেলেদের, বড়জোর ছোটখাট মস্তানদের। বড়রা ধরা পড়ে খুব কম। কোন কারণে ধরা পড়লেও ছাড়া পায় খুব বেশি। ঢাকা শহরে এমন অনেক চিহ্নিত মস্তান আছে, যাদের বিরুদ্ধে থানায় রয়েছে অসংখ্য অভিযোগ, এলাকাবাসী অতিষ্ঠ এদের অত্যাচারে, পত্রিকায় এদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে বহুবার, অথচ কিছুই থামাতে পারে না এদের। ধরপাকড় শুরু হওয়ার আগেই এরা পেয়ে যায় খবর, সটকে পড়তে ভুল হয় না তাই এদের। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিলুপ্ত হতে চলেছে এ সমাজে। নির্বাচন কেন্দ্র দখল, সংগঠনের প্রভাব বিস্তার, অবৈধ উপার্জনের বিস্তারে মস্তানির কোন বিকল্প নেই। তাই পেশী শক্তির ওপর নির্ভরতা বাড়ছে, মস্তানরা টিকে যাচ্ছে, বিস্তৃত হচ্ছে।

এদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ সচেতনা নেই, তাও নয়। কিন্তু দিক নির্দেশনাহীন। অসংগঠিত ক্ষোভ মস্তান প্রতিরোধে কার্যকর হতে পারে না কখনো। তাছাড়া মস্তান প্রতিরোধের প্রশ্নটিও অনেকাংশে অস্পষ্ট। দেশের

www.nagorikpathagar.org

সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যখন মস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপট, তখন সে অবস্থাকে মেনে নিয়ে মস্তান প্রতিরোধের সদিচ্ছা কার্যকর হতে পারে না। মস্তান আমাদেরই সন্তান। যে যুবক মস্তান হয়েছে তার প্রতিবাদী কণ্ঠকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা হয়নি স্বাধীনতার পর কখনোই। বুঝার বয়স থেকেই সে দেখেছে বৈষম্য, অনিয়ম আর বাঁকা পথের কুৎসিৎ চিত্র। হতাশ যুবক প্রতিবাদী হতে গিয়ে প্রলোভিত হয়েছে। তাই সে মস্তান।

সংসদেও মস্তানঃ মস্তান দমনে বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োগ, মস্তানের সংজ্ঞা ও মস্তান জরিপ নিয়ে ১৯৯০ সালের ১০ই জানুয়ারী বুধবার জাতীয় সংসদে সরকারীদল ও বিরোধীদলের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ হয়। মস্তান কে? এ নিয়ে বেশ রসঘন মন্তব্য, চুটকি ও টীকা-টিপ্পনীও বিনিময় হয়। বিরোধীদল জানতে চান, মস্তানের সংজ্ঞা কি? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদুল হাসান বললেন, যারা মস্তানী করে তারাই মস্তান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাবে এ সত্যও উদঘাটিত হয় যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে মস্তানের সংজ্ঞা জানেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে তিনি মস্তানের যে সংজ্ঞা সংসদে দিলেন অর্থাৎ, জাতির সামনে পেশ করলেন, এমন সংজ্ঞার চেয়ে ভাল সংজ্ঞা দিতে পারে ১২ বছরের কোন সাধারণ মেধার বালকও। যদি দেশের কোন সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়, মন্ত্রী কাকে বলে? লোকটি যদি জবাবে বলে, যে মন্ত্রীগিরি করে তাকে মন্ত্রী বলা হয়। এই সাধারণ লোকের মন্ত্রীর সংজ্ঞা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেয়া মস্তানের সংজ্ঞার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। নম্বর দিলে উভয় সংজ্ঞাকেই একই নম্বর দিতে হবে। কারণ, উত্তরের স্টান্ডার্ড একই, উভয়ের পদের পার্থক্য যাই থাক না কেন।

সংসদে বিরোধীদল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন, মস্তান দমনের জন্য কি দেশে আইন আছে?

মন্ত্রী জবাবে বলেন, দন্ডবিধিতে না কুলালে বিশেষ ক্ষমতা আইন দিয়ে ধরে থাকি। প্রশ্নের ধারে-কাছেও মন্ত্রীর উত্তর ছিল না। কেন যে বারবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন, তাও বুঝা গেল না। মস্তানদের প্রতি তাঁর এই দুর্বলতা বা স্পর্শকাতরতা থাকার হয়তো কারণ ছিল, যা তিনি জানতেন।

বিরোধীদলের আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ) প্রশ্ন করেন, ঢাকা শহরে মস্তানের সংখ্যা কত? তাদের ধরবার অভিযান কোথায় গেল?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সদস্যের প্রশ্নের কাছ দিয়েও না গিয়ে হাসিঠাট্টা ও ব্যঙ্গ-

www.nagorikpathagar.org

বিদ্রুপ তরে জবাব দিলেন। কি জবাব দিলেন? জবাব দিলেন, এই সদস্য ইনফরমার হিসাবে মস্তানের সংখ্যা জানাতে পারলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, তবে জরিপের প্রয়োজন আছে। এ সদস্য রাজি থাকলে তাঁকে চেয়ারম্যান করে মস্তান জরিপ কমিটি গঠিত হতে পারে।

কথায় বলে, আমি কি বলি আর আমার সারিন্দা কি বলে? রসিকতারও একটি স্টান্ডার্ড থাকে, মান থাকে, প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক থাকে, কিন্তু মন্ত্রীর জবাবে এর একটিও ছিল না।

সংসদে আবার প্রশ্ন উঠে, মস্তান কোথায়? স্পীকার এ আলোচনায় যোগ দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, মস্তান শব্দটি উচ্চারণ করে আপনি সামনের দিকে (বিরোধীদলের দিকে) তাকিয়ে আছেন কেন? সংগে সংগে বিরোধীদল থেকে জবাব আসে, সরকারীদলের প্রথম সারিতে উপবিষ্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পিছনেই মস্তান আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, বিরোধীদল আয়নায় নিজ নিজ মুখ দেখছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইংরেজী দৈনিক নিউনেশন ১৯৮৯ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি এই রাজধানীতে মস্তানদের সংখ্যা ৪ হাজার উল্লেখ করেছিল। সে হিসাবে অবশ্য থার্ডক্লাস মস্তানদের ধরা হয়নি। এ সংখ্যা শুধু রাজধানীর ঝানু মস্তানের সংখ্যা, যারা দোর্দন্ড প্রতাপের সংগে রাজধানীতে মস্তানী করে। এই সংবাদের শিরোনাম ছিল এই, 4000 hardcore Moastans (Hoodlums) stalk Dhaka city অর্থাৎ, ৪ হাজার ঝানু মস্তান রাজধানীতে মস্তানী করে থাকে।

মস্তান আর মস্তানীর মত এই ভয়ানক ও গুরুতর সমস্যাটি সংসদে উথাপিত হলেও সরকারফদল ও বিরোধীদল, বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তামাশা ও ইয়ার্কি করে আলোচনাটাই হালকা করে হাওয়া করে দিলেন। এই সমস্যা নিয়ে তাদের হাসি–তামাশা করার ধরন দেখে এ কথাই মনে হয়েছিল যে, তাঁরা এ সমস্যাকে কোন সমস্যা বলেও মনে করেননি। নিন্দুকেরা বলে, মস্তান তো উভয় দলেই আছে, তাই মস্তানদের ব্যাপারে তাঁরা কখনো সিরিয়াস হতে পারেন না। কারণ, মস্তান তাদের প্রয়োজন।

মস্তানদের বিভিন্নমুখী দৌরাত্ম্যের উপর দেশের সব ক'টি পত্র–পত্রিকা প্রায়ই আলোচনা করে থাকে। কিন্তু কে শুনে কার কথা? বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পোষা মস্তানরাই সমাজে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত। এদের দৌরাত্ম্যই বেশী। দেশের রাজনীতি যেহেতু অরাজকতার চরিত্র গ্রহণ করেছে, তখন মস্তান হয়ে

www.nagorikpathagar.org

গেছে রাজনীতির অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অংগবিশেষ। এখন মস্তান ছাড়া রাজনীতি যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠা, এমনকি সমাজে বাস করতে হলেও মস্তানদের সালাম না দিয়ে বাস করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দল ছাড়াও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মস্তান পুষতে শুরু করেছেন। এ দ্বারা তাদের কার্যসিদ্ধি হয়তো হচ্ছে ; কিন্তু সমাজের জন্য তার ফল হচ্ছে ভয়াবহ ও ভয়ংকর। অনেকে আবার শক্তিমানের নিগ্রহ থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশে মস্তানদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এভাবে মস্তানরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। মোটকথা, দেশে মস্তানরা বিকল্প শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বোধহয় এ কারণেই সরকারী ও বিরোধীদলের জন্য 'অপরিহার্য মস্তান বাহিনী' নিয়ে সংসদে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ার আবশ্যকতা আছে বলে কোন পক্ষই মনে করেন না। তাছাড়া সংসদ সদস্যদের মধ্যেও কয়েকজন সদস্যকে কয়েকবারই দেখা গেছে মস্তানী ভূমিকায়। মারামারি, কিলাকিলি আর খুন-খারাবীও সংসদে হয়েছে। ফাইল ছুঁড়ে মারা, পায়ের জুতা হাতে তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে প্রদর্শন আর বক্তৃতার সময় মস্তানী ভাষায় বক্তৃতা পেশ ইত্যাদি মস্তানী ভূমিকায় অনেককেই দেখা গেছে। ফলে রাজধানীর মস্তান নিয়ে কথা উঠলে মস্তানদের মূল মুরুব্বীরা কোন পাত্তাই দেন না। হাসি-তামাশা দ্বারা সময় অতিবাহিত করেন। .১০ই জানুয়ারী ১৯৯০ সালের দৃষ্টান্তটি এরই বড় প্রমাণ। আরও অগ্রসর হয়ে যদি কথা বলা যায়, তাহলে এ কথাই বলতে হয় যে, বিভিন্ন দলের কয়েকজন এমপি মস্তানী লেবাস ছেড়ে নির্বাচন করে এমপি হয়েছেন; হয়েছেন; কিন্তু মস্তানী লেবাস ছাড়লেও মস্তানী চরিত্র ছাড়েননি। কেউ কেউ তো তাদের মস্তান-এমপিও বলে থাকেন। আমাদের দেশের রাজনীতিই যখন মস্তান-নির্ভর হয়ে পড়েছে, তখন মস্তান চরিত্রের লোক এমপি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মস্তানদের ঠিকানাঃ মস্তানদের ঠিকানা প্রসঙ্গে বোধহয় বিস্তারিত আলোচনা না করলেও চলবে। আগের আলোচনায় তাদের ঠিকানা বা আশ্রয় ও আড্ডা আর পৃষ্ঠপোষকতার কথা সাফ জবানে ব্যক্ত করা হয়েছে। তবুও এ সম্পর্কে আরও কিছু বলা যায়।

মস্তান হওয়ার আগে তাদের ঠিকানা থাকে নিজ নিজ অভিভাবকের ঠিকানায়। মস্তান হওয়ার পর তারা ঠিকানা ভাগাভাগি করে নেয়। অর্থাৎ, অভিভাবকের বাসায়ও থাকে, আবার নতুন আড্ডা বা আশ্রয়েও রাত কাটায়।

www.nagorikpathagar.org

ঠিকানার এই পরিবর্তন তারা করে পেশার প্রয়োজনে। তিব্বতদের ঠিকানা ছিল বেশ্যাখানায়। ইমদুদের ঠিকানা ছিল মন্ত্রীর বাসায়। রাজনৈতিক দলের দলীয় বাঘা বাঘা মস্তানের ঠিকানা থাকে দলের অফিসে আর দলীয় নেতা-নেত্রীর বাসায় বা বাসার আঙিনায় ভিন্ন ঘরে। ছাত্র থাকা অবস্থায় যারা মস্তান হয়ে যায়, তাদের স্থায়ী ঠিকানা হয়ে যায় ছাত্রাবাস। সমাজে প্রতিষ্ঠিত, সম্মানিত ও ক্ষমতাবান বলতে যাদের বুঝায়, তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ একান্তভাবে মস্তাননির্ভর হয়ে পড়ার কারণে তাদের প্রযত্নেও বাস করে মাসোহারাভোগী মস্তানরা অত্যন্ত নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে মস্তান হয়ে গেছে অন্ধের যষ্টিতুল্য, তাঁরা একদন্ডও মস্তান ছাড়া চলতে পারেন না। তাঁরা যখন বাসায় থাকেন, তখন তাঁদের মস্তানরা থাকে বৈঠকখানায়, যখন তাঁরা কাজকর্ম নিয়ে বাইরে বের হন, তখন তাঁদের বাহনে আসন থাকে মস্তানের। সাহেব যখন মসজিদে নামাজ পড়তে যান, তখন মসজিদের বাইরে মস্তান দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। সুতরাং তাদের ঠিকানাই মস্তানদের ঠিকানা। তবে একথাও ঠিক যে, এই রাজধানী এবং দেশের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে গঞ্জে যত মস্তান আছে, সকলের ঠিকানা তাদের পেশা-মুরব্বীদের ঠিকানায় নয়। সম্ভবও নয় স্থায়ী ভাবে তাদের পেশা ঠিকানা দিয়ে পুনর্বাসিত করা। তাই অধিকাংশ মস্তান নিজ নিজ অভিভাবকের ঠিকানায়ই থাকে। ডাক দিলেই আসে, কামলা খাটে, পারিশ্রমিক নিয়ে কেটে পড়ে। ফ্রীল্যান্স সাংবাদিকের মত ফ্রীল্যান্স মস্তানও আছে। আমার মতে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তারা সংগঠিত। এই ক্লাব, ঐ ক্লাব, অমুক ক্লাব তমুক ক্লাব, এভাবে হাজার হাজার ক্লাবে দেশ ছেয়ে গেছে। ফ্রীল্যান্স মস্তানরা এগুলো পরিচালনা করে; তবে এসব ক্লাবে রয়েছে নানা শ্রেণীর মস্তান সদস্য। ক্লাবভিত্তিক প্রায় সকল মস্তানের ঠিকানা হচ্ছে নিজ নিজ পৈতৃক নিবাস। এদের ঠিকানা সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই, বাংলাদেশের মস্তানদের আসল ঠিকানা এই বাংলাদেশ। মস্তানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সরকারই করে থাকেন। একাধিক ঠিকানার মানুষ হচ্ছে মস্তান।

www.nagorikpathagar.org

আমি সর্বনামের মুখোশেঃ যাদের জবানবন্দী নিয়ে এবং জবানবন্দীর ভিত্তিতে এই পুস্তকের রচনা, তারা নামহীন নয়। তবে নাম থাকলেই যে সব সময় নাম প্রকাশ করতে হবে, এমন তো কোন কথা নেই। যাদের জবানবন্দী নিয়ে এই পুস্তক, তাদের প্রত্যেককেরই অনুরোধ ছিল এই, আমার নাম ছাপাবেন না। আমি কথা দিয়েছিলাম। ছবি কেউ দেননি। কেন নাম ঠিকানা ছাপবো না? এ প্রশ্নও করেছিলাম কয়েকজনকে। একজন বললেন, কাজটা যে ভাল করছি না, তা বুঝি, আমার দ্বারা পরিবারের ইজ্জতও নষ্ট হচ্ছে। হয়তো একদিন ভাল হয়েও যেতে পারি, একদিন সংসারী হবো। আমার সন্তানেরা আমার পেশা গ্রহণ করবেনা বলে আমি মনে করি। যদি তারা আমাকে অনুসরণ না করে মহৎ, সরল ও সুন্দর জীবন যাপন করে, তাহলে তারা আমার নাম-ঠিকানা ও ছবি পুস্তকে দেখে খুবই শরমিন্দা হবে। বংশ পরম্পরায় এই রেকর্ড একটা কলংক হয়ে আমার বংশে বিরাজ করবে। হয়তো আমার বংশ থেকে বহু ভাল মানুষ, এমনকি খ্যতিসম্পন্ন মনীষীও জন্ম নিতে পাবে। তারা কোনদিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না শুধু আমার কলংকিত জীবনের কারণে, যদি আমার জীবন-কাহিনী পুস্তকে ইতিহাস-কাহিনীর মত রেকর্ড হয়ে থাকে।

এসব কারণেই আমি তাদের নাম-ঠিকানা ও ছবি পেশ করিনি। তাদের বক্তব্যই শুধু পেশ করেছি। কে কি অবস্থায় এবং কি কি কারণে ও পরিবেশে মস্তান হয়েছে, এই বয়ানই মনে করা যেতে পারে তাদের পরিচিতি। আমি এখানে ১০ জন মস্তানের পরিচিতি তুলে ধরছি, যারা ১০ রকম পরিবেশ ও অবস্থার শিকার হয়ে মস্তান জীবনে প্রবেশ করেছে। তাদের মস্তান হওয়ার পৃথক পৃথক কারণ ও কাহিনী রয়েছে। আমি এখানে এক এক করে তাদের হাজির করছি 'আমি' সর্বনামের মুখোশ পরিয়ে। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হচ্ছে নিম্নরূপ।

আমি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বটে, তবে আমি সম্ভ্রান্ত নই। ছাত্র জীবনের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ভদ্র সন্তান ও মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলাম। মেধাবীদের জন্য মেধা হয় আশীর্বাদ, আমার জন্য হয়েছিল অভিশাপ। আমার মেধা বিশেষ এক জনের বদনজরে পড়ে। এই বদ নজরে পড়ে আমার মেধাও গেল, চরিত্রও গেল। ভুল বললাম, মেধা হারিয়ে যায়নি, মেধা আছে, তবে পড়াশুনায় না লেগে তা অন্যকাজে লেগেছে। যার বদনজরে পড়ে আমি বরবাদ হয়েছি, তিনি এ দুনিয়াতে আর নেই, আমি কিন্তু আছি তার সর্বনাশা অতি

www.nagorikpathagar.org

ভালবাসার জীবন্ত স্বাক্ষী হিসাবে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমি। বাদবাকী পরিচয় পত্রিকার পাতায় নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। হাঁ, অশ্লীল সাহিত্য ও পত্র পত্রিকা আমাকে মস্তান বানিয়েছে অতি ভালবাসার কুনজরে পড়ার পরই।

আমি এক সাবেক মন্ত্রীর সন্তান। রাজনীতিই আমাকে মস্তান বানিয়েছে। বাবা ক্ষমতায় থাকতেই ময়দানে ঘটে আমার আবির্ভাব। বাবার মন্ত্রীগিরীর আমলেই আমার খেয়ালের লাল ঘোড়াকে যেদিকে খুশী সেদিকে দাবড়িয়েছি, সে দিকেই দৌড়েছে। বাধাহীন খেয়ালের এই সফল অনুশীলন আমাকে ভীষণ সাহসী করে তোলে। এখন বাবা ক্ষমতায় নেই, তাই আমার খেয়ালের ঘোড়া মাঝে মাঝে বাধা পায়, কিন্তু এ বাধা তেমন অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারেনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি, ছাত্রাবাসে থাকি, ছাত্র হিসাবেই আছি।

আমি এক ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। পুরাণ ঢাকায় পৈতৃক নিবাস। কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছাত্র রাজনীতি করি। আমার বর্তমান জীবন গঠনের পহেলা সবক অর্জন করি ভিসি আর এর মাধ্যমে। এক বন্ধু আমাকে জীবনের শুরুতে নিয়ে যায় ভিসিআর দেখতে। ভিসিআর-এর জালে আটকা পড়ে গেলাম। তারপর এলাইনেই এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে প্রমোশন হলো। এখন আছি এই ধাপে।

আমি এক কৃষকের সন্তান। পতিতালয় আমাকে মস্তান বানিয়েছে। আমার ছাত্রাবাসের পাশেই ছিল পতিতালয়। আমার চরিত্রের পতন ঘটে সেখানে থেকেই। এখন এক রাজনৈতিক দলের লাঠিয়ালী করি। লেখাপড়া এইচ এস সি পর্যন্ত। বর্তমানে যৌন রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন আছি। লেখাপড়ার ইতি ঘটেছে অনেক আগে।

আমি এক আইনজীবির সন্তান। আমার জীবনের উপর টেলিভিশনই প্রথম প্রভাব বিস্তার করে। এইচ এস সি পাস করেছি। টেলিভিশন দেখে যে মানসিকতা গঠন হয়, আমার সেই গঠিত মানসিকতাকে ছিনতাইয়ের কাজে লাগায় আমার এক খালাতো ভাই । শুরু থেকে এ পর্যন্ত সে কাজেই আছি। তবে পরিবর্তন চাই, ভাল একটা পরিবর্তন।

আমি এক পুলিশ অফিসারের ছেলে। বিয়ে পাস করতে পারিনি। এক রূপসীর প্রেমে পড়েছিলাম, কিন্তু তাকে পাইনি। এর পর থেকে সুন্দরীদের দেখেলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। তাই রূপসীদের পিছনে পিছনে দৌড়াই।তারা যে ভাবে সেজেগুজে বের হয়, তা তো প্রদর্শনের জন্য। আমরা দর্শন ও ধর্ষণ দুটোই করি। জানিনা, এ দৌড় কবে শেষ হবে।

আমি এক রাজনীতিবিদের সন্তান। আমিও রাজনীতি করি, তবে বাবার রাজনীতি নয়, আমার রাজনীতি আমি করি। লেখাপড়া এইচ এস সি পর্যন্ত। সিনেমা আমার চোখ খুলে দেয়, মনকেও। আমার বর্তমান জীবনের ভিত গড়ে উঠে এই মাধ্যমের দ্বারা। তারপর যা হবার তাই হলো, জীবনের নানা বাঁক ও মোড় ঘুরে এখানে এ অবস্থায় আছি। যা দিযে আমার জীবনের শুরু, তার মধ্যে এখন আমি আবদ্ধ নই। মস্তান জীবনে আমার উত্তরণ কি ভাবে ঘটলো, তা আমার জবানবন্দীতে পাঠ করুন।

আমি এক শ্রমিক নেতার সন্তান। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আনন্দ মেলা আর নানা প্রদর্শনী আমাকে মস্তান বানিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের আনন্দ উপভোগের •উপকরণের একত্র সমাবেশ একটি জায়গায় ও একই সময়ে যখন দেখলাম, তখন আমি যেন আত্মহারা হয়ে পড়লাম। আমি দেখলাম এবং উপভোগও করলাম। এই যে শুরু, তার শেষ হলো আমাকে শেষ করার পর। কোন রোগ যখন আক্রমণ করে, তখন যদি চিকিৎসা করা না হয়, তাহলে এক রোগ থেকে যেমন নানা রোগ সৃষ্টি হয়, আমার ব্যাপারেও হয়েছে তাই। মস্তান জীবন সেই প্রথম রোগের ভয়ংকর পরিণত রূপ।

আমি এক শিক্ষকের ছেলে, তবে আমাদের পরিবার ব্যবসায়ী পবিরার। কুসঙ্গে সর্বনাশ হয়েছি। নেশা আমাকে মস্তান বানিয়েছে। সিগারেট থেকে হেরোইন, কোনটা বাদ দেইনি। শুধু নেশার জন্য অর্থ যোগাড় করতে গিয়ে ছিনতাই থেকে শুরু করে সকল অপরাধই করেছি। এখন আমার নেশা নেই, তা আমার মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও নেই। বোধ হয় আমি বেঁচে গিয়েছি।

www.nagorikpathagar.org

আমি এক কৃষকের সন্তান। এইচ এস সি পাস করেছি। পাস করার পর চাকুরীর জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু চাকুরী পাইনি। ছোট ভাই বোনদের আর মার কষ্ট দেখে পাগলের মত বাড়ী থেকে বের হয়ে গেলাম। ঢাকায় আসি এক পরিচিত জনের কাছে। তিনি মস্তবড় চাঁদাবাজ। তার পেশার সংগে একাত্ম হয়ে পড়ি। বেকারত্বই আমাকে দিশেহারা করে এ পথে নামায়। শুরুতে কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা হলে আজ আমি এ পরিচয়ে পরিচিত হতাম না।

আমি এমন অনেক মস্তানের সাথে মিশেছি, তাদের কথা শুনেছি, কথা নোট করেছি কখনো কাগজে এবং কখনো হৃদয়পটে, তারপর তাদের মূল বক্তব্যকে অবিকৃত রেখে আমার ভাষায় উপস্থাপন করেছি। জবানবন্দীর ভাষা আর বিন্যাস আমার অর্থাৎ লেখকের, কিন্তু মূল বক্তব্য ''আমি'' সর্বনামের এই ১০ জনসহ অনেকের। কোন কোন পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন, সবই কল্পনা, রূপক আর গল্প। আমার অনুরোধ, এমন কিন্তু ভাববেন না। কল্পনার আশ্রয় আমি কখনো গ্রহণ করিনি, তবে নানাভাবে নানা সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় অবিন্যস্তভাবে পাওয়া মাল–মসলা রিফাইন করে পরিবেশন করেছি মাত্র। এই সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে, ঝুঁকি নিতে হয়েছে, অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, এমন কি তথ্য সংগ্রহের জন্য অর্থের বিনিময়ে মাধ্যমও ধরতে হয়েছে। আহরিত উপকরণ পরিশোধন করতে গিয়ে প্রচুর খাদ পেয়েছি, তা ফেলে দিতে হয়েছে। খাদ ছাড়া যা পেয়েছি, তা আপন মনে সাজিয়ে পরিবেশন করেছি।

www.nagorikpathagar.org

আমরা বনাম আপনারা

আমরা ঃ এই পুস্তকে 'আমরা' শব্দটি 'মস্তান' বিশেষ্যের সর্বনাম। 'আমরা' মানে মস্তানেরা। এই ধরুন যাদের বয়স পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে, তারা হতে পারে ছাত্র বা অছাত্র, যারা রাজনীতির ময়দানে লাঠিয়াল হিসাবে ভাড়ায় খাটে, লাঠি ঘুরায়, মাথা ফাটায়, বোমা ফাটায়, মিটিং ভাংগে, ভোটের বাক্স ছিনতাই করে, বাড়ী দখল করে, মারদাঙ্গা আর ব্লুফিল্ম দেখে, লারেলাপ্পা ললনা দেখলে মাথা গরম করে পিছু ধাওয়া করে, পথ আগলায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে, ধর্ষণ বা অপহরণ করে, মেলায় গিয়ে মর্দামি করে, প্রাইভেট খাজনা উঠায়, অশ্লীল সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা বেশী বেশী পাঠ করে, নেংটা ছবির এ্যালবাম বুকে নিয়ে ঘুমায়, শিক্ষক পিটায়, আগুন জ্বালায় আর বিপদে পড়লে রাজনীতির সাইনবোর্ড লাগিয়ে পার পায়, তারা এই পুস্তকের 'আমরা' সর্বনামে বহুবচনে সংঘবদ্ধ প্রথম পুরুষ।

'আপনারা' ঃ মানে তারা, যারা উঠতে বসতে মস্তানদের গালি দেন, অবশ্য সামনাসামনি নয়, আড়ালে-আবডালে, পত্রিকার পাতায়, খোশগল্পে, কথোপকথনে আর গরম গরম বক্তৃতায়। 'আপনারা' মানে তারা, যাদের সাজানো সমাজে মস্তানদের জন্ম। যাদের ব্যবস্থাপনায় মস্তানদের জীবন গঠন, যাদের ইলিম-তালিমে মস্তানদের পঠন-পাঠন এবং দৈহিক অনুশীলন। আমরা সকলেই দায়ী-আমি, আপনি, তিনি, একবচনে ও বহুবচনে। তবে কার ভূমিকা কতটুকু তা বলা মুশকিল। এক কথায় মস্তান ছাড়া সকলেই 'আপনারা' পংক্তিভুক্ত, বহুবচনে সর্বনাম তবে দ্বিতীয় পুরুষ।

মস্তানদের মনের কথাঃ আমরা আপনাদেরই সন্তান। আমাদের দুঃখবোধ আছে, আনন্দ প্রকাশের সাধ-আহলাদ আছে। আমরা চাই , আমাদের কোন আচরণ এমন যেন না হয়, যে আচরণের জন্য আমাদের মা-বাবাকে গাল-মন্দ শুনতে হবে এবং আমাদের হতে হবে তিরস্কৃত। আমরা অবশ্য এমন হতে চাইনি; কিন্তু তবুও হয়ে গেলাম অর্থাৎ, এমন হতে বাধ্য হলাম। এজন্য আমাদের চাল-চলন আপনাদের ভাল লাগে না। আপনারা তাই আমাদের মস্তান বলে ডাকেন। এজন্য আমাদের মা-বাবা এবং অভিভাবকদের উদ্দেশে প্রতিদিন

www.nagorikpathagar.org

অসংখ্য নর-নারী গালি বর্ষণ করে থাকেন। অভাবী, বেকার ও হতাশাগ্রস্ত লোককে যদি সোহাগ করেও বারবার পাগল বলা হয়ে থাকে, তাহলে তার জীবনজ্বালা পাগলামির দিকে মোড় নিতে বাধ্য। আমাদের হয়েছে সেই দশা। আপনাদের প্রবর্তিত জীবনধারায় চলে এবং বেকারত্ব আর নানা হতাশায় দিশাহারা হয়ে বিভিন্নভাবে অস্থিরতার যে প্রকাশ ঘটাতে বাধ্য হচ্ছি, তাকে আপনারা মস্তানী বলে অভিহিত করছেন। আমাদের মস্তান নামে চিহ্নিত করে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাম রেখেছেন 'মস্তান'। আমরাও যখন দেখলাম, আমাদের শক্তি-সাহস, উদ্যম আর যৌবন জোয়ারকে আপনারা জাতীয় কল্যাণ খাতে ব্যবহারের কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না; বরং অবজ্ঞা করছেন, তখন বাধ্য হয়ে আপনাদের দেয়া মস্তান খেতাবকে জীবনের মাঝে একাকার করে নিলাম। বলুন তো, এছাড়া আমরা আর কি করতে পারতাম? শুধু তাই নয়, এ লাইনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য আমরা নিজেদেরও উৎসর্গ করে দিলাম।

আমরা মস্তান হয়ে দেখলাম, ছোট থেকে বড় সকলে আমাদের সমীহ করে চলেন, নজর-নেয়াজ নিয়ে এগিয়ে আসেন, দলে টানেন; কিন্তু আড়ালে ঘৃণা করেন, গালি দেন। আমরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে অসাক্ষাতের মন্তব্য না শুনার ভান করে সাক্ষাতের সালাম আর নগদ যা পেলাম তাই হাত পেতে নিলাম। আড়ালে-আবডালের গালি-গালাজ শ্রবণে কানটা কিন্তু খাটো করে দিলাম।

আপনারা যতদূরে আমাদের ঠেলে দিয়েছেন, ততই আমরা আপনাদের উপর চেপে বসতে শুরু করেছি। আপনারা আর আমরা একই সমাজে বাস করেও যেন পৃথক দুটি সমাজের মানুষ হয়ে পড়েছি, কিন্তু পরস্পর বিরোধী দুটি জীবনধারা সাংঘর্ষিক পথে চলছে। আরো লক্ষ্য করে দেখুন, আমাদের প্রতি আপনাদের ঘৃণা যত বাড়ছে, ততই আপনাদের সমাজের সদস্য সংখ্যা আনুপাতিক হারে কমে আমাদের সমাজের সদস্য সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে দেশে সন্ত্রাসের যত খবর সংবাদপত্রে পড়েন বা টিভি-রেডিওর মাধ্যমে শুনেন ও দেখেন, এসবই কিন্তু ঐ মস্তানী ব্যাপার-স্যাপার। আমাদের এ সমাজে কোনদিন মস্তান ছিল না, কিন্তু সত্তর দশকে তাদের আবির্ভাব ঘটছে বেশ জোরেশোরে। এজন্য আপনারাই দায়ী। আমরাও কোনদিন মস্তান হতে চাইনি; কিন্তু আপনারা আমাদের মস্তান হতে বাধ্য করেছেন। গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখুন, আপনারাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের মস্তান বানাবার সব আয়োজন করেছেন। আমরা ফ্রাংকেনস্টাইন হয়েছি আপনাদেরই কারণে। ঘাড় মটকাচ্ছি, সেও আপনাদের

www.nagorikpathagar.org

দেয়া প্রশিক্ষণ অনুশীলন করে। আমরা ভাল মানুষ হতে চাই; কিন্তু তা হতে দিচ্ছেন না; বরং মস্তানী লাইনে আমাদের আরো বেশী দুঃসাহসী ও দুর্বার হওয়ার জন্য আপটুডেট ব্যবস্থা করে রেখেছেন। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বড় বড় মস্তান হওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক পন্থায় হাতে-কলমে আমাদের টেনিং দিয়ে গড়ে তোলার জন্য আপনারা ব্যস্ত রয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে আমাদের স্বখাত সলিলে ডুবাচ্ছেন, আমাদের জবানবন্দীতে রয়েছে তারই বিবরণ।

রাগ করবেন না। আমাদের জবানবন্দী ধৈর্য সহকারে মুক্তমনে পাঠ করার পর বলবেন, আমরা কোন্ কথা অসত্য, অযৌক্তিক এবং অবাস্তব বললাম। যদি আমাদের জবানবন্দীতে তেমন কোন ত্রুটি না পান, তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে আপনারা যে কুৎসা রটনা করেন, তা থেকে কি বিরত থাকবেন? আপনারা কি আগে সংশোধিত হবেন?

মস্তানী প্রশিক্ষণ তারা লাভ করেছে বিরোধীদল ও সরকারীদল থেকেই। তারা মস্তানদের গুরু। প্রশিক্ষণ লাভ করেছে এক শ্রেণীর শিক্ষক আর শিক্ষালয় থেকে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা থেকে, টেলিভিশিন, ভিসিআর, সিনেমা, নেংটা ছবির এ্যালবাম, ব্লু-ফিল্ম, অশ্লীল সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা, পতিতালয়, ভ্রাম্যমাণ নারী আর সন্তানের নামে অন্ধ মা-বাবাদের থেকে। একে একে সব কথা তারা খুলে বলেছে। তাদের জবানবন্দীতে কিছুটা হালকা কথা, এমনকি অশ্লীল কথাবার্তাও এসে গেছে। জানি, এগুলো আলগা রুচিবানদের বদহজম হবে, কিন্তু তাদের ভাষায় রুচি তালাশ করতে যাবেন না। কারণ, ভাল রুচি দিয়ে আমরা তাদের মানুষ করিনি। তাদের নোংরা জীবনের কাহিনী শুনতে হলে আপনাদের কান আর মনটাতে নোংরামির কিছু ছোঁয়া অবশ্যই লাগবে। আপনাদের সুরুচিতে কিছুটা কুরুচি মিশবেই, নোংরা মানুষের কাছে দাঁড়ালে দুর্গন্ধ নাকে লাগবেই। মস্তানদের অভদ্র জবানকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে বক্তব্য পেশ করেছে। এত সচেতন ও সতর্ক হওয়ার পরও যদি দু'দশটা নোংরা কথা বেখেয়ালে এখানে আমি পরিবেশন করে থাকি, তাহলে ক্ষমা করে দেবেন।

শুনুন এবার তাদের জীবন বিড়ম্বনার দফাওয়ারী কাহিনী, যা মস্তানদের জবানবন্দী নামে জনতার আদালতে, বিবেকবানদের বিবেকের কাছে আর আগামী দিনের মানুষের উদ্দেশে পেশ করা হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

জবানবন্দীর পূর্ব কথাঃ তারা মস্তান; কিন্তু কিভাবে তারা মস্তান হল, সে কাহিনী কেউ কোনদিন জানতে চাননি। কি কি কারণে এবং কোন্ পরিবেশের শিকার হয়ে তারা মস্তান হয়ে মস্তানী করছে, কেউ কখনো তাদের কাছে ডেকে দরদী কণ্ঠে জিজ্ঞাসাও করেনি। যে জীবনধারায় তারা চলছে, সেই জীবনধারা পরিবর্তনের জন্য ভাল কোন উপদেশও কেউ কোনদিন তাদের দেননি। এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে শোধরাবার বিকল্প কোন কর্মসূচীও কেউ পেশ করেননি। অপরপক্ষে সকলেই তাদের ঘৃণা করে চলছেন, নিরাপদ দূরত্বে থেকে গালি-গালাজ করছেন, পুলিশ দিয়ে ঠেংগাচ্ছেন, সুপথের সন্ধান দিচ্ছেন না, সুপথে চলার মত পরিবেশ সৃষ্টি করছেন না, মন্দ থেকে ভাল হওয়ার কোন দৃষ্টান্তও কেউ তাদের সামনে তুলে ধরছেন না, শুধু গাল দিয়েই সকলে ভাল মানুষ সাজছেন। তাদের বর্তমান জীবনের পটভূমিকে এই ভাল মানুষরা জানবার কেন চেষ্টা করেন না? কেন তারা তাদের দেখলেই পাশ কেটে চলেন? তাদের এই অনীহা আর এড়িয়ে চলার রহস্যও উদঘাটিত। এই উদঘাটিত রহস্য হচ্ছে এই, তারা যদি মস্তানদের কলংকিত জীবনের কারণগুলো জানতে চেষ্টা করেন, তাহলে আসামীর কাঠগড়ায় তাদেরই আগে দাঁড়াতে হবে, এমনকি বিচারে তারা দোষীও সাব্যস্ত হতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। সেই আদালতের বিচারে মস্তানরা হয়তো বেকসুর খালাসও পেয়ে যেতে পারে। শুধু এই ভয়ে সমাজপতিরা চালাকি করে একতরফা গালি-গালাজ করে কেটে পড়েন। খুব বেকায়দায় পড়ে গেলে পুলিশের আশ্রয় নিয়ে তাদের নিরাপত্তাকে নিরুপদ্রব রাখেন।

তারা মস্তান। তাই তাদের জাত ভিন্ন, তাদের পেশা ভিন্ন, তাদের চাল-চলন ভিন্ন, এমনকি তাদের চেহারা-ছুরতও সাধারণ মানুষ থেকে কিছুটা ভিন্ন। এই ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়েই তারা সমাজে ভিন্ন হয়ে আছে। তারা এই পেশায় নামার আগে যাদের মস্তান বলা হতো, তারা দুনিয়া-পাগল পীর ও মাজার ব্যবসায়ীদের বাহিনী। তারা সবসময় মাজারের চারপাশে ঘুর ঘুর করে, নানা অকাম-কুকাম করে, গাঁজা খায়, শিকার ধরে, নজর-নেয়াজ আদায় করার জন্য নানা রকম ফন্দি-ফিকিরের জাল ফেলে, পথভোলা মহিলাদের নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে বিনারশিতে বেঁধে রাখে । এক কথায় বলা যায়, ঐ মস্তানরা হচ্ছে ভণ্ড পীর আর মাজারের গুন্ডাবাহিনী। এই দুরাচারদের পেশা- উপাধিটা উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ঘাড়ে চাপিয়েছে সমাজ। যদিও তারা কোন পীর বা মাজারের সাথে সম্পর্ক রাখে না।

www.nagorikpathagar.org

সমাজ তাদের মস্তান বলে ডাকে; কিন্তু তারা তো মস্তান হয়ে জন্ম নেয়নি। বাবা-মা তাদের নাম রেখেছেন। মা-বাবার রাখা নামেই ছিল পরিচিত। পুলিশের খাতায় তারা মা-বাবার রাখা নামে নথিভুক্ত। মস্তান হচ্ছে সমাজপতিদের দেয়া নাম, যা তাদের আচরণের প্রতিনিধিত্ব করে। মা-বাবার সোহাগ ও শাসনে যতদিন ছিল, ততদিন তারা সমাজে ভাল ছেলে হিসাবেই পরিচিত ছিল, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্বাধীনভাবে বিচরণের ছাড়পত্র পাওয়ার পরই সমাজপতিদের সাজানো যে পরিবেশ তারা দেখল, সে পরিবেশ ভাল না মন্দ, সেই বিচার-বুদ্ধি মগজে আসার আগেই সৃষ্ট সেই পরিবেশের শিকার হয়ে পড়ল। উঠতি বয়সের সন্ধানী মন নিয়ে যা দেখেছে, তা দ্রুত উপলব্ধিতে এনে সে অনুযায়ী অনুশীলন শুরু করে চরিত্র গঠন করার প্রয়াস পেয়েছে। সেই অনুশীলনে কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করেছে এবং এখনও করছে। এ অনুশীলন যদি অপরাধ বলে গণ্য হয়ে থাকে, তাহলে এজন্য দায়ী কে-যারা অনুশীলন করছে তারা, না যারা এমন অনুশীলনের পরিবেশ আগে থেকে সৃষ্টি করে রেখেছেন তারা? মস্তানী পরিবেশ যারা সৃষ্টি করে রেখেছেন তারা মস্তান নয়, তারা রুচিশীল ভাল মানুষ। অথচ তারাই তো মস্তানদের ওস্তাদ খেতাব পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু আফসোস, সমাজটা তাদের দ্বারাই পরিচালিত বলে তারা ভাল মানুষ সেজে সব অপকর্মের দায়-দায়িত্ব নবীনদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে অভিজাতও ভদ্র হয়ে সমাজে বাস করছেন। জনগণের আদালতে, ভবিষ্যতের মানুষের কাছে, আগামীদিনের গবেষক ও ঐতিহাসিকদের কাছে মস্তানদের ফরিয়াদ, "আপনারাই বিচার করে দেখুন, আমাদের এ অধঃপতনের জন্য দায়ী কে বা কারা? এ পরিবেশটা কি আমরা সৃষ্টি করেছি, না সৃষ্ট পরিবেশে বাস করে এমন হয়েছি, সে বিচার করবেন আপনারা। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ থাকলে কি আমরা মস্তান হতে পারতাম?"

উচ্চ স্বরে কথা বলার অভ্যাস যাদের আছে, তারাও মসজিদের ভিতর কারও সংগে কথা বললে উচ্চ স্বরে কথা বলেন না। এমনকি পাঠাগারে প্রবেশ করলেও তারা উচ্চ স্বরে কথা বলেন না। কারণ, মসজিদের বা পাঠাগারের পরিবেশই এমন শান্ত ও গম্ভীর যে, কণ্ঠের নিয়ন্ত্রণ আপনা থেকেই হয়ে যায়।

মসজিদের পরিবেশে মন্দ কথা বলা বা মন্দা চিন্তা করা যায় না। পরিবেশই কণ্ঠকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আবার মাছের বাজারে গিয়ে জোরে কথা না বললে মাছের দামটা মাছওয়ালা বলবে না। কারণ, সে আপনার মোলায়েম চুপ চুপ কথা শুনবে না। আর এ কারণে আপনার মাছ কেনাও হবে না। উচ্চ স্বরে মাছের দাম

www.nagorikpathagar.org

জিজ্ঞাসা করতে হবে, এটাই মাছের বাজারের পরিবেশ। সুতরাং মস্তানরা মস্তান হয়েছে পরিবেশের কারণে, তাই তারা পরিবেশের শিকার।

এই মস্তান বাহিনীতে রয়েছে তাদের সন্তান, যাদের বাবা-চাচা মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, মাতব্বর, চেয়ারম্যান, উকিল-ব্যারিস্টার, ব্যবসায়ী, শিক্ষকসহ বড় বড় পদাধিকারী ও ক্ষমতাধর। তাই তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে অনেকেরই কলিজা কাঁপে। তদের প্রায় সকলেই মা-বাবার ফ্রি হোটেলের বাসিন্দা। খাওয়া-পরা ও থাকা সবই ফ্রি। মস্তান হওয়ার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হচ্ছে শহর। কারণ, শহরে আইনের ও প্রশাসনের বড় বড় কর্মকর্তারা বাস করেন, আইন-শৃংখলা বাহিনীর অধিকাংশও শহরে মোতায়েন। এজন্য ম্যানেজ করে মস্তান হওয়ার সুবিধাও এখানে বেশী। কারণ, গ্রামে সেই সুযোগ-সুবিধা নেই। গ্রামের সমাজ কিন্তু সর্বাবস্থায় শহরের আইনের উপর নির্ভরশীল নয়। গ্রামে ম্যানেজ করে মর্দামী করার ব্যবস্থাও নেই। গ্রামীণ সমাজে ফ্রি স্টাইলে চলা মুশকিল। গ্রামেও নৈতিক অবক্ষয়ের ধস নেমেছে, কিন্তু ধস নামার পরও ঐক্য আছে। পক্ষান্তরে শহরে কোন ঐক্য নেই। এই অনৈক্যই মস্তানদের পুঁজি। গ্রামে থাকে দু একটি রাস্তা, তাও নানা বাড়ীর পাশ ঘেঁষে চলে গেছে, তাই একের খবর অন্যজন জানেন। একজন ডাক দিলে দশজন এখনও এগিয়ে আসে; কিন্তু শহরে এসবের বালাই নেই, হাজারটা অলিগলি, পথ আর রাজপথ, কিন্তু কেউ কারো খবর রাখে না, নীচতলার লোকের সংগে উপরতলার মানুষের বছরেও সালাম-আদাব বিনিময় হয় না। একজনে ডাক দিলে দশজন সাড়া দেয়া তো দূরের কথা; বরং ঘরে খিল দেয়। শহরে কেউ কারো নয়, মস্তানদের সুবিধা এখানেই। তারা ফ্রি ফুডিং লজিং আর জাঁদরেল জাঁদরেল অভিভাবকদের মজবুত ব্যাকিং পেয়ে হয়েছে দুর্বার। প্রশাসনও তাদের খুব একটা জ্বালাতন করে না। কারণ, প্রশাসনের বড় বড় কর্তার অনেকেই তাদের কোন না কোন মস্তানের বাবা, চাচা, খালু, মামা বা ভাই-বন্ধু। তা না হলেইবা কি, মস্তানের বাবা তার ছেলের বন্ধুর বিপদে এগিয়ে অবশ্যই আসেন। তবে মস্তানদের তৎপরতা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন ঐ ভাল মানুষগুলো হৈ চৈ শুরু করে দেন, সে সংকটময় সময়ে দু-চার দিন এদিক-ওদিক তারা সরে থাকে। এসময়ে সবই ম্যানেজ হয়ে যায়। প্রশাসন তাদের খুব বেশী জ্বালাতন করে না ভিন্ন কারণেও। তাদের প্রয়োজনেও মস্তানরা কাজে লাগে।

www.nagorikpathagar.org

কেন এই জবানবন্দী?

পড়তি বয়সের অনেকেই বলেছেন, মস্তান বেটারাই সমাজের বারোটা বাজাচ্ছে। ওদের দৌরাত্ম্যে সমাজ প্রকম্পিত, নিরাপত্তা বিঘ্নিত, শান্তি তিরোহিত এবং মূল্যবোধের এত অবক্ষয়। মস্তানদের দমন করতে হবে, উৎখ্যাত করতে হবে, নতুবা এ সমাজে বাস করা যাবে না। প্রতি জনপদে গড়ে তুলতে হবে মস্তানবিরোধী আন্দোলন।

উঠতি বয়সের যারা মস্তান হয়েছে এবং যাদের মন এখনও মরে যায়নি, তারা বলছে, না, আমরা বারোটা বাজাইনি; এজন্য দায়ী আপনারা। আমরা শুধু আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। আপনারা আমাদের মহাজন, পথিকৃৎ। আপনাদের মহাজনী পুঁজি হিসাবে আমাদের খাটিয়েছেন। যেভাবে পুঁজি খাটিয়েছেন, সেভাবে লাভ-লোকসান গুনছেন। এজন্য কি আমরা দায়ী?

এই বিতর্কের শেষ নেই; কিন্তু ইনসাফের আদালতে এ বিতর্কের শেষ আছে। ইনসাফের দাঁড়িপাল্লায় দুপক্ষের বক্তব্য তুললে বুঝা যাবে, কার বক্তব্য কতটুকু খাঁটি আর মেকি। কিন্তু মস্তানদের বক্তব্য কোথায়? ওরা তো শুধু এক তরফা গালিগালাজ শুনে। তাদের বক্তব্য পেশের কোন প্লাটফরমও নেই, কিন্তু তাদের বক্তব্যও তো থাকতে পারে এবং আছেও। অথচ কেউ কোনদিন তাদের বক্তব্য সংগ্রহ করে সে বক্তব্য জাতির কাছে পেশ করেননি। এই জবানবন্দী সে উদ্দেশেই সংগৃহীত ও নিবেদিত, যাতে একতরফা মামলা ডিসমিস হয়ে না যায়।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় ভাগ

জবানবন্দী

"আমরা আপনাদেরই সন্তান। আপনাদের হাতে গড়া সমাজেই আমাদের জন্ম। আপনারা যেভাবে সমাজটাকে গড়েছেন, যে পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছেন, আমরা সেই পরিবেশেরই ফসল।"

তৃতীয় ভাগ ঃ পরিশিষ্ট

সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ ১৯৯২

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

অশ্লীল পত্রিকা আমাকে মস্তান বানিয়েছে

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ থেকে ২১শে জানুয়ারী ১৯৮৬। বাংলাদেশের লেবানন বলে কথিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে প্রচন্ড লড়াই। ছাত্র বনাম ছাত্র, ছাত্র বনাম পুলিশ, লড়াই আর লড়াই। গোলাম ফারুক অভিসহ ৮ জন ছাত্র (তন্মধ্যে দুজন বহিরাগত) গ্রেফতার হয়। বিভিন্ন হল থেকেও বিপুল অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ১৯ জন পুলিশ এ লড়াইয়ে আহত হয়।

জবানবন্দী নেয়ার জন্য এই ৮ জনের মধ্যে কোন এক বিশেষ জনের সংগে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৮৫) সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকার কোয়ার্টারে। অধ্যাপিকা হলেন ছাত্রটির সহোদরা। মস্তান ছাত্রটির মতে সেখানে আমাদের দুজনের আলাপ-আলোচনা বিভিন্ন দিক থেকে হবে সুবিধাজনক। আমি আপত্তি জানাইনি। কারণ, দীর্ঘ তিন মাস শুধু তার সংগে লাইন করতে আমাকে যে কত ঘাটের পানি খেতে হয়েছে, সময় ও অর্থ যে কত ব্যয় হয়েছে, তা সবিস্তারে বলতে গেলে কমপক্ষে চার ফর্মার ডিমাই সাইজের একখানা বই রচনা করা যেতে পারে। সুতরাং, সে কাহিনী আর মোটেই বলছি না। আমারও ভুল হয়েছিল এই, আমি এক বামন্ হয়ে আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম। এক পর্যায়ে আমি হতাশ হয়ে যখন তার সঙ্গে মোলাকাতের আশাই ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত প্রায় নিতে যাচ্ছি, তখন আমার একথা শুনে এক তরুণ সাংবাদিক বললেন, এ চাঁদ ধরার জন্য এ্যাপলোতে বাহন হন, তাহলে চাঁদের রাজ্যে পৌছতে পারবেন। আপনি হতাশ হবেন না। আমিই সেই এ্যাপলো। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ তরুণ সাংবাদিক সত্যিই এ্যাপলোর ভূমিকা পালন করে আমাকে চাঁদে পৌছিয়েছেন এবং তা করেছেন আমার তিন মাসের অভিযানের শেষ পর্যায়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি দিন-তারিখ ও সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম হন, কিন্তু কপাল আমার মন্দ! তাঁর নির্ধারিত দিনটিতে অতি কষ্টে পাওয়া চাঁদের মানুষের সংগে আমার দেখা হয়নি। কারণ, দিনটিতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছিল অত্যন্ত গরম। ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৮৫) ভোর রাতে পুলিশ মহসিন হলে এক অভিযান চালিয়ে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করে এবং ছয় জন ছাত্রসহ আট জন যুবককে গ্রেফতার করে। আমার 'ইনিও' অষ্ট ধাতুর এক ধাতু, গ্রেফতারের মাদুলীতে সেঁটে গেলেন।

সবই গেল। আশার তরী আমার তীরেই ডুবলো। তিনটি মাস কি পরিশ্রমইনা করেছি, অথচ শ্রমের ফসল যখন ঘরে তোলার জন্য হাত বাড়ালাম, তখনই

www.nagorikpathagar.org

আকস্মিক ঝড়োহাওয়া সব তছনছ করে দিল। আমি যে মস্তানের সাক্ষাৎপ্রার্থী ছিলাম, তিনি আমার তিন মাসের কষ্টের কথা তরুণ সাংবাদিক এবং অন্যান্য মাধ্যমে জানতে পারেন। এ কষ্টের কথা চিন্তা করে আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেই ৩০শে ডিসেম্বরের তারিখটা তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু সব লন্ডভন্ড হয়ে গেল।

১৯৮৬ সালের মধ্যভাগের (মাসটা জুন কি জুলাই হবে) কোন একদিন আমার এ্যাপলো তরুণ সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো জাতীয় প্রেসক্লাবে। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন, এবার এ্যাপলোতে চড়ে নিশ্চয়ই চাঁদে পৌছতে পারবেন। আমি আনন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তিনি বললেন, সংগঠনের এক বিশেষ কাজে আপনার চাঁদের মানুষটি আমার বাসায় আসবেন আগামী শুক্রবার সন্ধ্যার পর। আমার বাসায় কেউ নেই। সবাই দেশের বাড়ী চলে গেছেন। আমি বাসা পাহারা দিচ্ছি। তিনি আসবেন, কিন্তু সাথে থাকবে আর একজন। কোন অসুবিধা হবে না। আলোচনার ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনারা দুজন নির্জনে আলোচনা করতে পারবেন। যতক্ষণ আপনারা আলোচনা করবেন, ততক্ষণ আমরা দুজন অন্য রুমে থাকব। আলোচনা শেষ হলে চার জনে একসঙ্গে খানাপিনা করব। যাক, হঠাৎ আপনাকে পেয়ে গেলাম। নতুবা আপনার অফিসেই যেত হত আমাকে।

ফেরার পথে রিক্সায় বসে একা একা চিন্তা করতে লাগলাম, শুক্রবার আসতে তো আরও চার দিন বাকী। এ চার দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও কত ঘটনা ঘটতে পারে। এ তারিখও শেষ পর্যন্ত কি কাজে লাগবেনা? দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা।

নির্দিষ্ট দিনে সময়ের একটু আগেই সাংবাদিক বন্ধুর বাসায় পৌছলাম। তাঁর বাসার কাছের মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করে বাসায় গেলাম। কলিংবেল চাপ দিতেই সাংবাদিক বন্ধুটি দ্বার খুলে দিলেন। সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় করে ড্রয়িং রুমে বসলাম। দুজনে অনেক গল্প করলাম, চা-নাস্তা খেলাম, কিন্তু যার জন্য আমার এ আগমন ও অপেক্ষা, তার কোন খবর নেই। এশার আযান হল। দুজনেই উৎকণ্ঠিত। সাংবাদিক বন্ধু বললেন, না আসার তো কোন কারণ নেই। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়াও তার একটা জরুরী কাজ আছে এখানে। নিজের গরজেই আসতে বাধ্য। এত দেরী হওয়ার কোন কারণ তো থাকতে পারে না। কিছুক্ষণ আরও অপেক্ষা করুন, দেখা যাক পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়। আমি বললাম, হোক দেরী, আসলেই হল, আমি এশার নামাজ সেরে

www.nagorikpathagar.org

আসি। তিনি বললেন, তাই করুন।

মসজিদে গিয়ে নামাজ সেরে সাংবাদিক বন্ধুর বাসায় ফিরতেই দেখি এক যুবকের সংগে তিনি আলাপ করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, আপনাকে এবং আমাকে হলে যেতে হবে। অনিবার্য কারণে তিনি এখানে আসতে পারবেন না। চলুন হলে যাই।

সত্য কথা বলতে কি, আমার মনে কিছুটা ভয় সৃষ্টি হল। এমনিতেই 'হল' জায়গাটা অছাত্র নিরীহ মানুষের জন্য ভয়ংকর। তাছাড়া যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি, তিনি তো মার্কামারা ইন্টারন্যাশনাল। কি জানি, কি যে ঘটে! দরকার নেই তার জবানবন্দী নেয়ার। এর চেয়ে আমি বাসায় ফিরে যাই। এ লাইনেও ভাবতে লাগলাম।

সাংবাদিক বন্ধু বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না, আপনাকে গাড়ী দিয়ে আমি বাসায় পৌছে দেব। তাঁর একথা শুনে আমি আল্লাহ ভরসা করে সিদ্ধান্তই নিলাম, কপালে যা আছে, যাবই। বিসমিল্লাহ বলে পা বাড়ালাম।

সাংবাদিক বন্ধু তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হলেন। বাসায় তালা দিয়ে বাড়ীওয়ালাকে কি যেন বলার জন্য গেলেন এবং ফিরলেনও তাড়াতাড়ি

– বাড়ীওয়ালাকে কি বললেন? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

– বললাম, আমি বাসায় আজ রাতে নাও আসতে পারি। তিনি যেন বাসার দিকে একটু খেয়াল রাখেন।

– এত দেরী হবে? আবার আমার প্রশ্ন।

– দেরী হওয়ার তো কোন কারণ নেই, যদি দেরী হয়েই যায়, তাহলে এত রাতে বাসায় না ফেরাই ভাল। তাই বলে আস্‌লাম।

– ভালই করেছেন। জবাব দিলাম আমি।

বাসা থেকে বের হয়ে তিন জন বড় রাস্তায় উঠার আগেই সাংবাদিক বন্ধু বললেন, তিনি গাড়ী পাঠিয়েছেন। অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, এই তো প্রাইভেটকার দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ী দেখেই মনে ভয় আরও বাড়ল। এ যে কোন্ মুসিবতে পড়লাম, ভাবতে লাগলাম। কিন্তু পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, পিছনে হটার বা কেটে পড়ার কোন সুযোগ ছিল না। পাঠকগণ যাই ভাবুন, আমি মনে মনে দোয়া-দুরুদ পড়তে পড়তে আল্লাহর নাম নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী চলল দ্রুতবেগে। গাড়ীর গন্তব্য কোথায় তা জানতেন তৃতীয় ব্যক্তিটি। তিনি নিজেই গাড়ীর চালক। কিছুদূর চলার পর আর দিক নির্ণয় করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর গাড়ী ধানমন্ডি এলাকার এক বাসার সামনে থামল। আমরা তিন

www.nagorikpathagar.org

জন গাড়ী থেকে নামলাম। নামার সাথে সাথেই বহু সাধনা ও কষ্টে পাওয়া সেই যুবক দৌড়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে দোতলার এক কক্ষে নিয়ে গেলেন। আমার খটকা লাগল, ছাত্রাবাসে যাওয়ার নাম করে এ অভিজাত আবাসিক এলাকায় কেন? আমার এ 'কেন' মনের মধ্যেই রয়ে গেল, প্রকাশ করলাম না। মস্তান যুবকটি সে রহস্যের উদঘাটন করলেন। তিনি আমার মনের এ জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার প্রয়োজন যেন বোধ করলেন প্রথমেই। তিনি বললেন, প্রথমে হলে আসার কথাই বলেছিলাম, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া গরম দেখে বাসার কথা বলেছি। সে (চালক) কোন্ জায়গার কথা বলেছে–ছাত্রাবাসের না বাসার? আমি বললাম, ছাত্রাবাসের কথাই তো শুনেছিলাম। তিনি বল্লেন, তাকে বাসার কথা বলেছি শেষে, অথচ আপনাদের কাছে ছাত্রাবাসের কথা বলেছে, কিন্তু এসেছে ঠিকই বাসায়। সারপ্রাইজ দেয়া জানে। যাহোক, থাক এ প্রসঙ্গ। আপনাকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

–কারণ?

– কারণ অন্য কিছু নয়। আপনাকে আমি এই প্রথম দেখলাম। তবে পত্রপত্রিকায় আপনার কোন কোন লেখা পড়েছি বটে। বিস্মিত হয়েছি যে, এসব ইন্টারভিউ নিয়ে থাকেন কম বয়সী সাংবাদিক, ঠিক বলা যায় আমার বয়সী। তারা দৌড়াদৌড়ি করতে পারেন এবং তাতে তারা রোমান্স আর রোমাঞ্চ দুটোই অনুভব করেন। আপনার বয়স তো আমার দ্বিগুণের চেয়েও বেশী। এ বয়সে আপনার এ শখ জাগল কেন?

– শখ ঠিক নয়, প্রয়োজন বলা যায়। আমি মনে করেছি, আপনাদের নিয়ে একখানা বই লিখবো।

– বেশ, লিখুন। আমাদের সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রায়ই নানা কথা প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রপত্রিকা থেকেই তো আপনার জানার কাজটা সেরে নিতে পারেন। সাক্ষাৎকারের কি প্রয়োজন আছে?

– জি হাঁ, আছে। এজন্যই আছে, আমার জানার প্রয়োজন আপনাদের বর্তমান নয়, আপনাদের অতীত। অতীত ঠিক বলা যায় না, বলতে পারেন, বর্তমান জীবন–পথে মোড় নিতে কোন অভ্যাস, সঙ্গ, অবস্থা বা মানসিকতাকে আপনারা দায়ী মনে করেন। এ দিকটা শুধু আমার জানার বিষয়। যদি আপনি সহযোগিতা করেন, তাহলে খুব খুশী হব।

– অবশ্যই সহযোগিতা করব। আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দেব।

– তাহলে শুরু করি?

www.nagorikpathagar.org

– জি, শুরু করতে পারেন। তবে হাতের এই মিনি রেকর্ডার অন করবেন না। আপনি মেমোরিতে রেকর্ড করুন, বড় জোর কাগজে নোট করতে পারেন।

– ঠিক আছে তাই হবে।

– তা হতেই হবে। এমনিতেই তো আমি রেকর্ডেড। নতুনভাবে আর আমার রেকর্ডেড হওয়ার দরকার নেই। আপনি আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন তা শুনেছি। পত্রিকায় ছাপার কথা বললে আমি সাক্ষাতের অনুমতি দিতামনা।

– যাহোক, আপনার মেহেরবানী। আমার প্রথম প্রশ্নটি একটু দীর্ঘ, মনে কিছু নেবেন না। আপনি যে পরিবারের সন্তান, এমন পরিবার বাংলাদেশে শতাধিক হবে না; বরং শতেরও কম। আপনার বাবা, চাচা, ভাই, বোন, ভগ্নিপতি অর্থাৎ, প্রত্যেকে উচ্চ-শিক্ষিত, মানে-গুণেও প্রতিষ্ঠিত। আপনার সূচনাও অতি চমৎকার এবং সুন্দর ছিল। এসএসসি পরীক্ষায় যে ফলাফল দেখিয়েছিলেন, তা গোটা জাতির সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনারা ক'জনা সংবর্ধিত হয়েছিলেন, কিন্তু বলতে দুঃখ লাগে, এইচএসসি পরীক্ষায় আপনার ফলাফল ছিল দুঃখজনক। কোনভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। এ পতন কেন?

– পরিবারের কথা ঠিকই বলেছেন I am a blacksheep of my family (আমি হলাম আমার পরিবারের এক কুলাঙ্গার)। আমার পতনের জন্য দায়ী আমার এসএসসি রেজাল্ট। 'চোখের নজর লাগা' বলতে আমাদের সমাজে যে কথা চালু আছে, তাতে আপনার বিশ্বাস আছে কিনা তা আমি জানি না, কিন্তু তাতে আমার বিশ্বাস আছে। আমার ভাল রেজাল্টের উপর রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেই 'নজর লাগে' বিশিষ্ট একজনের। যারা নজরের শিকার হয়, তারা নজরের আছর দূর করার জন্য ঝাড়ফুঁক দোয়া-তাবিজ নেয়। আমি নেইনি, এটাই আমার ভুল হয়েছে। পতন আমার এখান থেকেই শুরু। সরকারের নজরে পড়ে আমার মত অনেকেই শেষ হয়েছেন। আমি তো অবশ্যই হয়েছি।

– পতন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলবেন?

– আমার পতন-প্রক্রিয়া যিনি বা যারা শুরু করেন, এটা তাদেরই জানা। আমি ঠিকভাবে বলতে পারব না, তবে ধীরে ধীরে জীবন-চলার রাস্তা যে পাল্টাচ্ছি, তা বেশ অনুভব করতাম।

– তখন লেখাপড়া কেমন লাগত?

– খুব ভাল লাগত, তবে পাঠ্যপুস্তক নয়, পাঠ্য পুস্তকের বাইরে যেসব

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্য ও পত্রপত্রিকা ছাত্রদের বরবাদ করে থাকে বলে আপনারা বলেন, তাই আমার পড়তে ভাল লাগত।

– কেউ বাধা দিত না?

– তখন আমি সকল বাধার উর্ধ্বে ছিলাম।

– এখনও কি এসব সাহিত্য ও পত্রপত্রিকা পড়েন?

– না, পড়ি না।

– না পড়ার কারণ?

– না পড়ার মূল কারণ সময়ের অভাব। ছাত্র রাজনীতি নিয়ে থাকি চব্বিশ ঘন্টা ব্যস্ত। এসব পড়ার মত অবসর কোথায়? তাছাড়া সে মনও নেই। মনের প্রমোশন হয়েছে।

– আপনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ভাল ভাল বই ও ভাল ভাল পত্রপত্রিকা পড়তে পারতেন।

– বললাম তো, 'রাষ্ট্রীয় নজর' পড়েছিল আমার উপর। ভাল ভাল বই আর ভাল ভাল পত্রপত্রিকার কথা বলছেন?

আপনিই বলুন, ক'খানা গল্পের বই, উপন্যাস, নাটক আর কাব্যগ্রন্থ আমাদের পরিশীলিত জীবন গঠনের জন্য প্রকাশ করেছেন আমাদের লেখক প্রকাশকরা? বিচ্ছিন্নভাবে কালেভদ্রে দু'একটা গল্পের বই, উপন্যাস দু'চারখানা, দু'চারটি নাটক ও কয়েকটি কবিতা ছাড়া আর কি আপনারা উপহার দিয়েছেন শুনি?

একটা ভাল গল্পের বই বা উপন্যাস পাঠের পর মনটা যতটুকু সজীব ও পবিত্র হয়, সে সজীবতা এবং পবিত্রতা ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা নেই আমাদের সমাজে। চিন্তা-ভাবনার সেই পবিত্র স্রোত বিপরীতমুখী নোংরা স্রোতের তোড়ে হারিয়ে যায়। ভাল গল্প বা উপন্যাস পাঠের পর পরিচ্ছন্ন চিন্তার যে উন্মেষ ঘটে, তখন মন চায় এমন উন্নত মানের আরও দশ বিশটা বই পড়ি, কিন্তু তা আর পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা পাঠের পরই আগের পাঠক মনের মৃত্যু ঘটে। তখন মনে হয় অন্য জীবের চরিত্র যেন ভর করছে। একটি ভাল গল্প বা উপন্যাস পাঠকের মনকে যে পরিমাণ উজ্জীবিত করে, নিকৃষ্ট মানের গল্প বা উপন্যাস পাঠের পর ঐ পাঠকের মনকে সে পরিমাণই নীচে নামায়, হয়ত তার চেয়েও বেশী। বাজারে সাহিত্যের নামে যেসব বই-পুস্তক আছে, তার শতকরা ৯৫ ভাগ হচ্ছে মস্তানদের সুস্বাদু-খোরাক। পত্র পত্রিকার অবস্থাও অনুরূপ। যারা এসব দেখেও দেখেন্ না, শিকড়ের সন্ধান করেন না, বীজের খবর

www.nagorikpathagar.org

নেন না, শুধু ফল দেখে আস্ফালন করেন, তারা আহমক ছাড়া আর কিছু নয়।

– আপনি কি মনে করেন, যারা এসব পাঠ করে বরবাদ হয়েছেন বা হচ্ছেন, তারা ভাল–মন্দ কিছুই বুঝেন না?

– কেউ কেউ হয়ত বুঝেন, কিন্তু অনেকেই বুঝেন না। কোন্ ঝিনুকে মুক্তা আছে তা জানেনা যারা ঝিনুক কুড়ায়।

তাই হাজারটা ঝিনুক কুড়াতে হয়। হাজারটার শক্ত খোলস ভেঙ্গে দেখতে হয়। হাজারে হয়ত একটিতে পাওয়া যায় মুক্তা । সে মুক্তার অবশ্য মূল্য আছে। কারণ, হাজার বারের ব্যর্থতার পর একটা সাফল্যের যে মূল্য পাওয়া যায়, তাতে সব শ্রম সার্থক হয়, কিন্তু মন নিয়ে যে কারবার, সে মনে হাজারটা প্রতিকূল বাধা অনুকূলের এক ধাক্কায় দূর হয় না। আমরা সেই প্রকৃতির পত্রপত্রিকা ও সাহিত্য পাঠ করছি, আর সেসবের মেজাজ ও শিক্ষানুযায়ী নিজেদের চরিত্র গঠন করছি। অর্থাৎ, এই হাঁপরে ফেলে নিজেদের চরিত্র গড়ে তুলছি। এই অস্থিরতার মাঝে নিজেদের মনটাকে বেঁধে ফেলেছি। প্রচলিত সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার ভাব–ভাবনা, চাল–চরিত্র, মেজাজ আর মর্জির কাছে আমাদের মনটা আর চরিত্র আত্মসমর্পন করে যেন ধন্য হচ্ছে। এসব সাহিত্যই আমাদের জীবন গঠনের মাল–মসলা সদাসর্বদা যোগান দিয়ে যাচ্ছে। আমরা তা আহরণ করে সেভাবে গড়ে উঠছি।

আপনারা কি ধরনের সাহিত্য আর পত্রপত্রিকা আমাদের উপহার দিচ্ছেন? প্রেম আর প্রেম। লেখকরা যেন কসম করে বসেছেন যে, একজন যুবক আর একজন যবুতীকে যেকোন স্থান থেকে ধরে এনে প্রেম করাবেন, তাদের মুখ দিয়ে লেখকের মন চরিত্র ও চিন্তাভিত্তিক সংলাপ বের করাবেন, পাঠকদের তা শুনাতেই হবে, নতুবা গল্প লেখাই যেন বরবাদ। তাদের সাহিত্যে আনা চরিত্রগুলো টীকা টিপ্পনী কেটে কথা বলবে, নির্জনে বসবে, মালা বদল করবে, আরও কত নষ্টিফষ্টি করবে। গল্পের মধ্যম অবস্থায় অথবা শুরুতে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাবেন, একজনকে নিয়ে দুজন টানাটানি করবেন, তারপর হয়ত একজনের সংগে জুড়ে দেবেন। শেষ অবস্থায় আদালতী বিয়ে হবে অথবা অন্যকোন ক্লায়েন্ট দেখে ইনি বা তিনি কেটে পড়বেন। মোটামুটি ভাবে এ ধরনের দেহসর্বস্ব প্রেমের গল্পই তো আমরা হরহামেশা পড়ছি। গল্পে প্রেম তথা যৌনতা এত বেশী আমদানী করা হচ্ছে যে, প্রেম আর যৌনতা একাকার হয়ে গেছে। এজন্য গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে প্রেম ও যৌনতার প্রতিযোগিতা। গল্পে বা উপন্যাসে নায়ক–নায়িকাকে কোন্ লেখক কত নেংটা

www.nagorikpathagar.org

করতে পারেন, তারই প্রতিযোগিতা চলছে। নায়ক-নায়িকা দিয়ে অকাম কুকাম না করালে গল্পইযে জমে ওঠে না, বিবস্ত্র না করলে সংস্কৃতির ষোলকলা পূর্ণ হয় না। এধরনের গল্প প্রায়ই ছাপা হচ্ছে। এসব গল্প পড়ে মনে হয়, গল্প লেখকই নিজে তার গল্পের ছদ্মবেশী নায়ক হয়ে নেংটা হচ্ছেন আর ঐ কল্পিত বেচারীকে নেংটা করে কলম দিয়ে নিজের যৌনজ্বালা মেটাচ্ছেন। অথবা বলা যায়, লেখক যে প্লট গল্পে তুলে ধরছেন, ওটা তার বাস্তব জীবন, অন্যের নামে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে কিছুটা পুলক বোধ করছেন মাত্র। আধুনিক গল্প উপন্যাসে নায়ক-নায়িকাকে ঘরছাড়া করার প্রয়োজনও পড়ছে না। নায়িকার মা-বাবাই মেয়ের প্রেম-প্রীতির সুবিধা নিজের বাসায়ই করে দিচ্ছেন। যৌন জ্বালা আর প্রেমের নামে দেহ টানাটানির গল্প ছাড়াও কিছু কিছু গল্প ছাপা হচ্ছে, কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা অল্প আর বক্তব্যও অস্পষ্ট এবং দুর্বল। নায়ক যদি নায়িকাকে ঘরছাড়া করতে না পারল, তাহলে সে কী এমন প্রেম করল? আমাদের মত মস্তানদের মানুষ করার লক্ষ্য সামনে নিয়ে বা সমাজ সংস্কারের মন মানস নিয়ে ক'জন লেখালেখি করেন শুনি?

– তা অবশ্য স্বীকার করি। বললাম আমি।

– তাই আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত, যা পাচ্ছি তাই পড়ছি আর সেভাবে চলছি। আমরা ক্ষুধার্ত, ভীষণ ক্ষুধা, উঠতি বয়স। আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির দায়িত্ব আপনাদের উপর বর্তায়। আপনারা পরিবেশন যা করছেন, তাই আমরা গলাধঃকরণ করছি। আপনাদের পরিবেশিত খাদ্য যদি সতেজ, স্বাস্থ্যসম্মত, উপদেয় হয়, তাহলে আমাদের পেটে গন্ডগোল সৃষ্টি হবে না। আপনাদের এ খাদ্য খেয়ে যখন পেটে গন্ডগোল হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে, এ খাদ্য ভেজাল। এ ভেজাল খাদ্য খেয়ে পেটে গন্ডগোল, মেজাজে গন্ডগোল আর মনে গন্ডগোল লেগেই আছে, চরিত্রেও সে গন্ডগোলই দেখছেন। বলুন দোষটা কার?

– দোষ তো ভাই সবই মুরব্বীদের। যুক্তিতর্কে না গিয়ে স্বীকার করে নিলাম আমি।

– উপন্যাসের কথা বলবেন? যা সত্য গল্পের ক্ষেত্রে, তা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সত্য। ব্যতিক্রম আছে তা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু ব্যতিক্রমের প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটুকু? গল্পের পরিসর সীমিত, কিন্তু উপন্যাসের পরিসর অনেক বিস্তৃত। উপন্যাসে মন খুলে কথা বলা যায়, তাই এ অঙ্গনেও প্রেমের জমজমাট সাজানো হাট, যেমন চাওয়া যায়, তেমন পাওয়া যায়। আমরা সে হাটে যাই। যেমন পারি তেমন কেনাকাটা করি। অর্থাৎ, যৌন আবেদনধর্মী

www.nagorikpathagar.org

কাহিনীভিত্তিক উপন্যাস আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করছে। আমাদের জীবন সে ধারায় গড়ে উঠছে। এ জন্য আমরা কি দায়ী?

কবিতার কথা আর নাইবা বললাম। দুর্বোধ্য ভাব-বিষয়ভিত্তিক কবিতা একশ্রেণীর দুর্বোধ্য কবি লেখেন আর তাদের দুর্বোধ্য পাঠকরাই সেসব পাঠ করেন। সে পাঠে আমরা নেই, তবে কোন কোন বড় কবির কবিতা কখনও কখনও পড়ি আর ছন্দে আঁকা ছবি দেখি, কিভাবে বন্ধুর স্ত্রী গোসলখানায় গোসল করছেন আর কবি বন্ধু-পত্নীর অঙ্গসৌষ্ঠব নিয়ে কল্পনায় ছবি আঁকছেন। ইমরুল কায়েসকে তারা হার মানাতে পারছেন। বলুন, এসব কবিতা কি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে না?

- অবশ্যই করে। সম্মতি জানালাম।

- হায়রে সমাজ! পত্রপত্রিকার কথাই বলি। এদেশে আইনের কেতাবে উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী কোন অশ্লীল বা নগ্ন পত্রিকা নেই। কেউ কখনও পত্রপত্রিকার ডিক্লারেশন নেয়ার সময় অশ্লীল পত্রিকা প্রকাশের কথা আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন না। অধিকন্তু, প্রত্যেকেই বলে থাকেন যে, প্রকাশনা নীতিমালা মেনে চলবেন। প্রকাশনা নীতিমালায় কি কি প্রকাশ করা যাবে না, সে সম্পর্কে একটা সীমানা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, নগ্ন ছবি ও বিষয় তন্মধ্যে একটি। শুধু নিষেধাজ্ঞাই আরোপ নয়, নির্দেশিত সীমানা লংঘন করলে কি কি শাস্তি ভোগ করতে হবে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এসব আইন মান্য করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েই প্রত্যেকে পত্রিকার ডিক্লারেশন নিয়ে থাকেন। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, দেশে যত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, এর কোন একটিও সেই নীতিমালা লংঘন করছে না। আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলা যায়, যদি এসব পত্র-পত্রিকা কোন একটি নীতিমালা লংঘন করত, তাহলে আইন মোতাবেক শাস্তি ভোগ করত। কিন্তু আমাদের জানামতে এ পর্যন্ত দেশে কোন একটিও নগ্ন ছবি বা অশ্লীল বিষয় ছাপার কারণে কোন প্রকাশক বা সম্পাদক শাস্তি ভোগ করেন নি। এ যখন অবস্থা, তখন পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, দেশের কোন পত্র পত্রিকায় নগ্নছবি ও বিষয় প্রকাশ করা হয় না। প্রশ্ন হতে পারে, বস্ত্রহীন অবস্থায় যেসব নারীদেহ এবং জঘণ্য অশ্লীল বিষয় প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলো কি অশ্লীল নয় এবং সরকারের প্রকাশনা নীতিমালার বিধিনিষেধের আওতা বহির্ভূত? এসব প্রশ্নের উত্তরে দুটি কথা বলা যায়। প্রথম কথাটি হচ্ছে এই, সরকারের কাছে নগ্নতা আর অশ্লীলতার যে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা রয়েছে, প্রকাশিত নগ্নতা আর অশ্লীলতা এর আওতার বাইরে। দ্বিতীয় কথা এ

www.nagorikpathagar.org

হতে পারে যে, এসবকে সরকার নগ্নতা আর অশ্লীলতা জানলেও কেতাবের আইন বাস্তবে প্রয়োগ করার ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে চান না। সম্পাদক ও প্রকাশকরা সংশ্লিষ্ট কোন কোন কর্তার সংগে প্রাইভেট বন্দোবস্ত করে নগ্নতা আর অশ্লীলতা নিয়ে ব্যবসা করছেন। তাতে উভয়পক্ষই লাভবান হচ্ছেন। আহত হচ্ছেন শুধু নীতিবাদীরা। তাই এ প্রসঙ্গে মোটামুটিভাবে যে কথা কেতাব অনুযায়ী বলা যায়, তা হচ্ছে, দেশে সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নগ্নতা বা অশ্লীলতা নেই অথবা থাকলেও কেতাবী আইনের সংগে সাংঘর্ষিক নয়। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, যেসব পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা সরকার বন্ধ ঘোষণা করেন, তন্মধ্যে কি একটিও নগ্নতা আর অশ্লীলতা প্রকাশের কারণে বন্ধ হয়েছে? সাফ জবাব, একটিও না। সবই রাজনৈতিক কারণে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা সরকারের বিরোধিতার কারণে বাজেয়াফত করে থাকেন।

নগ্নতা আর অশ্লীলতা প্রকাশে নিবেদিত পত্রপত্রিকাগুলোও আমাদের মস্তান বলে গালি দেয়। আমাদের নানাভাবে দোষারোপ করে থাকে। কিন্তু তারা তাদের পরিবেশিত ছবি ও শব্দমালা দ্বারা আমাদের যেভাবে চাঙ্গা করে, সে সম্পর্কে না আছে সামাজিক প্রতিরোধ আর না আছে সরকারী পদক্ষেপ। তারা কি পরিবেশন করে থাকেন, কিছু নমুনা পেশ করছি।

এই বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর এক গাদা ম্যাগাজিন আমার সামনে পেশ করে একে একে পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলতে লাগলেন।

– এই তো দেখুন, 'এক প্রেমিকার বাইশ প্রেমিক' শিরোনামে বাংলাদেশের এক বুদ্ধিজীবী ২২ জন প্রেমিক আর ঐ প্রেমিকার ছবিসহ প্রেম-কাহিনী লিখেছেন এই ম্যাগাজিনে। কাহিনী পড়লে মনে হয়, তিনিও সম্ভবত ২৩ নম্বরে ছিলেন। নিছক চক্ষু লজ্জার কারণে নিজের ছবি ও কাহিনী পেশ করেননি। 'এক মডেল কন্যার ঘর ভাংলো কিভাবে', সে কাহিনী আর তার প্রায় নগ্নদেহ পেশ করেছে একটি ম্যাগাজিন। সেই মডেল যুবতীর নাম ভ্যাল পোস্টেন্সে। কাহিনীর একটি অংশ হচ্ছে এই, মডেল কন্যা ভ্যাল একজন সার্থক মডেল কন্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল। মডেলিং-এর খাতিরে সে দৈহিক মিলনের দৃশ্যে অভিনয় পর্যন্ত করেছে, কিন্তু তার স্বামীর তা পছন্দ হয়নি, তাই তাকে তালাক দেয়। সে এতেই খুশী। কারণ, তার দেহের জন্য কোন ব্যক্তি নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তার কাছে ছুটে আসে। ভ্যাল-এর স্বামী রজার অভিযোগ করেছে, তার স্ত্রী ভ্যাল-এর চরিত্র খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে মডেলিং-এর নামে যৌনাচার করে বেড়াত। তাকে না জানিয়েই পুরুষ বন্ধুদের সাথে বিছানায় রাত কাটাত। আমি এ সম্পর্কে

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন করলে সে আমাকে বোকা বানাত। কিন্তু আমি অতটা বোকা নই, যতটা ভ্যাল মনে করত। সে সবকিছুকেই মডেলিং হিসাবে ব্যাখ্যা করে আমাকে বোঝাতে চাইত, কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম সে দিব্যি তার বন্ধুদের সাথে যৌনাচার করে বেড়াচ্ছে। আমাদের বিবাহিত জীবন আট এছর টিকে থাকলেও এই সব কারণে আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

ভ্যাল-এর স্বামী ২৯ বছরের রজার পোস্টেন্স আরও জানান, একদিন সে একটি পার্টি শেষ করে ঘরে গিয়ে দেখে তার স্ত্রী মিঃ জন নামের এক যুবকের সাথে তারই বিছানায় শুয়ে আছে। জন হলো ভ্যাল-এর সেক্স শো'র সাথী। টিভি সিরিজে যার সাথে সে বেডরুম দৃশ্যের অভিনয় করেছে।

রজার-এর ধারণা, সেক্স ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে ভ্যাল তার নায়ক জনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। ছবিতে প্রকৃতপক্ষে সে যা করে, বাস্তব ক্ষেত্রে সে তা অনুশীলন করে তার সাথে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। আমি খুবই সহনশীল ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি এসব ঘটনা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠি এবং আমাদের বিবাহিত জীবনের ইতি টানি।

অপর একটি নিবন্ধের শিরোনাম 'বিয়ে কি শুধু মেয়েদের প্রয়োজন? থাক না কিছু মেয়ে কুমারী।' চিত্রবাংলা, ৮.৬.৮৪ইং।

বোম্বের টিনা মুনিম কিভাবে প্রেম করেছে, 'রক্ষিতা থেকে যারা মহারানী হয়েছে, তাদের বিচিত্র প্রেমকলা' শিরোনামে নগ্ন আলোচনায় ভরে তুলেছে একটি ম্যাগাজিন। বৃটেনের নারী ও পুরুষরা কিভাবে একে অন্যের নগ্নতা উপভোগ করে, তার আলোচনা এসব ম্যাগাজিনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সে আলোচনার একটা নমুনা তুলে ধরছিঃ

নগ্ন নারী দেহ দেখতে পুরুষদের ভাল লাগে। তাই ক্লাবগুলোতে পুরুষেরা ভিড় করে নারী স্ট্রীপারদের দেখার জন্য। অপর দিকে আজকাল এক শ্রেণীর মেয়েও পুরুষের নগ্ন দেহ দেখে আনন্দ পাচ্ছে। সে সুযোগে পুরুষরাও 'স্ট্রীপিং পেশায় নিয়োজিত হয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। বৃটেনে আজকাল মেয়েরা ভাড়া করে আনছে পুরুষদের। 'বিদ্রোহিনী উজ্জয়িনীর পতিতারা' শিরোনামে বেলেল্লাপনা আলোচনা আর 'পোস্টারে নগ্ন নারীচিত্র' শীর্ষক সচিত্র আলোচনা পাঠ করা আর সেসব ছবি দেখা রুচিবান কোন স্বামী-স্ত্রীর পক্ষেও সম্ভব নয়, অথচ তা সরকারী ডিক্লারেশনের বদৌলত আমাদের পরিবেশন করা হয়।

এক সিনেমা সাপ্তাহিক 'হে নারী আপনার সমস্যা' শিরোনামে ধারাবাহিক কাহিনী দীর্ঘদিন প্রকাশ করতে থাকে। এ যেন বেলাজ নারীদের এক মুক্তাঙ্গন।

www.nagorikpathagar.org

যেকোন বেলাজ নারী তার বেলেল্লা জীবন যাপনের পথে যত বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলো কে কিভাবে অতিক্রম করেন বা বাধার শিকার হয়ে পরিত্যক্তা হয়েছেন, সে কাহিনী বলতেন। নিজের স্বামীকে ছেড়ে স্বামীর বন্ধুর সাথে হোটেলে যে নারী রাত্রি যাপন করেছেন, তিনিও সেই মুক্তাঙ্গনে হাজির হয়ে গোপন কাহিনী বয়ান করেন।

একটি দৈনিক তো মাঝে মাঝে এমন সব ছবি ও কাহিনী পেশ করে, যা আমাদের সেলাইনেই উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট সহায়তা করে। মোধালন মনরোকে সিনেমা দুনিয়ার মানুষ ভালভাবে চেনেন। সেই অভিনেত্রী মারা গেছেন ১৯৬২ সালের ৫ই আগস্ট। তাঁকে নিয়ে জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরও অনেক লেখালেখি হয়েছে। এ মনরোকে ভুলতে পারেনি আজো আমাদের সরকার পরিচালিত একটি দৈনিক। মনরো কিভাবে আবিষ্কার করলেন মডেল শিকারী একজন ফটোগ্রাফারকে। তিনি কখন কি পর্যায়ে মনরোর নগ্ন আলোকচিত্র তুলে খ্যাতিমান হলেন আর মনরো কিভাবে সিনেমা জগতে এসে তুফান সৃষ্টি করেন, সে কাহিনী আর তার মৃত্যুর পরও দুনিয়া থেকে তার সৌন্দর্য রহস্য নিয়ে যে বিস্তর আলোচনা হতে পারে, তা দৈনিকটি তুলে ধরেছে কাহিনী ও ছবি দ্বারা। এই সাথে ছেপেছে মনরোর সম্পূর্ণ একটি নগ্ন ছবি আর একটি অর্দ্ধ নগ্ন ছবি। পত্রিকাটির আরেক লেখিয়ে এ মন্তব্য করেছেন, "সে যাহোক, মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরও মনরো গুজবে, গুঞ্জনে, সত্যে, মিথ্যায়, প্রতিভায়, সারল্যে আলোচনার উৎস। হলিউডের চলচ্চিত্র জগতকে তিনি দিয়ে গেছেন কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত। সেসব স্মরণীয় মুহূর্তকে অধিক রহস্যে আবৃত করে রেখে গেছেন তিনি ও তার সময়, জীবন, আর অভিনয়। আজো যে রহস্যের জট খোলার চেষ্টা, মৃত্যুতেও তার রহস্যের হাতছানি।'

'বিয়ের আগেই ওরা যৌন সম্পর্কের পক্ষে' শিরোনামে এ সম্পর্কিত লন্ডনের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন একটি বাংলাদেশী পর্নো ম্যাগাজিন এদেশী পাঠকদের জন্য। এ বিশেষ প্রতিবেদনের মধ্যখানে প্রতিবেদকের মন্তব্য এবং লন্ডনের এক ষোড়শীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশী তরুণ ও যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মন্তব্যমূলক উদ্ধৃতিটি হচ্ছে এই "আজকালকার তরুণ-তরুণীরা বিয়ের আগে যৌন সম্ভোগের পক্ষে। কেউ কেউ সপ্তাহে দু'তিনবার হলে ভাল হয় বলে মন্তব্য করে। একজনকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, সেক্স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কি আছে। আমি তো এইমাত্র আমার বন্ধুর বিছানা থেকেই এলাম। অপেক্ষা করুন, বাথ-রুমের কাজ সেরে আসি।"

'সেক্স সিম্বল জিনাত আমানের জীবনে ন'বছরে ন'জন পুরুষ'–১৯৮৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত কিভাবে ৯জন পুরুষ এলেন আর কিভাবে গেলেন, সেই আদিরসাত্মক কাহিনী একটি ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে। ম্যাগাজিনের বিশেষ প্রতিবেদক দীর্ঘ কাহিনী তুলে ধরে উপসংহারে বলেছেন, "অনেক কিছুই পেয়েছে জিনাত, হারিয়েছেও অনেক। জিনাত আসলে উদারমনা। জীবনে সে বাঁধাধরা ছকে মেপে চলতে নারাজ। বিভিন্ন পুরুষ–সঙ্গ তার আনন্দ, কিন্তু গন্তব্য একজন, একটি সংসার।"

এ জিনাত আমানের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রতিবেদক বলেছেনঃ জিনাত আমান। রূপালী পর্দার সোনা রং তারা। বোম্বের সিনেমা পাড়ার সোনালী মেয়ে। দূর্বা–ডগায় শিশির ফোটার মত তার লাবণ্য। ভেজা জামরুলের মত টসটসে গড়ন। জিনাতের চোখে স্বপ্নের মেঘকাটা রোদের ঝিলিক। কখনও তা নারকেলদিঘী, কখনও বা লবণ জোয়ারে ভরা মাতাল সাগর। এ্যাঞ্জেলার পাথরকাটা মেয়েদের মত অখন্ড যৌবনতন্বী। পাগলকরা দেহের বাঁক ভাঁজ। যেকোন সময় ওর সিল্কের মত আঙ্গুলের আদর কিংবা তীরের মত ধার কটাক্ষ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে পুরুষ মানুষের কলজে। চলচ্চিত্রের দেশে পা রেখেই মানুষ ঘায়েল করেছে জিনাত। অনেককে পাগল করেছে আবার অনেকের জন্য পাগলামো করেছে। মনে লাগলেই 'কাঙ্খিত যে কাউকেই ভালবাসা দিয়েছে উজাড় করে। এদিক থেকে জিনাতের যৌবন মানে ধুন্ধুমার বিলাসিতা। একবার পছন্দ হলেই হল। চোখ মেরে, গা দুলিয়ে, মাজা নাড়িয়ে কিংবা নরম আদর দিয়ে অথবা ভালবাসার স্নিগ্ধগন্ধ ছড়িয়ে তাকে পটানো চাই। ম্যালা নামী দামী সুকুমার পৌরুষকে পটিয়েছে সে। দিয়েছে–নিয়েছে। পর্যায়ক্রমে নয়া নয়া ভোমরার কাছে মুক্ত করেছে সমস্ত রূপের পাপড়ি। তবু জিনাত ফুরিয়ে যায়নি। আজও গোটা উপমহাদেশ তথা বাইরের দুনিয়ায় প্রচুর কদর আছে জিনাতের। অনেকের কাছে সে যৌনতার দেবী। কারও কাছে একান্তের প্রিয়া, বহুজন আবার মুগ্ধ তার অভিনয়ের নৈপুণ্যে।

জিনাতকে নিয়ে স্ক্যান্ডালের সীমা নেই। কতসব বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। মন্দ লোকেরা রটিয়েছে, কি সব পর্নো ছবিতে নাকি তার শেষ কাপড়টুকুও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছে। ডাকসাঁইটে মেয়ে জিনাত। যাকে ছুঁবে একবার, তার বারো বাজবেই।

– আপনার সংগ্রহ তো কম নয়? এই কাগজগুলো কি আমাকে দেবেন? নোট করে কাগজগুলো না হয় ফেরত দেব।

– নিতে পারেন। দেখছেন তো অমস্তান সাংবাদিক সাহেবদের কীর্তি?

www.nagorikpathagar.org

এবার আপনারাই বলুন, বোম্বের এই বাজারী মেয়ের কাহিনী এ দেশে উপহার দেয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? এমন একটি পরিবেশ এদেশে গড়ে তোলার জন্য কি এই প্রয়াস নয়? বিলাতের এক কামাতুর লর্ডের প্রণয়লীলা (১৭/৮/৮৪ চিত্রবাংলা), ইতালীর লুসিয়াকে নিয়ে চাঁদমারি (৭/১/৮৩ চিত্রবাংলা), ভারতের প্রমোদবালা পিনকির ইতিকথা, সুচিত্রা তনয়া মুনমুন বোম্বের যৌনদেবী কি করে হলেন (১৩/৭/৮৪ চিত্রবাংলা), আমেরিকার টিভি স্টার মিস শারলিন টিলটন কিভাবে লক্ষ লক্ষ ডলার একমাত্র দেহ দেখিয়ে আয় করতেন, হংকং-এ থাই ললনরা সাদা চামড়ার পুরুষদের সংগে কিভাবে ব্যবসা করে (১০/৬/৮৩ চিত্র বাংলা), বক্ষ সুন্দরীরা কিভাবে জীবনে সাফল্য বয়ে এনেছে (২১/৩/৮২ চিত্রবাংলা), নতুন রূপে স্নানের পোশাক দেখাতে গিয়ে বিভিন্ন নারী দেহের প্রদর্শনী কেমন করে করে (৯/৭/৮৬ রোববার), মহিলার হাতে মহিলা কিভাবে ধর্ষিতা হওয়ার বিবরণ (১৮/৩/৮৩ চিত্রবাংলা), বাংলাদেশের চিত্র তারকাদের গোপন কথা (১৫/৬/৮৪ চিত্রবাংলা), "আর কাউকে করি নাকো কুর্নিশ, বয়েস তেরো থেকে উনিশ" ইত্যাদি বিষয়ে আর শিরোনামে ছবিসহ আলোচনা নিয়েই প্রতি সপ্তাহে কয়েক ডজন ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ করে। এসব ম্যাগাজিনের মালিকদের মধ্যে যৌন লেখা ও ছবি প্রকাশের কি দারুণ প্রতিযোগিতা! কে কার চেয়ে বেশী নগ্ন ভাষায় আলোচনা করতে পারে, করতে পারে, কে কার চেয়ে বেশী নগ্ন ছবি প্রকাশ করতে পারে, তার নিত্যপ্রতিযোগিতার ফসলই এসব ম্যাগাজিন। আলোচনায় নগ্নতা এমন ভাবে আনা হয় যে, প্রায় লেখায় যৌন মিলন পর্যন্ত ঘটিয়ে থাকেন, এর অধিক নগ্নতা তারা খুজেঁ পাচ্ছেন না। ছবিতে নারীকে একেবারে নেংটা করে এবং যৌন মিলনের দৃশ্য সম্বলিত ছবিও ছাপা হচ্ছে। এর চেয়ে অধিকতর নগ্ন ছবি আর কি পাওয়া যায়, সে চিন্তা-ভাবনা চলছে। এক দৈনিক পত্রিকা তো সম্ভবত ১৯৮৬ সনের এক সংখ্যায় ভারতের কোন এক সাধু তার বিশেষ অংগ দিয়ে কত সের ওজনের পাথর তুলতে পারে, সে কাহিনীও প্রকাশ করেছে। এসব যে মস্তান গড়ার উপকরণ, তা কি আপনারা স্বীকার করেন?

বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন। সেটি সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। সরকারের নীতিমালার অধীনে আর সরকার নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় ও সুনজরে ম্যাগাজিনটি গত বহু বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ম্যাগাজিনটি হাতে নিলে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সরকারের প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স নীতি মোতাবেক ম্যাগাজিনটি প্রকাশিত হয়

এবং এর মধ্যে যা কিছু থাকে, সবই এই নীতিভিত্তিক। সরকারী নীতিভিত্তিক সরকার পরিচালিত এই সাপ্তাহিকীতে কি কি ছাপা হয়, তা দেখে নেবেন।

'ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন' এক শ্রেণীর ম্যাগাজিনের বিশেষ এক আকর্ষণ। 'ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন' হিসাবে যা ইচ্ছা তা প্রকাশ করা যায়। ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত টাকা পেলেই বিজ্ঞাপনদাতার যেকোন কথা যেকোন কামনাবাসনা প্রকাশ করতে পারেন। এসব ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে নানা বিষয়ে নানাজনের নানা কথা থাকে। তবে হতাশ প্রেমিক-প্রেমিকা আর প্রেম প্রেম খেলা যারা ভালবাসেন, তাদের প্রেম-ভিত্তিক বক্তব্যই থাকে বেশী। যেমন 'তন্বী তরুণীরা লেখো।' 'আমরা দুই তরুণ। ঠিকানা....... ।' 'একজনকে খুঁজছি, একজন নারীকে খুঁজছি, খুঁজছি নারীকে, নারীর জন্য অনেক কবিতাই তো লিখতে ইচ্ছে করে; কিন্তু স্বপ্নের নারী তো এখনও বাস্তবে ধরা দেয়নি। আমার নিবার্সনের সঙ্গী হবে কি নারী'? বিদেশ প্রবাসী একজন বাংলাদেশীর এ বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনের পর রয়েছে ঠিকানা। একজন ইংল্যান্ড প্রবাসী বাংলাদেশীর বিজ্ঞাপন দেখুন "ইচ্ছা করে ফুল হয়ে এসেছিল-স্বার্থের তাগিদে আবার চলে গেল। আমার সুখ-দুঃখের অংশ নিতে কেউ আসবে কি?'' এই শ্রেণীভুক্ত বিজ্ঞাপনে আরও থাকে সুদর্শন শিক্ষিত অথবা ভাল চাকুরীতে নিযুক্ত প্রবাসী বাংলাদেশী যুবকের জন্য পাত্রী চাই বক্তব্য। বিশেষ অনুরোধ করা হয় ফটোসহ পত্রালাপ করতে।

এসব ম্যাগাজিনের 'সংস্কৃতি' অংশে এমন সব দেশী-বিদেশী সাংঘাতিক সংবাদ আলোচনা আর আদিরসের ছবি থাকে, যার অধিকাংশই অপসংস্কৃতির নামান্তর, কিন্তু সরকারী একটি ম্যাগাজিনে সরকারী নীতিমালা যেভাবে বাস্তব উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত হয়, তা দেখে এ লাইনের বেসরকারী ম্যাগাজিন আরও দশ কদম অগ্রসর হয়। তারা হয়ত ভাবে, সরকারী ম্যাগাজিন যদি হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় তুলতে পারে, তাহলে আমরা কোমর পর্যন্ত উঠিয়েই দেখি না কেমন লাগে। হাঁ, তারা সে পর্যন্ত উঠিয়ে থাকে। তারা দেখে, সরকার তো কিছুই বলেন না। এ না বলার সুযোগকে ভিত্তি করে তারা পুরোপুরি উদোম হয়ে যায়। সরকার থাকেন নীরব। তখন তারা ভাবে, সরকারকে গালি-গালাজ না করলেই বোধ হয় সরকার খুশী থাকেন, ঠিক আছে, গালমন্দ না করে শুধু সংস্কৃতির নষ্টিফষ্টি নিয়েই থাকি। এসব ম্যাগাজিনের আর্দশ হল সরকার পরিচালিত ম্যাগাজিনটি।

এ ম্যাগাজিন ঘনঘন বিনোদন, ফ্যাশন এবং বিচিত্র বিষয়ের বিশেষ সংখ্যা

www.nagorikpathagar.org

বের করে সুড়সুড়ি মার্কা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জোয়ার সৃষ্টি করে চলছে। এক একজন নায়িকার শত ভঙ্গিমার ছবি বিভিন্ন ক্যাপশনে উপহার দিয়ে থাকে। সরকারী ম্যাগাজিনের এ অবস্থা দেখে এ লাইনের বেসরকারী ম্যাগাজিনগুলো প্রতিযোগিতার জন্য তখন জেদ ধরে। তারা তখন অনুপ্রেরণা পায়, যে অনুপ্রেরণার ধাক্কায় প্রচ্ছদে পরিচ্ছদে নেংটা হয়ে যায়। সরকারী ম্যাগাজিন যদি অশ্লীল ভাব ও ভাষা ব্যবহার করে, তাহলে বেসরকারী ম্যাগাজিনগুলো যৌন সঙ্গম করিয়েই ছাড়ে। সরকার তাদের এ বজ্জাতি আর বদমায়েশী অনুশীলনে কোন বাধা সৃষ্টি করেন না। এ না করাটাকে বেসরকারী ম্যাগাজিনগুলো এক ধরনের পরোক্ষ সহযোগিতা বলে মনে করে আসছে। তাই, যেমন খুশী তেমন সাজতে ও চলতে পারছে। প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স নীতির 'মূর্ত প্রতীক' এ ম্যাগাজিন মাঝে-মধ্যে সরকারী নীতির পায়রাবী করতে গিয়ে বিভিন্ন দল-ব্যক্তি ও মহলের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই কুৎসা ছড়ায়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন উপকরণ ও তথ্য পৃষ্ঠপোষকরাই সরবরাহ করে থাকেন। মোটকথা, এ নগ্নতা আর অশ্লীলতা এবং উপর তলার ঈশারায় কুৎসা বয়ানের উদ্দেশ্যমূলক নিবন্ধ প্রকাশ করা সহ সেক্যুলার মন-মানস গড়ে তোলার কাজে পত্রিকাটির প্রকাশনা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিনা জানি না, তবে তাদের কাজকর্ম তাই যেন প্রমাণ করে। দেশের পত্রপত্রিকাগুলো কিভাবে চলা উচিত, সেগুলোতে কি কি থাকা উচিত আর কি কি থাকা উচিত নয়, কোন্ ধরনের ছবি ছাপা চলে আর কোন্ ধরনের ছবি ছাপা যায় না, দেশ গঠনের, জাতি গঠনের, যুব সমাজের চরিত্র গঠনের, শিশুদের মন-মানসের নৈতিক ভিত্তি রচনার জন্য কি কি পরিবেশনা থাকা দরকার, দেশে দুর্নীতির স্বজনপ্রীতিসহ যত অনাচার অবিচার রয়েছে, তা এক এক করে জনসমক্ষে তুলে ধরার কি কি ব্যবস্থা কিভাবে থাকা দরকার, তা সরকার পরিচালিত পত্রপত্রিকাগুলো দিশারী পথ-প্রদর্শক অথবা গাইড হিসাবে ভূমিকা রাখা উচিত ছিল বেসরকারী ছিল বেসরকারী পত্রপত্রিকাগুলোর সামনে, কিন্তু সরকারী পত্রিকাগুলো তা পারেনি বা করেনি। অন্য একটি বেসরকারী ম্যাগাজিনের কথা বলছি। সে ম্যাগাজিনের একটি নিয়মিত ফিচার হচ্ছে 'ছেলেদের জন্য'। এ শিরোনামে আলোচনা করেন অবিবাহিতা যুবতীরা। প্রতি সংখ্যায় অন্তত তিন চার জন যুবতী আলোচনায় নামেন। শীর্ষে থাকে তাদের আকর্ষণীয় ভংগীমার ছবি। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কি জানেন? বিষয়বস্তু হচ্ছে, কি ধরনের ছেলে তাদের পছন্দ, তা বলেন। হাঁ, এই যুবতীরা যেমন ছবির মাধ্যমে হাজির হন, তেমনি আলোচনার শুরুতে থাকে তাদের নাম-ঠিকানাসহ পূর্ণ পরিচিতি। প্রত্যেক

www.nagorikpathagar.org

যুবতীকে দশটি কারণ উল্লেখ করতে হয়, যে দশটি গুণের বা চরিত্রের ছেলেকে তারা পছন্দ করেন। তাদের পছন্দের কারণ আরও বাড়াতেও পারেন। অনুরূপভাবে 'মেয়েদের জন্যে' শিরোনামে থাকে অবিবাহিত যুবকদের পছন্দগুলো। এই দুটি শিরোনামে তারা যেমন খুশী তেমন পছন্দ ব্যক্ত করেন।

একটি মেয়ের পছন্দের ব্যাখ্যা দেখুন। 'আমি ছেলেদের ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত পছন্দ করি। কারণ, ছেলেদের স্মার্টনেস না থাকলে মেয়েদের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না।' আর এক মেয়ের পছন্দ, আমার দৃষ্টিতে হালকা-পাতলা ছিমছাম শরীরের ছেলেরাই মানানসই বেশী। তাছাড়া সুন্দর, রুচিবান, পরিপাটি চুল, পুরু গোঁফ, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পোশাক পরিহিত ছেলেদের দেখলে আমি চমকে উঠি। মনের ভিতরে অজানা খেলার ডাক শুনতে পাই, যখন দেখি কোন ছেলে বাম হাতের কব্জিতে সুন্দর করে বড়ো ডায়ালের ঘড়ি বেঁধে মেয়েদের সাথে মার্জিত ভাষায় কথা বলছে। থমকে দাঁড়িয়ে যাই তখন। মনে হয়, আহা! যদি ওর সাথে কথা বলতে পারতাম অথবা আমার সাথে ও কথা বলতো! একই সাথে আমার ওই ধরনের ছেলেদের ভালো লাগে, যারা যৌনতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে জীবনকে সহজ ও সুন্দরভাবে বাস্তব চিন্তা-ভাবনায় নিজেদের গড়ে তুলতে চায় এবং তোলে।

ঠিক একইভাবে আমার দৃষ্টিতে ওইসব ছেলেদের একেবারেই ভালো লাগে না, যারা দেখতে বেঁটে, খাটো এবং স্থূল দেহের অধিকারী। তাছাড়া ক্লীন সেভ করে যেসব ছেলেদের ইচ্ছাকৃতভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখি ইতস্তত, তাদের দেখে আমার কাছে রুচিহীন বলে মনে হয়। একই সাথে মেয়েদের গায়ে পড়ে কথা বলা ছেলেদের মোটেও পছন্দ করি না। আমার ধারণা, গায়ে পড়ে মেয়েদের সাথে কথা বললেই ছেলেদের খোলামেলা এবং ফ্রিনেস বুঝায় না। এটা হ্যাংলোমোরই পরিচয় বহন করে। আর ওইসব ছেলেদের দেখলে আমার আনাড়ি মনে হয়, যারা যৌনতা সম্পর্কে কোন রকমেরই ধারণা রাখেনা। আমি মনে করি, এ ধরনের ছেলেদের জীবন যাপন পদ্ধতি মধ্যে আবেগপ্রবণতা কম থাকবে এবং সুন্দর সাবলীলভাবে নিজেদের গুছিয়ে চলাফেরা করবে। অপরপক্ষে দেখুন একটি ছেলে কি ধরনের মেয়ে পছন্দ করে তার বর্ণনা। ১। শৈল্পিক বাচনভঙ্গি, ২। কাপড়ের রংয়ের অর্থ বুঝে পোশাক পরা, ৩। মার্জিত অথচ ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানে না অথচ ফ্যাশনেবল পোশাক পরা, ৪। প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা, ৫। ছেলেদের সাথে কথা বলতে সংকোচবোধ না করা, ৬। নিয়মিত পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন পড়া, ৭। নিম্নস্বরে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কথা বলা,

www.nagorikpathagar.org

৮। মিষ্টি মধুর হাসি, ৯। বাঁকা চাহনি, ১০। একই জিনিস একাধিক পছন্দ না করা।

যেসব ছেলেমেয়ে ফটোসহ পত্রিকায় লেখালেখি করে সাথী তালাশ করে থাকে, তারা যে কোন্ স্তরের, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ওরাই মস্তান, মস্তান হয়ে নিজেদের প্রকাশ করে।

এ ম্যাগাজিনের একজন লেখক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পোস্টারে ছাপা নগ্ন নারী চিত্র রসালো বর্ণনা দিয়ে ছাপিয়েছেন একটি সংখ্যায় (১/৩/১৯৮২, চিত্রবাংলা)। এ ছবিগুলো শুধু নগ্নই নয়, জঘণ্য ধরনের নগ্ন। যেমন, পার্কের বেঞ্চে বসে চুমুর দৃশ্য, উর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত, মাথা নীচু করে আছে কিশোরী, উঁচু হিল জুতাপরা যুবতীর মিনি স্কার্ট তুলে কৌতূহল ভরে দেখছে এক বালক, বিছানায় শুয়ে আছে নগ্ন বক্ষা যুবতী, বাঁশী বাজাচ্ছে মাথা নীচু করে নগ্ন বক্ষা তরুণী ইত্যাদি। এ সচিত্র নিবন্ধ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হলো, সরকারী নীতিমালা কোন বাধা দিল না। এভাবে নানারূপে নানা ধারায় সর্বদা প্রকাশিত হচ্ছে পর্নো ম্যাগাজিন। সরকার এসবে বাধা দেন না। কারণ, সংস্কৃতি চর্চা তাতে বিনষ্ট হবে। 'ধর্ষণ কি সামজিক সমস্যা' (৩০/৩/১৯৮৪ চিত্রবাংলা) এ শিরোনামে নিবন্ধ ছাপিয়ে ম্যাগাজিনটি মন্তব্য করে, ব্যাপারটি নাকি বিতর্কিত। একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আপনাদের পাতা' শিরোনামে 'যখন প্রথম ধরেছে কলি' কলাম খুলে যেসব তরুণ তরুণীর জীবনে প্রথম প্রেমের কলি এসেছে, তাদের এ কলিগুলোকে পাপড়ি মেলার সুযোগ করে দিয়েছে। কিভাবে প্রথম কলি পাপড়ি মেলে দেখুন। ১৮ বছরের এক ছেলে এই কলামে এভাবে লিখেছে, ''আমার জীবনের আঠার বসন্তে আজ অবধি মনের মত লাল গোলাপ পেলাম না। কিন্তু মালা নামের মেয়েটিকে দেখবার পর থেকে আমার মাঝে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমাদের পাশের বাসায় নতুন ভাড়াটিয়া হিসাবে এসেছে ওরা। ওকে আমি কখনও একা বের হতে দেখিনি কোথাও। এতদিন ওর সম্বন্ধে যা জেনেছি, তা হলো, ও ভীষণ লাজুক এবং অত্যন্ত ভদ্র মেয়ে। ভাই-বোনদের মধ্যে ওই সবার বড়। অক্সফোর্ড স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। মালা আমার বেদনার মালা হয়ে কণ্ঠ যেন ঠেসে ধরছে বারবার। ছোট ভায়ের জন্মদিনে এসেছিলো ওরা। প্রাণভরে ওকে দেখেছিলাম সেদিন। বারবার ওর সামনে দিয়ে যাওয়া, ওর সাথে চোখাচোখি হওয়া-ও নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করতে পেরেছিল। যতবার ওর সাথে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে, ওর সলজ্জ দৃষ্টিতে কি ভালবাসার আগুন ছিল জানি না! আমি এবারকার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। রাতে কারেন্ট চলে গেলে রাস্তায় হাঁটি, ওদেরকেও

www.nagorikpathagar.org

দেখি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ওর সাথে কত দেখা হয়েছে, কোনদিন কথা হল না। ওকে আমি ভালবাসি, হয়তবা এটাও সে জানে, নয়তবা জানে না। আমি সাহস করে আমার ভাল লাগার কথা কোনদিন আমার ভালবাসার প্রথম মানসীকে জানাতে পারলাম না, জানাতে পারলাম না তাকে আমি কত ভালবাসি আমার অন্তর গুমরে গুমরে আর্তনাদ করছে ওকে আমার ভালবাসার কথা জানানোর জন্য। আমার প্রথম ভাললাগা মানসী–আমার স্বপ্ন সায়র। মাঝে মাঝে আমার রুমের জানালা পথে গাছের অজস্র পাতার ফাঁক দিয়ে ওদের দেয়ালঘেরা মাঠে খেলতে দেখি। ইশারায় কাছে ডাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ওকে। ও কি আমাকে এভাবে দেখেছে কোনদিন– জানি না। তবে মাঝে মাঝে এদিকে তাকাতে দেখি ওকে।

ওকে বড্ড ইচ্ছে আমার ভালবাসার কথা জানানোর। কিন্তু কিভাবে? জীবনে প্রথম কোন মেয়েকে ভাললাগা। তাই ভীষণ ভয়, কিন্তু ওকে যে আমি কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না। ভালবাসার যখন প্রথম ধরেছে কলি, আজ তা একটু করে প্রস্ফুটিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিচ্ছে আমার হৃদয়ে, কিন্তু মালাকে জানাতে পারলাম না কোনদিন–'মালা, তোমাকে আমি ভালবাসি।" (১/৪/৮২ চিত্রবাংলা)

অন্য এক যুবকের কলি যেভাবে পাপড়ি মেলে ঝরে পড়ে গেল সে কাহিনী শুনুন। "জানো, হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়লে এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। কারণ, আমি ভোরের পাখি আর গন্ধরাজ ফুলকে সাক্ষী রেখেই তোমাকে ভালবেসেছিলাম। তোমার সাথে কখন পরিচয় হয়েছিল, তার দিনক্ষণ অবশ্য মনে নেই। কিন্তু তোমার আমার মিলনের দিনক্ষণ আমার স্পষ্ট মনে আছে; সেদিন ছিল ৮ই মে ১৯৭৮ ইংরেজী সাল, ভোর ৫–৩০ মিনিট। মনে পড়ে, ৮ই মে লাইট পোস্টের নীচে সেই মাধুরী ফুল গাছটির রাস্তাটিতে এসেছিলে তুমি প্রাতঃভ্রমণের উদ্দেশে। আমিও রোজই সকালে বেড়াতাম। প্রায়ই দু'জনে চোখাচোখি হতো, কিন্তু মানুষের ভয়ে কেউ কারও 'প্রেম' নামক ভাষাটা উচ্চারণ করতে পারতাম না। ৮ই মে, সেদিন আমার হাতে ছিল পাশের বাড়ী হতে আনা একই বোঁটাতে দু'টি গন্ধরাজ। তুমি আসলে, আমিও আসলাম, তুমি আসলে সেদিন আর স্থির থাকতে না পেরে মনের ভাষাটা বুঝানোর জন্য ঐ ফুল জোড়া তোমাকে দিলাম। তুমিও তোমার মনের আবেগ প্রকাশ করে ঐ দু'টি ফুল নিয়ে হেসে হেসে চলে গিয়েছিলে। একদিন তুমি বকুলতলা থেকে একটি বকুলের মালা বানিয়ে এনেছিলে। আমি জানতাম না, কেন এই মালা। অনেক্ষণ কথা বলার

৫

www.nagorikpathagar.org

পর তুমি আমার গলায় মালাটি পরিয়ে দিলে। আমিও সংযত হতে না পেরে গলা পেরে গলা থেকে ঐ মালাটি খুলে তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম। মালাটি এখনও আমার নিকট আছে, তবে গন্ধহীন অবস্থায়। জানো, এ দিনটার কথা মনে পড়লে আজও উত্তাল হয়ে পড়ি।

দেখতে দেখতে চলে গেল একটি বছর। আবার ফিরে এলো ৮ই মে। যেদিন তুমি এসেছিলে আমাদের বাসায়, তোমার পরনে ছিলো একটি সুন্দর প্রিন্টের শাড়ী। জানো, তখন তোমাকে অপরূপ লাগছিলো। প্রথমে তুমি আমাকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করেছিলে। আমি আবেগে টিকতে না পেরে তোমার দুই বাহু উঠাতে যেয়ে অনুভব করলাম, তোমার সমস্ত দেহখানা কাঁপছে। তুমি তখনই আমার সমস্ত দেহটাকে জড়িয়ে কেঁদেছো একান্ত গোপনে। তখনও আমি বুঝতে পারিনি যে, তুমি চলে যাবে আমার পাশ ছেড়ে। তোমরা বাসা বদল করে চলে যাচ্ছ তোমাদের গ্রামে। কারণ, শহরের পাট তোমাদের চুকে গেছে।

তোমার সাথে শেষ দেখা হয় তোমার এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে। অনেকক্ষণ কথা বলার পর তুমি তোমার হাত খানা আমার হাতে রেখে বলেছিলে, তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবো না। তারই কিছুদিন পরে শুনলাম তোমার বিয়ে। তুমি নাকি মত দিয়েছ। তোমার বিয়ে হয়েছে। তুমি সুখী হও এটাই কামনা করি। কিন্তু দেখো, কখনও আমার ভালবাসাকে ভুলো না। জানো, আজকাল আমার দিনগুলো অসহ্য। আর রাতগুলো নিদ্রাহীনভাবে কাটছে। চোখ বুজলেই অতীতের স্মৃতিগুলি সিনেমার মতো ভেসে উঠে সামনে। আমি পরীক্ষায় পাস করেছি, আরও পড়ব। কারণ, পড়ার মধ্যে থাকলে মনের দুঃখ কিছুটা লাঘব হয়। এজন্য নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কেন ভালবাসতে গেলাম তোমাকে? তোমার মনে কি এই ছিলো? তোমার ৮ই মে'র কান্না তাহলে একটি অভিনয়ের অংশ, তাই না? যাক, সর্বশেষে কামনা করি তুমি সুখী হও, সুখের হোক তোমাদের দাম্পত্য জীবন।" পত্র লেখক–কুমিল্লার ঠাকুর পাড়ার সাগর চক্রবর্তী। বলাবাহুল্য, পত্রিকাটির নাম চিত্রবাংলা।

অন্য এক তরুণের কলিতে অলি এসে হতাশার ঝড় তুলে গেল, তেমন এক আর একটি হচ্ছে এই- "তুমি, তুমি কি সেই আমার মনের চারপাশে শক্ত আবেষ্টনী দিয়ে রেখেছো, যা আমি জাগরণে, নিদ্রায় অনুভব করি? যা আমি শত চেষ্টায় ভাঙতে পারি না, সে তো তোমার সৃষ্ট আমাকে ঘেরা সুকঠিন প্রাচীর। হাঁ, তোমাকে আমি চিনি, তুমি সেই যে প্রতিদিন সকালে আমাকে মিষ্টি মধুর হাসি উপহার দিয়ে যাও। আবার কখনও তোমাকে দেখি মার্কেটিং করতে এসেছ।

www.nagorikpathagar.org

যদিও তোমাকে উগ্র আধুনিক বলে আমার মনে হয় না, তবুও তোমাকে তখন আমার কেমন যেন মনে হয়। আসলে আমি হয়ত তোমাকে অনুকরণরত দেখতে চাই না বলেই আমার অন্য অনুভূতি আসে। বাঙালী মেয়ের বাঙালীত্বই তাদের প্রেয়সী করে তোলে। তোমাকে তাই এভাবে দেখতে চাই, বার বার আমি তোমাকে দেখি, তবু দেখার সাধ মেটে না। তুমি কি বিরক্ত হও? অথবা, তুমি কি সেই, যার সাথে আমার 'প্রথম প্রেম' আর শেষ প্রেম। যে আমাকে লিখেছিল, 'তোমার আমার প্রেম যেন সাড়া পায়।' যে আমাকে ভালবাসার সড়কে হাত ধরে হাঁটা শিখিয়েছিল। নিজে পাকা ছিল না বলে বিপজ্জনক মোড়ে আটকে গেলে। আর আমি, আমি ত দুর্বার গতিতে ছুটে চললাম। তোমাকে আমি দোষ দেব না, তবে আমার ও তোমার রথে চড়ার আগে সারথী পরখ করে নেয়া উচিত ছিল। তোমার অপরূপ অবয়ব আমি বাঁধানো ফ্রেম মনেই ধারণ করে আছি। পৃথিবীর সব প্রেমিক উদারভাবে প্রথম প্রেমকে মর্যাদার সাথে লালন করে।"

অন্য এক হতাশ প্রেমিকের প্রেমকলি কিভাবে ঝরে পড়েছে তা দেখুন। "অনামিকা, ভেবেছিলাম অপসৃয়মাণ আবছা স্মৃতিছায়াকে সামনে এনে ব্যথার পাপড়িকে আর মুকুলিত বা পল্লবিত করবো না। কিন্তু পারলাম না। অনু, তুমি হেয়ালীভরা বিবেক দ্বারা আলতোভাবে আমায় যে আঘাত করেছো, আমার অন্তরবীণার সপ্ততারের তন্ত্রীতে যে বেদনার ঝংকার তুলেছো, আজও কিন্তু তা থামেনি। দৈনন্দিন জীবনের ভাসমান মোহনায় থেকে তোমার দেয়া আঘাতের ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে আজও। বালি, কাঁকর আর লোনা জলের সংমিশ্রণে সফেদ ফেনারাশি আমার দৃষ্টিকে ঝাপ্সা করে দেয়। একবার, দুইবার, তিনবার করে, বারে বারেই একটা প্রতিশোধের বহ্নিস্পৃহা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। একেবারে ইচ্ছে করে অমিত শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি তোমাদের অহংকারের সৌধমালা ভেঙ্গে দিতে।

পত্র-পত্রিকা আমরা প্রত্যহ পড়ি। আপনারা যেগুলোকে জাতীয় দৈনিক বলেন, সেসব দৈনিকের কোন কোনটি তো অপরাধ এবং যৌন সংবাদপত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এক যুবক এক যুবতীকে ধর্ষণ করেছে, এটুকু বললেই তো হয়। না, এসব দৈনিকে এতটুকু বলেই শেষ করে না, বরং এভাবে কথা দিয়ে চিত্র অংকন করে, যুবকটি যুবতীকে কিভাবে দেখল, কিভাবে তার কাছে আসল, কি করলো, কি বলল, কিভাবে ধরল, কোথায় নিয়ে গেল, কিভাবে ভয় দেখিয়ে চুপ রাখল, কিভাবে মাটিতে ফেলল এবং কি প্রক্রিয়ায় অপকর্ম করল। এ হচ্ছে বর্ণনার ধারা। আরো শুনবেন?

www.nagorikpathagar.org

– আপনার কথাই তো শুনছি, ভাল লাগছে। আরও শুনান। এ লাইনে আমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই।

– তাহলে শুনুন। ভারতের কোন আশ্রমে সাধুরা তাদের লিঙ্গের ব্যায়াম কিভাবে করে তারও বিশদ বর্ণনামূলক সংবাদ ছাপা হয়েছে একটি জাতীয় দৈনিকে। দেশে বা বিদেশে, যে যেখানে যত অকাম কুকাম করছে, তা সংগ্রহ করে প্রতিদিন যত্নের সংগে পরিবেশন করা হচ্ছে দুএকটি জাতীয় দৈনিকে। খুনী কিভাবে খুন করছে তার সচিত্র বর্ণনাও থাকছে। এসব দৈনিক অলক্ষ্যে সেই অপরাধের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছেনা? আপনারা সেসব দৈনিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু আমাদের বলছেন, আমরা কেন অকাম কুকাম করছি? এই অকাম কুকামের দিকে যারা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের কি কোন দোষ নেই? তাদের ব্যাপারে আপনারা নীরব কেন? সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক ম্যাগাজিনগুলোর শতকরা ৯৫টি আমাদের মস্তান বানাবার জন্য দায়ী। একথা বললে কি আপনারা বিশ্বাস করবেন? ফুটপাতে যেসব হকার হরেকরকম ম্যাগাজিনের পসরা সাজিয়ে বসে, তাদের সাজানো ম্যাগাজিনগুলোর ভিতরে প্রবেশ করার আগে অন্তত একবার প্রচ্ছদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কি দেখবেন? দেখবেন, নগ্নবক্ষা নারীর ছবি, চুম্বনরত যুগলের ছবি, উরু উদোম করা অভিনেত্রীর ছিনালী হাসির ছবি এবং আরও কত কিছু। সরকারী ছাড়পত্র নিয়ে প্রকাশকরা এসব ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। তারপর আরো কয়েক খানা হাতে তুলে নিন। পাতা উল্টাতে থাকুন। দেখবেন নানা জনের নানা ভঙ্গির বিচিত্র জীবন ছবি। গল্পে যা থাকছে তাতেও নেংটাভাব আর ভাষা, কবিতায়ও তাই। এসব ছাড়া যা থাকে তা দেশ–বিদেশের যৌন কেলেংকারীর ছবি ও কাহিনী। স্নানের নতুন পোশাকের বিচিত্র ভাব–ভঙ্গির ছবিও থাকে এসব পত্রিকায়। শুধু একটা নেংটিপরা অবস্থায় এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন ঐ নেংটি পরে তার নিতম্ব দেখাচ্ছে। এভাবে আরও ৫ জন ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। স্যুইমিং স্যুটের মডেল ক্রিস্টিনা ডুপ্রের নেংটা হওয়ার ছবি, মেরী হার্টের প্রেম, মার্কিন যুবতী লিসা সিলওয়ার সচিত্র ভঙ্গিমা কাহিনী, কোরিনের জয়যাত্রার কথা ইত্যাদি। এসব হচ্ছে আমাদের ম্যাগাজিনগুলোর প্রধান উপজীব্য। বাজারে তারা এ জ্ঞানই ছড়াচ্ছে। এবার বলুন, আপনারা যদি এসবের প্রকাশের অনুমতি দেন তাহলে আমরা এগুলো দেখে কিছুটা কসরত করতে দোষ কি? অতএব আপনার কাছে সবিনয় নিবেদন–

০ আগে আপনাদের নীতিমালার নীতি ঠিক করুন।

www.nagorikpathagar.org

- অশ্লীলতা আর যৌনতা কা'কে বলে, এসবের সংজ্ঞা আর ব্যাখ্যা নির্ণয় করুন।
- যেসব পত্রপত্রিকার মালিক প্রকাশক এবং লেখিয়েরা নিজেদের মস্তান নন বলে দাবী করেন এবং মস্তানদের উদ্দেশ্যে সুযোগ পেলেই গালি পাড়েন, তাদের আগে আপনারা মানুষ করুন, তাদের মন আর মস্তিষ্ক আগে পবিত্র করুন।
- সরকারের প্রকাশনা নীতিমালাকে কেতাবীমালা না বানিয়ে প্রয়োগের আমলে অভ্যস্ত করুন।
- প্রকাশনা ব্যবসায় যারা অধিক রোজগারের দুরভিসন্ধি মনে পোষণ করে ব্যবসায়ী মনকে বেশ্যামনের মত বাছ- বিচারহীন করে তুলেছেন, তাদের যদি রুচিশীল কোনভাবে করতে পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে অন্তত কেউ মস্তান হবে না, এটা আমার বিশ্বাস। আমি যেমন এ লাইনে এসেই মস্তান হয়েছি। কারণ, উপকরণ পেয়েছি অনেক।

এবার বলুন দায়ী কে? আপনি দীর্ঘক্ষণ ধরে চুপ রয়েছেন। শুধু হু হু করছেন। প্রতিবাদ করেন না কেন?

– প্রতিবাদ করার মত ভাষা ও যুক্তি কোনটাই আমার নেই। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, যে উপলব্ধিতে এসব ম্যাগাজিন পড়া বন্ধ করেছেন, আর একটা উপলব্ধি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে বর্তমান জীবনধারা বর্জন করে পরিবারের ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করুন।

– বোধহয় এপথ থেকে প্রত্যাবর্তন করার কোন সুযোগ নেই। যে কদ্দিন বাঁচি, আমাকে এভাবেই বাঁচতে হবে। রাত অনেক হয়েছে। চলুন, খাওয়া-দাওয়া করে আপনাকে বাসায় পৌঁছাবার ব্যবস্থা করি।

– তাই করুন, তবে আহার আর নয়, নাস্তা তো অনেক খাওয়ালেন।

– আপনাকে খাওয়া-দাওয়া করে যেতেই হবে। খাবার সময় কেউ বাসায় আসলে না খাইয়ে ছাড়া হয় না। এটা আমাদের পারিবারিক খাদ্যনীতি।

আহার সেরে একগাদা ম্যাগাজিন বগলদাবা করে গাড়ীতে উঠলাম। আমার সাংবাদিক বন্ধুও সাথে আসলেন। কিন্তু তিনি আমার বাসায় থাকলেন না। আমার বিদায় নেয়ার সময় মস্তান ঐ ছাত্রটি সত্যিই খান্দানী কায়দায় বিদায় দিলেন। মনে হল, খান্দানের প্রভাব থেকে তিনি এখনও মুক্ত নন, কিন্তু যার নজরে পড়ে তিনি মস্তান হয়েছেন, সেই নজরের কুদৃষ্টি থেকে মৃত্যুর আগে মুক্তি পাবেন, এমন আলামত দেখলাম না, তবে আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

www.nagorikpathagar.org

রাজনীতি আমাকে মস্তান বানিয়েছে

সাবেক মন্ত্রীর মস্তান পুত্রের জবানবন্দী নিতে আমাকে খুব বেশী কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। সে চান্স বাইচান্স পেয়ে গেলাম। বাইচান্সের চান্স কিভাবে পেয়ে গেলাম, এখানে সে বয়ানই আগে পেশ করছি।

যে সময় আমি তার জবানবন্দী নেই, সে সময় এক ফুল মন্ত্রীর বাসায় এই মস্তান বাবাজীর অবাধ যাতায়াত ছিল। আমিও ঐ মন্ত্রীর একটা সাপ্তাহিক কাগজে তখন কাজ করতাম। তিনি যখন মন্ত্রী হন, তখন এ কাগজের প্রকাশনা প্রায় বন্ধই ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝে আমাকে ডাকতেন। কারণ, তাঁর লেখালেখির অভ্যাস ছিল। আমার জানামতে তাঁর লেখা তিনখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের পান্ডুলিপি তৈরী করে আমাকে ডাকতেন, আমি তাঁর পান্ডুলিপিতে চোখ বুলাতাম। প্রয়োজনীয় সম্পাদনাও করে দিতাম। কেন জানি না, আমার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি মনে করতেন, আমি তাঁর পান্ডুলিপি দেখে দিলে তাতে কোন ভুল থাকবে না। আমার সীমাহীন অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পান্ডুলিপি দেখতাম। আমার দেখা শেষ হলে তিনি কম্পোজের জন্য প্রেসে পাঠাতেন। একদিন আমি তাঁর খাস বৈঠকখানায় বসে পান্ডুলিপি দেখছি, এমন সময় মন্ত্রী সাহেবের বাসার কাজের এক লোক একজন যুবককে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকে বললো, ইনি এখানে বসবেন। সাহেব এখনই বাইরে চলে যাচ্ছেন। এক ঘন্টা পর ফিরে এসে কথা বলবেন। আপনাকেও ততক্ষণ থাকতে বলেছেন। এ কথা বলে সে চলে গেল।

যুবকটি কোন দিকে না তাকিয়ে টেবিলে রাখা বিভিন্ন দৈনিক দেখতে লাগলেন। আমিও আমার কাজ করতে লাগলাম। তাকে দেখার পর থেকে আমার মন বলছিল যে, তার ছবি আমি পত্রপত্রিকায় কয়েকবার দেখেছি। বিশেষ এক ছাত্র সংগঠনের প্রথম কাতারের নেতা বলেও তার পরিচিতি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। মনে প্রশ্ন জাগলো, এ যুবক এখানে কেন? তিনি কি এখন এ সরকারের নতুন ছাত্র সংগঠনে যোগ দেয়ার জন্য লাইন দিচ্ছেন, না এ সরকারই মন্ত্রীর মাধ্যমে দলভুক্ত করার জন্য যুবককে ডেকে এনেছেন?

এসব চিন্তা-ভাবনা করতে করতে প্রায় আধ ঘন্টা সময় অতিবাহিত হলো। এদিকে আমার হাতের কাজও শেষ। পান্ডুলিপি টেবিলের একপাশে রেখে মস্তান বাবাজীর দিকে তাকালাম। তিনি, তখন খবরের কাগজগুলো একটার পর একটা সাজিয়ে টেবিলের একপাশে রেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখছিলেন?

www.nagorikpathagar.org

– একটা লেখা দেখছিলাম। মন্ত্রী সাহেবের লেখা পান্ডুলিপির কিছু অংশ।

– আপনার পরিচয়? তিনি প্রশ্ন করলেন।

– আমি এক দৈনিকে কাজ করি। দৈনিকটির নামও বললাম। তার পরবর্তী জিজ্ঞাসার জবাবে আমার পদবীর কথাও বললাম। তারপর এল আমার জিজ্ঞাসার পালা।

– আপনার পরিচয়? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

– আমি একজন ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। ছাত্র রাজনীতির সংগে জড়িত আছি। তারপর তিনি ছাত্র সংগঠনের নাম বললেন। তিনি এ সংগঠনের বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন, মূল দলের বড় বড় নেতার সংগে তার বিশেষ লাইন আছে, গ্রেফতারও হয়েছেন কয়েকবার, এসব কথাও বলতে ভুল করেননি। আরও বহু কথা বললেন বিনাজিজ্ঞাসায়।

তিনি যে এক সাবেক মন্ত্রীর সন্তান, সেকথাও বললেন।

এ সুযোগে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কেন এই মন্ত্রীর সংগে দেখা করতে আসলেন? জবাবে বললেন, মন্ত্রীই নাকি তাকে মাঝে মাঝে ডাকেন। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম–

– লেখাপড়াই তো আপনার জীবনের এ সময়ের মূলনীতি হওয়া উচিত, এখন রাজনীতি করার বয়স ও সময় কোনটাই আপনার নেই। এসব করে আপনার যে ক্ষতি হচ্ছে, তা কি বুঝেন না? আমি এক নিঃশ্বাসে এ প্রশ্ন করলাম তাকে।

– কিছুটা তো বুঝি। সংক্ষিপ্ত তার উত্তর।

– যদি কিছুটা বুঝে থাকেন, তাহলে পড়াশুনায় মনোযোগী হোন। আগে জীবন গঠন করুন। লেখাপড়া শেষ করুন, তারপর খুব করে রাজনীতি করুন।

– বলছেন তো ভাল কথা। কিন্তু আপনি যদি আমার অবস্থানে থাকতেন, আর আপনাকে আমি একই উপদেশ দিতাম, তাহলে আপনিও তা মানতে পারতেন না ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। এখন আমি যে অবস্থায় আছি, ডানে-বামে বা পিছনে যাওয়ার পথ বন্ধ। একটা পথই খোলা, সে পথ সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার।

– আপনি কি মেহেরবানী করে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিবেন?

– আপনার কি প্রশ্ন বলুন?

– আপনি এপথে কিভাবে আসলেন, তা কি জানতে পারি?

হাঁ, খুব জানতে পারেন, তবে আজ নয় অন্য দিন। আমি কথা দিলাম,

www.nagorikpathagar.org

আপনাকে সবই খুলে বলবো।

মস্তান বাবাজী আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। আমি আর জেদ ধরলাম না। তবে তিনি একটা তারিখ ও সময় দিলেন। স্থানও নির্ধারিত হলো মন্ত্রীর নিজস্ব বাসভবনের নীচ তলায় অতিথি অভ্যর্থনা কক্ষ। ইতোমধ্যে মন্ত্রী সাহেবেরও আগমন ঘটলো। আমি মন্ত্রী সাহেবকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে হাজির হলাম। মন্ত্রী মহোদয় এসময় বাসায় ছিলেন না। এসে দেখি, যুবকটি তার দুজন সাথী নিয়ে নীচতলার অভ্যর্থনা কক্ষে বসে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি সালাম দিয়ে বললেন, শুধু আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। মন্ত্রী সাহেবের সাথে আমার দেখা হয়েছে। তিনি কিছুক্ষণ আগে বের হয়ে গেলেন।

আমি বললাম, মন্ত্রী সাহেবের সাথে দেখা করার প্রয়োজন আজ আমার নেই। আমি এসেছি শুধু আপনার সংগে আলাপ-আলোচনার জন্য। সাথীদের পরিচয় জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, ওরা আমার সাথী। বিশ্ববিদ্যালয়েই লেখাপড়া করে। তারাও ছাত্র রাজনীতি করে।

আমি তাদের সাথে করমর্দন করলাম। আমার পরিচয়ও দিলাম। এই অভ্যর্থনা কক্ষে আমরা চার জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই কয়েক মিনিট অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার পর প্রাসঙ্গিক আলোচনা শুরু করলাম। প্রথমেই তিনি বললেন, আপনি কি জানতে চান, আমাকে প্রশ্ন করুন।

– আমি জানতে চাচ্ছি, আপনারা এ লাইনে কেন আসলেন?

– তাহলে শুনুন। তবে একটা শর্ত, আমাদের নাম-ঠিকানা ও পরিচয় কখনো ছাপতে পারবেন না। আগে এই প্রতিশ্রুতি দিন।

– দিলাম প্রতিশ্রুতি। বেশ জোর দিয়েই এই ওয়াদা করলাম।

– প্রথম যুবক, যার সাথে আমি পূর্বেই পরিচিত ছিলাম, তিনি শুরু করলেন।

শৈশবে-কৈশোরে রাজনীতির হাওয়া বার বার আমাদের গায়ে লেগেছে; কিন্তু দিওয়ানা বানাতে পারেনি। কারণ, অভিভাবকদের কড়া শাসনে আমরা ছিলাম। তাঁদের প্রতি আমাদের ভয় ও ভক্তি উভয়ই ছিল। ভোরে ঘুম থেকে ওঠে হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসতাম। পড়াশুনা শেষ করে গোসল ও খাওয়া-দাওয়া সেরে স্কুলে যেতাম। স্কুল ছুটি হলে এক মিনিটও এদিক-ওদিক সময় নষ্ট না করে ঘরে ফিরতাম। ঘরে ছিল অভিভাবকের ভয় আর বিদ্যালয়ে ছিল শিক্ষকদের ভয়। রাজনীতির জিন্দাবাদ-মুর্দাবাদের 'বিপ্লবী' আওয়াজ কানে আসতো, কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

অন্তরে কোন দাগ কাটতো না। তবে এ আওয়াজ কিছুটা যে ধাক্কা দিত, তা অনুভব করতাম। অভিভাবক আর শিক্ষকের কড়া শাসনের কারণে কৌতূহলবশতও রাজনীতির ময়দান দেখার ইচ্ছা মনে জাগতো না। মুরব্বী বয়সের লোকজনকে রাজপথ দিয়ে মিছিল করে যেতে দেখতাম। শুনতে ভাল লাগতো তাদের সম্মিলিত কণ্ঠে জিন্দাবাদ-মুর্দাবাদ ধ্বনি। সে ধ্বনি আমাদের হৃদয়কে নাড়া দিত। মিছিলের দৃশ্য খুব ভালো লাগতো। দেখতাম, সারিবদ্ধভাবে তারা মিছিল করে চলছেন, এক ব্যক্তির বুলন্দ আওয়াজ শেষ হতে না হতেই হাজার কণ্ঠে একই আওয়াজ উঠছে। সেই ধ্বনি আমাদের কচি বয়সের স্পর্শকাতর মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতো। তাদের ঐক্য দেখে অভিভূত হতাম। হাজার ঘরের হাজারজন একজায়গায় একত্রিত হয়ে একই ব্যক্তির নেতৃত্বে এক সারি হয়ে পথ চলে। একই লক্ষ্যে একই উদ্দেশে একই আওয়াজ তোলে। 'দেশ সেবার' এ অভিযানকে ভালবেসে ফেললাম। সব স্রোতধারায়ই স্বচ্ছ সলিল প্রবাহিত হচ্ছে বলে মনে করতাম। নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতাম যে, তারা তো দেশের জন্যই এত ত্যাগ স্বীকার করছেন। শুধু সরকারই তাদের দেশ সেবার সুযোগ দিচ্ছেন না, নতুবা তারা দেশের চেহারা পাল্টিয়ে দিতেন। ভাবতাম, কি বোকা এই সরকার! দল বেঁধে হাজারে হাজার লোক দেশের সেবা করার জন্য মিছিল করছে, দাবী জানাচ্ছে, অথচ সরকার তাদের দেশ সেবার সুযোগ দিচ্ছে না। এমন আহাম্মকি কি কেউ কখনো করে? মনটা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো। তারপর দেখতাম, আমাদের মুরব্বী বয়সীরা মিছিল করে বাস-ট্রাক-ট্যাক্সী ভেংগে চুরমার করে দিচ্ছেন, অগ্নিসংযোগ করছেন, ইট-পাথর নিক্ষেপ করছেন, সরকারী অফিস ভাংছেন, দোকানপাট লুট করছেন, যাকে দুশমন মনে করছেন তার বাসা আক্রমণ করে তাকে মারধর করছেন। এসব দেখে তাদের 'দেশ সেবার' শ্লোগানের উপর কেমন যেন সন্দেহ সৃষ্টি হতো। দেশ সেবকদের দেশ সেবার কর্মসূচীতে থাকতো লাশ নিয়ে মিছিল। সে লাশ তাদের দলভুক্ত কর্মীর হোক অথবা পথের কোন অচেনা-অজানা ব্যক্তিরই হোক। দেখতাম, লাশ নিয়ে তাদের জঙ্গী মিছিল। সুন্দরভাবে সমঝোতা করে দুটি দলকে দুটি লাশ নিয়ে দুটি পৃথক রাস্তায় বের হতেও দেখেছি। কোন কোন রাজনৈতিক দল দেশবাসীর দুর্বল অনুভূতিকে লাশের ধাক্কায় উজ্জীবিত করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে, তাও আমরা দেখেছি। এমনও দেখেছি যে, লাশ পাওয়ার জন্য কৃত্রিম উপায়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হতো, পুলিশের গুলী করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো। তাতেও যদি কোন কাজ না হতো, তাহলে হাসপাতালের মর্গ থেকে লাশ কেনার

www.nagorikpathagar.org

চেষ্টা করা হতো বলেও আমরা শুনেছি। লাশ সামনে নিয়ে দেশবাসীকে একথা বুঝানো হতো যে, হে দেশবাসী, দেখ, তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা প্রাণ পর্যন্ত দিচ্ছি।

– এসব দৃশ্য দেখে মনে কি কোন প্রশ্ন সৃষ্টি হতো? এ জিজ্ঞাসা ছিল আমার।

– অবশ্যই এসব দৃশ্য আমাদের মনে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি করতো। কখনো কখনো এ নিয়ে আমাদের মধ্যে বিতর্ক চলতো। অভিভাবকদের কাছে 'দেশ সেবার' এই বৈপরীত্যের মর্ম বুঝার জন্য জিজ্ঞাসা করতাম, কিন্তু তারা জবাব তো দিতেনই না, উপরন্তু ধমক দিয়ে বলতেন, এসব জেনে তোমাদের কি লাভ? খবরদার! এসব জানবার চেষ্টা করো না, মন দিয়ে লেখাপড়া কর। গুরুজনদের এসব ধমক আর উপদেশ মনের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। কারণ, রাজপথের মিছিলের গগনবিদারী আওয়াজের প্রচন্ডতার কাছে গুরুজনদের হালকা ধমক হাওয়া হয়ে যেত।

– তারপর?

– তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, রাজনীতির মাতাল হাওয়া যেন আমাদের মাতিয়ে তুলতে চাচ্ছে, কিন্তু তখনও মত্ত হয়ে পড়িনি। অভিভাবকদের কঠোর শাসনের অধীনে থেকে মনের নানা প্রশ্নকে চাপা দিয়ে এসএসসি পাস করি। এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে মনে হল, রাজনীতিটা যেন কিছু বুঝি। এই বোধটুকু যে পরে কাল হয়ে দাঁড়াবে, তা আগে বুঝতে পারিনি। অভিভাবকরা তখন আমাদের উপর থেকে শাসনের চাপ কিছুটা হালকা করে নিলেন। এসএসসি পাসের পর আমাদের গর্দান থেকে অভিভাবকরা শাসনের রজ্জু তুলে নিলেন। স্কুলের সংকীর্ণ অংগন থেকে বের হয়ে কলেজের প্রশস্ত অংগনে পা রেখে মনে হলো, আমরা যেন মুক্ত। দাড়ি-গোঁফও গজিয়েছে, চেহারায় পৌরুষের ছাপ পড়েছে। কিশোর বয়সের সীমানাও অতিক্রম করেছি, যৌবনে পা দিয়েছি। হাতের মাসলের দিকে তাকিয়ে দেখি, তা বেশ পরিপুষ্ট। তাছাড়া একটা পাসের সার্টিফিকেট তো এরই মধ্যে পাওয়া হয়ে গেছে। মা-বাবা ও অভিভাবকদের শাসনও বেশ শিথিল হয়ে পড়েছে। কারণ, এতদিনে 'লায়েক' হয়ে গেছি। তাই তাদের দুর্ভাবনাও কমে গেছে। মা-বাবা জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই যেকোন বায়না মিটিয়ে দেন। কলেজের শিক্ষকগণও হাতে বেত নিয়ে স্কুল শিক্ষকদের মত ছাত্র নিয়ন্ত্রণ করেন না। প্রশাসনিক বাঁধন-বন্ধন শিথিল। কলেজ শিক্ষকরাও আমাদের জীবন গঠনের ব্যাপারে কোন কথা বলেন্ না। তারা হয়তো ভাবেন, আমরা বেশ

www.nagorikpathagar.org

বুঝদার হয়ে গেছি, নিজেদের ভাল-মন্দ বেশ বুঝি। তাঁরা ক্লাসে এসে 'লেকচার' দিয়ে যান, আমরা শুনি, ব্যস্ এ পর্যন্তই। লেকচার শুনা আমাদের দায়িত্ব আর লেকচার দেয়া শিক্ষকদের দায়িত্ব। এ দায়িত্বের বাইরে আর কোন কিছু করার বা শুনার মত আছে, তা তাঁরাও বলতেন না আর আমরাও ভাবতাম না।

আমাদের সিনিয়র ছাত্রদের মধ্যে যারা রাজনীতির খাতায় নাম লিখিয়ে চুটিয়ে রাজনীতি করতেন, তারা মনে করতেন, আমরা মাটি, কুমার হয়ে কাছে এসে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন তাদের শখের বাসন তৈরীর জন্য। তারা আমাদের কাছে ভিড়তেন, নবীনদের অনুষ্ঠান করে বরণ করতেন। দেশ ও জাতির দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে দেশোদ্ধারের জন্য আমাদের আহবান করতেন। জাতির দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য আমরা তাদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেন সংগ্রাম করি, সে দিকেও আমাদের সহযোগিতা কামনা করতেন। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হতো, দেশ ও জাতির সুসন্তান তারা। জাতির জন্য যারা এমন ত্যাগ স্বীকার করছে, তাদের সমর্থন করাকে মনে করতাম অন্তত আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। প্রশ্ন করতাম, দেশ ও জাতির সেবায় যদি এখনই লেগে যাই, তাহলে লেখাপড়ার কি হবে? সিনিয়ররা বলতেন, দুটো এক সংগে চলতে পারে। আবার প্রশ্ন করতাম, সেটা কিভাবে সম্ভব? জবাব আসতো, এই অসম্ভবের চ্যালেঞ্জ তরুণদের মোকাবেলা করতে হবে। তর্কে সিনিয়রদের সংগে পেরে উঠতে পারতাম না। অলক্ষ্যে প্রভাবিত হয়ে পড়তাম। 'দেশ সেবার' জন্য সিনিয়রদের দেশ সেবার ব্যাংক খাতায় একদিন আবেগে আপ্লুত হয়ে সই করে ফেললাম। আমরা লাইনে এসে গেলাম। অর্থাৎ, তাদের জালে আটকা পড়ে গেলাম। আমাদের মতো অনেকেই সম্মোহনী টোপ গিলে আটকা পড়লেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক ইন্সটিটিউশনে আমরা প্রশিক্ষণ পেতে লাগলাম। যার ফলে ক্লাসেও আমরা রাজনৈতিক ইলিম-তালিম পেয়ে সে অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়লাম। কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি শেষ পর্যন্ত লাঠালাঠি আপোষে চলতে থাকলো, যেভাবে মুরুব্বীরা ময়দানে করে থাকেন।

আমার তিনজন সহপাঠী কিভাবে একটি রাজনৈতিক দলে গিয়ে মস্তান হয়ে, সে কাহিনীও শুনুন। এক শিকারী তাদের নিয়ে গেলেন একটি রাজনৈতিক দলের লাঠিয়াল প্রধানের আস্তানায়। জামাই আদরে তাদের বরণ করা হলো। দলের উদ্দেশ্য-আদর্শ ঐ লাঠিয়াল প্রধান তাদের সামনে তুলে ধরলেন। তারা নাকি গোটা বিশ্বের গরীবী হটাবার ফর্মুলা নিয়ে কাজ করছেন। তাদের এভাবে বুঝানো হলো, আপনারা নবীন, নওজোয়ান, আপনারা যদি এগিয়ে না আসেন, তাহলে

www.nagorikpathagar.org

এই দুর্ভাগা দেশের হবেটা কি? আমাদের দল সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আপনারা এগিয়ে আসুন। আপনাদের মত যুবকরাই হবে দলের মূলশক্তি। দলের নিরাপত্তা আপনাদের উপরই নির্ভরশীল। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী থাকে। তারা যেকোন বহিরাক্রমণ থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করে, প্রয়োজনবোধে বিপক্ষ দলকে হামলা করে দুর্বল করে তোলে। আপনারা হবেন দলের সেই নিরাপত্তা বাহিনী। আপনাদের দায়িত্ব হবে প্রতিরক্ষার আর প্রতি আক্রমণের। আপনাদের যাবতীয় আর্থিক ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব আমাদের, অর্থাৎ, দলের।

এসব কথাবার্তা শুনে তারা বেশ প্রভাবিত হয়ে, কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। সাক্ষাতকারের পর বিদায়ক্ষণে তিন জন পেল তিনটি এনভেলাপ উপহার, যার মধ্যে ছিল তাদের ভবিষ্যৎ বিক্রির মোটা অঙ্কের আগাম বায়না। এক সংগে এত টাকা? জীবন শুরু করতে না করতেই এত অর্জন? তারা নিজেদের যোগ্যতার উপর নতুন করে বাণিজ্যিক হিসাবের ভিত্তিতে মুনাফালাভে প্রত্যয়ী হলো। তারা ভাবেনি যে, জীবনটা তারা সাফ কবালা করে দিচ্ছে। একটা গর্ব, একটা অহংকার তাদের দেহ-মনকে নাড়া দিয়ে গেল। তারা প্রকাশ্যভাবে বলতো, আমাদের যেকোন আপদে-বিপদে দল আমাদের পিছনে রয়েছে এবং দলের যেকোন সংকটে আমরাও দলের পিছনে রয়েছি, এই সহযোগিতামূলক নীতি কি খারাপ? তাদের চাল-চলনের গতি বেপরোয়া হয়ে উঠলো, চোখের চাহনিতে যে লাভা ছিল, তাতে রুক্ষতার প্রলেপ পড়লো, কণ্ঠে ঝাঁঝালো আমেজের সঞ্চার হলো। সাধারণ বুলি-বচনেও নতুন নতুন শব্দ এসে যোগ হলো। যেমন হালায়, ডোন্ট কেয়ার, সাইজ করে ফেলুম, হাওয়া করে দিমু, কাইট্যা ছিল্লা লবণ লাগাইয়া দিমু ইত্যাদি।

– প্রত্যেকে তো এভাবে জালে আটকা পড়ে না।

– তা স্বীকার করি, এজন্যই তো শিকারের কারেন্ট জাল ভিন্ন ভিন্ন। কয়েকজন সহপাঠীকে লক্ষ্য করলাম, তারা আমাদের এড়িয়ে চলছে। আমরাও তাদের কূপমন্ডূক ও সংকীর্ণমনা ভেবে এড়িয়ে চলতাম। ক্লাসে বসে আমরা শিক্ষকদের শিক্ষাদান মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করতে পারতাম না। পড়ার চিন্তার চেয়ে কলেজে দল গঠনের আর দল ভারী করার চিন্তাই বেশী করতাম। বাসায় গিয়েও পড়াশুনায় মন বসাতে পারতাম না। নিজেদের আরও দাম বাড়াবার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির আঁটতাম। মহল্লার বেকার ছেলেদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করতাম এবং তারা সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়তো। লোকাল

www.nagorikpathagar.org

লাঠিয়াল হিসাবে তাদের গড়ে তুলতাম। আমাদের মা–বাবারা কিছুই বলতেন না, কিন্তু যেসব সহপাঠীর মা–বাবারা সন্তানদের রুটিন বহির্ভূত চলাফেরা পছন্দ করতেন না, তারা সন্তানদের আগলিয়ে রাখতেন। এই আগলিয়ে রাখা সন্তানেরা আমাদের লাইনে আসতে পারেনি, তারা আজ সুখ্যাতি নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আমরা তখন তাদের টিটকারি করতাম। কাপুরুষ, ভেড়া, বকরী ইত্যাদি বলে গালি দিতাম, উপহাস করতাম। তারা আজ মানুষ আর আমরা মানুষের আকৃতিসম্পন্ন হয়েও মস্তান।

– বড় অসময়ে এই উপলব্ধি আসলো, কিন্তু তবুও লাইনে আসছেন না। যাহোক, তারপর কিভাবে এগিয়ে গেলেন সে কাহিনী বলুন।

– নিজ নিজ দলের এবং ব্যক্তিগত প্রোগ্রাম পালন করেই দিন আমাদের কাটতে থাকে। বিভিন্ন দুঃসাহসিক প্রোগ্রামে আমাদের ডাক পড়ে। ডাক পড়লে সাড়া দেই, কাজ করি, সম্মানী পাই, দিন কাটে। হঠাৎ একদিন শুনি, অমুক তারিখে এইচএসসি ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। চোখে দেখলাম অন্ধকার। দু'বছর পড়াশুনা করিনি। পাথেয় সঞ্চয় হয়নি, বৈতরণী পার হবো কি দিয়ে? পরীক্ষা নিয়ে বন্ধুদের সংগে আলোচনায় বসলাম। পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেয়ার সপক্ষে যুক্তি তালাশ করে সংবাদপত্রে চিঠি প্রকাশের ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু কোন কাজ হলো না। অবিপ্লবী ছাত্ররা এ ব্যাপারে কোন ভূমিকাই রাখলো না। লক্ষ্য করলাম, তারা তলে তলে পড়ার বেগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক পরীক্ষা পাস করতে হবে। তাই নকলের পথঘাট পথঘাট আবিষ্কারে লেগে গেলাম। বাইরে থেকে অবাধ সাপ্লাই দেয়ার ব্যবস্থাও করলাম। আমাদের কেউ কেউ অন্যদের দিয়ে প্রক্সি পরীক্ষারও ব্যবস্থা করলেন। পরীক্ষার দিনগুলো সে ব্যবস্থাধীনেই সম্পন্ন হলো, কিন্তু ফলাফল বের হওয়ার দিন দেখা গেল, আমাদের অনেকেই অকৃতকার্য। যারা হলো অকৃতকার্য তাদের সকলেই কলেজ ত্যাগ করলো। যারা কোন ভাবে পাস করলো, তারা আগে বাড়তে লাগলো। আমরাও সে দলে ছিলাম। এই আগে বাড়নেওয়ালাদের কেউ কেউ ডিগ্রী ফাইনালে ফাইনালী স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। পরীক্ষার কঠিন ও কঠোর কঙ্কর পথ ত্যাগ করে প্রায় সকলেই নিজ নিজ মহল্লা জয় করার জন্য মহল্লার সমবয়সী কম পড়ুয়া এবং না পড়ুয়াদের নিয়ে মহল্লা বাহিনী গঠন করে সর্দারী করতে শুরু করলেন। আমরাও তাই করলাম। মূল সংগঠনের বিপ্লবী মুরব্বীরা অভয়বাণী শুনালেন, এগিয়ে চল, মহল্লা জয় কর। সেই জয়ের সংগ্রামের অপারেশন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুললাম ক্লাব। এই ক্লাবকে কেন্দ্র করে আজও

www.nagorikpathagar.org

আমরা টিকে আছি এবং আগের চেয়ে বেশী সংঘবদ্ধ হয়েছি। আমাদের এই বিড়ম্বনার জন্য কি এক শ্রেণীর শিকারী রাজনীতিবিদ দায়ী নয়?

– আপনার মন্তব্য সঠিক, তারপর?

– তারপর এইচএসসি পাস করার পর রাজনীতি করার প্রশস্ত অংগন বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা বেছে নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মস্তানদের দাম খুব বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যারা মস্তান হয়, তারা ছয় শ্রেণীর মুরব্বীর প্রভাবে মস্তান হয়। (১) রাজনীতিবিদ, (২) রাজনীতিবিদদের সাব কন্ট্রাক্টর অর্থাৎ, জঙ্গী ছাত্র নেতা, (৩) একশ্রেণীর শিক্ষক, (৪) সরকার, (৫) একশ্রেণীর সংবাদপত্র ও সাংবাদিক, (৬) বুদ্ধি বিক্রিজীবী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যারা এলাম, তারা কাঁচামাল হিসাবে যেন আমদানী হলাম। কে কাকে নেবেন, তা নিয়ে শুরু হলো কাড়াকাড়ি। রাজনীতিবিদরা তাদের ছাত্র সাব–কন্ট্রাক্টরদের দিয়ে আমাদের ধরার জন্য বিভিন্ন ফাঁদ পাতলেন। একশ্রেণীর শিক্ষক নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়লেন। সরকারও যেহেতু রাজনীতি করেন, তাই তারাও তাদের সাব–কন্ট্রাক্টর ছাত্র নেতাদের দিয়ে ছাত্র ধরার বিরাট জাল ফেললেন। ফেললেন প্রলোভনের নানা টোপ। একশ্রেণীর সংবাদপত্র আর সাংবাদিকও বিশেষ ভূমিকায় নেমে আমাদের 'শিকার হওয়া উচিত' বলে উৎসাহিত করতে লাগলেন, আর বুদ্ধি বিক্রিজীবীরা মস্তানদের কার্যক্রমকে বিবৃতি দিয়ে সমর্থন যোগাতে থাকেন। আমরা মনে করেছিলাম, এইচএসসি যখন কোনভাবে পাস করেছি, বহু কষ্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও হয়েছি, তখন কোন দিকে নজর না দিয়ে লেখাপড়া করে আগে মানুষ হই। তারপর রাজনীতি করার প্রয়োজনবোধ কখনো করলে তাই করবো, কিন্তু পারলাম না। কম্বল ছাড়তে চাইলেও কম্বল আমাদের ছাড়েনি। অনেকের অবস্থা আমাদের মতই ছিল। নিজ নিজ রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদ এবং রাজনীতিপ্রিয় সরকারও চাননি আমরা রাজনীতিমুক্ত হয়ে লেখাপড়া করি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বড় বড় জঙ্গী লাঠিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়েই স্থায়ীভাবে থাকেন। এই লাঠিয়ালের খাতায় নাম লেখাতে পারলে আর কোন অভাব থাকে না, বাবা–মার থেকে অর্থ আনার প্রয়োজন পড়ে না, বরং মা–বাবাকে চুক্তির বা মাসোহারারা টাকা দিয়ে উজালা করা যায়। হাতেনাতে এসবের আরও প্রমাণ পেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে। কলেজ জীবনে যারা রাজনীতির লাঠিয়ালের খাতায় নাম লিখিয়েছিল, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সেই লাইসেন্সটা শুধু রিনিউ করলো। প্রশস্ত ক্ষেত্র। দুদিকেই উচ্চ শিক্ষালাভের প্রশস্ত অংগন। তাই ভাবনার এক পর্যায়ে আনন্দঘন শিহরণ

www.nagorikpathagar.org

অনুভব করলাম। এই শিহরণ-অনুভূতি অহংকারে হলো পর্যবসিত, সে অহংকারও ছিল ভয়ঙ্কর। ধাবমান লাগামহীন লাল পাগলা ঘোড়ায় আমরাও সওয়ার। নেপথ্যের সাব-কন্ট্রাক্টর কোন কোন স্যার উৎসাহ দিয়ে বলতেন, মাস্টার ডিগ্রী নিয়ে যা করবে, তার বাস্তব অনুশীলন ছাত্র জীবনেই শুরু করা উচিত। পথঘাট এখনই চিনতে হবে, জানতে হবে। দেশবাসীকে কর্মক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া আয়ত্ত করার প্রাকটিস শুরু করতে হবে। নিজেরা শুধু বিপ্লবী হলে চলবে না, জনগণকেও বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে। ছাত্র জীবনেই জেল-জুলুম বরণ করার রিহার্সেল শুরু করতে হবে। তাতে পাঁচটি ফায়দা পাওয়া যাবে। (১) নেতা হওয়ার ট্রেনিং হয়ে যাবে। (২) দেশবাসীর সহানুভূতি লাভ করা যাবে। (৩) জেল-জুলুমের ভয়-ভীতি কেটে যাবে। (৪) প্রতিপক্ষের খাতায় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নাম রেকর্ড হয়ে যাবে। (৫) আয়ের পথ চেনাজানা হবে। কোন কোন স্যার আমাদের লাজ-লজ্জা দূর করার জন্য চুম্বনের উপর ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত জরিপ করতেন, বিয়ের আগে যৌনমিলন আমাদের কেমন লাগে, তা জানতে চাইতেন, জোড়ায় জোড়ায় গাছতলায় গল্প-গুজব করে হাওয়া খেতে উৎসাহ দিতেন। এসব ভাল লাগতো, সবই মেনে নিতে হত। কারণ, গুরুজনের উপদেশ তো শিরোধার্য। এই শ্রেণীর শিক্ষক আমাদের গোপন পথের সন্ধান দিতেন। তাদের পছন্দনীয় ঠিকানা বলে দিতেন। কলেজ জীবনে যে দলে যিনি দীক্ষা নিয়েছেন, শিক্ষকের উপদেশে সে দলের নাম উচ্চারিত হলে মনটা আনন্দে ভরে উঠতো। আমাদের অধিকাংশ স্যার মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষ থাকলেও কিছু স্যারকে নিজ নিজ মতবাদ প্রচারে বেশ সক্রিয় দেখতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও তাঁরা বেশ পরিচিত। সাধারণ লোকও তাদের চিনে, রেডিওতে তাদের কণ্ঠ শুনে আর টেলিভিশনে তাদের চেহারা দেখে ও কথা শুনে। এই স্যারদেরই কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাঠিয়াল রিক্রুটের ভূমিকা পরোক্ষভাবে পালন করে থাকেন। তাঁরা তাত্ত্বিক গুরু হয়ে গুরুগিরী করেন। তাদের নেক নজরে থাকলে নম্বরও ভাল পাওয়া যায়। 'ক্লাস' দেওয়াতো তো তাঁদেরই হাতে।

– বিশ্ববিদ্যালয়ে কি নিরপেক্ষ থাকা যায় না?

– না, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রই নিরপেক্ষ থাকার সুযোগ নেই। পক্ষ নিতে হয় নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয়ভাবে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ব্যাপারে বাইরে স্থির একটা ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আমাদের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলার সাহস করেন না। আমাদের কাজ ভাল বা মন্দই হোক, সকলকে মেনে নিতে হয় । দেশের প্রশাসনও নীরব

www.nagorikpathagar.org

থাকে। প্রশাসন প্রধানরাও বলে থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয় বড়ই সেনসিটিভ প্লেস। আমাদের কোন কুকর্মের বিরুদ্ধে পুলিশী হস্তক্ষেপ শুরু হলে গোটা দেশে আগুন জ্বলে উঠে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের পক্ষে ধর্মঘটে নামে। মিছিল বের হয়, পোস্টারে আর দেয়াল লেখায় শহর-বন্দর ছেয়ে যায়। রাজনৈতিক দলও প্রতিযোগিতা করে আমাদের পক্ষে বক্তব্য রাখতে শুরু করে। ৫/৭টা খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েও আমরা বেকসুর খালাস পেয়ে রাজনৈতিক ভিল্যান হতে পারি। অনেকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোন কোন রিক্সাওয়ালা আসতে চায় না। ভাড়া না দিয়ে নাকি কোন কোন ছাত্র হলে ঢুকে পড়ে। ভাড়া চাইতে গেলে নাকি উল্টা ধমক লাগায় বা প্রহারও করে। অভিযোগ এমনও শুনা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে চলতে গেলে কারও কারও গা-গতর নাকি ছমছম করে। এসব অভিযোগ মিথ্যা নয়। আমরাই এসব করি। এজন্য সকল ছাত্রকে দায়ী করা উচিত নয়। প্রতি একহাজার ছাত্রের মধ্যে আমাদের সংখ্যা হবে মাত্র দশ অথবা পনর। কিন্তু সব দিক থেকে সব ধরনের সহযোগিতা পেয়ে আমরা হয়েছি দুঃসাহসী ও দুর্বার। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই আমাদের সংখ্যা বড়জোর দুইশত হবে। তাও আমরা নানা দলে বিভক্ত। কিন্তু আমাদের ভয়ে থাকে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত। আমরা নিয়ন্ত্রণ করে থাকি সকলকে। কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে না, কেউ আমাদের কাজকর্মের প্রতিবাদ করে না, আমাদের খেয়ালের পথে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সাহস করে না, আমরা ডাক দিলে সকলে আসে, আমাদের নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সকলে মেনে নেয়।

কে কোথায় কিভাবে 'স্বাধীনতার সুফল' ভোগ করছে জানি না, তবে আমরা মনের মত স্বাধীনতার সুফল বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ অংগনে ভোগ করছি। আমরা সংখ্যায় অল্প; কিন্তু একাই যেন একশ। যেমন খুশী তেমন চলতে পারি, যাকে খুশী তাকে হাসাতে পারি, কাঁদাতে পারি। ছাত্রের নামে বরাদ্দ সীটে অছাত্র আমদানী করে সহযোগীদের সংখ্যা আমরাই বৃদ্ধি করে থাকি। আমাদের এসব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব জানেন। জোর করে সীট দখলের বহু অভিযোগও তাদের কাছে জমা হয়ে আছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের চটাতে চান না বলেই সেসব অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিকার করতে সাহস করেন না। তাই সীট বরাদ্দের অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের থাকলেও সীটের পজেশন দেয়ার নিরঙ্কুশ অধিকার আমাদের। অর্থাৎ, হাজারে এই দশ জনের। তবে আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে গেলে সংবাদ পত্রে 'বহিরাগতদের' কথা ছাপা হয়, আমাদের ব্যাপার চাপা

www.nagorikpathagar.org

দেয়া হয়। সংবাদপত্রওয়ালারাও আমাদের ব্যাপারে কিছু লেখালেখি করার আগে বার বার মাথা ঘামাতে হয়। এই বহিরাগতরা আমাদেরই দলের মানুষ, তারা হলেই বাস করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের উপর থেকে বদনাম হটাবার জন্য আমাদের প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিবৃতি ঝাড়েন, সরকারও এগিয়ে আসেন। হল ছাড়তে আদেশ করেন। আমরাও সকলের সংগে হল ছেড়ে চলে যাই। কিছুদিন অন্যত্র থাকি। আবার যখন বিশ্ববিদ্যালয় খোলে, তখন আমরা আবার দলবলসহ স্ব-স্ব সীটে গা এলিয়ে ঘুমাই।

অভিযোগ করা হয়, বছরে বহু রাত এমনও যায় যে, হলগুলোতে ছাত্রদের পড়াশুনার আওয়াজ বা কলমের খস খস শব্দ শুনার পরিবর্তে শুনা যায় অস্ত্রের ঝনঝনানি। অর্থাৎ, বোমা আর গুলীর আওয়াজ। এ অভিযোগও সত্য। এ আওয়াজ তো নিয়ন্ত্রণ করে রাখা সম্ভব নয় এবং নিয়ন্ত্রণের নিয়তও আমাদের থাকে না। এমন হয়ে থাকে অনিবার্য কারণে। বিভিন্ন হলে বিভিন্ন কক্ষে থাকি আমরা। আমাদের যারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ঠিকানায় থাকে, তাদেরও দ্বিতীয় ঠিকানা এই হলগুলো। আমাদের সকলে কিন্তু এক দলের লোক নই, বিভিন্ন দলে বিভক্ত। সে কথা আগেই বলেছি। সুতরাং একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে আধিপত্যের প্রতিযোগিতায় অবর্তীণ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। আমাদের মুরব্বীরা এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ময়দানে আমাদের প্রিন্সিপাল দলগুলোর মধ্যে যেভাবে কলহ শুরু হয়, আমরাও নিজ নিজ মুরব্বীদলের অনুকরণে হলে হলে প্রতিপক্ষের সমর্থক ছাত্র গ্রুপের উপর প্রতিশোধ নেয়ার অনুশীলন শুরু করি। আমরা এসব না করে পারি না। কারণ, যাদের নিমক খাই, তাদের হয়ে কিছু করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, না করলে তারা বলবে কি? আমাদের প্রিন্সিপাল দলগুলো ময়দানে যতদিন সংঘাত-সংঘর্ষ ছাড়া চলে, আমরাও হলগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর সংগে সংঘাত-সংঘর্ষে যাই না। উৎস থেকে যা নির্গত হবে, শাখা-প্রশাখায় তাই তো প্রবাহিত হবে। মূল সংগঠনের সিলেবাস অনুযায়ী আমাদের অবশ্য চলতে হয়। সেই সিলেবাসে পরীক্ষা দিতে গিয়ে হুকুম অনুযায়ী মাথা ফাটাফাটি করতে হয়, লুটপাট এমনকি খুনাখুনিও করতে হয়। মূল সংগঠনের ইশারা ছাড়া আমরা এককদমও আগ-পিছ হই না, হতে পারি না। কারণ, ভয় থাকে যে, সংগঠনটি যদি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে আমাদের কি গতি হবে? এভয়ে মূল সংগঠনের একান্ত অনুগত থাকি। মিছিল আক্রমণ করা, গ্রেনেড চার্জ করা, বোমাবাজি করা, ইট-পাথর নিক্ষেপ করা, বাস-ট্রাক ট্যাক্সিতে অগ্নিসংযোগ

www.nagorikpathagar.org

করা, সভা ভাংগা, সভা আক্রমণ করা, দোকানপাট লুট করা ইত্যাদি সবকিছুই আমরা মূল সংগঠনের কোন না কোন কর্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশে করে থাকি। ময়দানে এসব কাজ করার সময় চেনা-অচেনা আমাদের অনেক সাথী জুটে যায়। গ্রেফতার হলে তো কথাই নেই, দলীয় আনুগত্যের সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম, নেতা হয়ে গেলাম, প্রমোশন নিশ্চিত হয়ে গেল। এদিকে দলীয় মুরব্বীদের প্রতিবাদ পত্রিকায় আসতে থাকে, নিঃশর্ত মুক্তির দাবী ছাপা হতে থাকে। আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন, আমাদের ভূমিকাটা আসলে কোথায়, আমরা তো সুতায় টানা পুতুল, তবে সুতার প্রান্ত যাদের হাতে থাকে, তারা যেমন চায়, তেমন নাচায়; কিন্তু গাল-মন্দ শুনি আমরা।

– আপনারা এত অস্ত্র কোথায় পান?

– আমরা সাধারণ ব্যাপারেও অস্ত্র ব্যবহার করি, এত অস্ত্র কোথায় পাই, এ প্রশ্ন অনেকে করে থাকেন। এ উৎসের সন্ধান যারা জানেন না, তাদের অবগতির জন্য বলছি, অস্ত্র আমাদের সংগ্রহ করতে হয় না, অস্ত্র আমাদের কাছে সরবরাহ করা হয়। আমরা যাদের সিকিউরিটি ফোর্স হিসাবে কাজ করি, তারাই অস্ত্রশস্ত্র আমাদের সরবরাহ করে থাকেন। কারণ, তারা না দিলে আমরা পাবোই বা কোথায়? মুরব্বীরা কিন্তু নিজেদের কাছে অস্ত্র রাখেন না। অস্ত্র রাখা ও অস্ত্র চালনার দায়িত্ব আমাদের। কারণ, মুরব্বীরা তো সাধারণ মানুষের মাঝে বাস করেন, গোপন থাকবে না, কেউ না কেউ দেখে ফেলবে, বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়বে, প্রয়োজনে ব্যবহারও করা যাবে না, ধরা পড়লেও বদনাম। তাই তাদের অস্ত্র আমাদের হাতে তুলে দেয়া হয়। ভরসা তাদের এই যে, আমাদের হাতে অস্ত্র থাকলে কেউ কথা বলবে না, এমনকি অস্ত্র উদ্ধারে কেউ সাহসও করবে না, যদি উদ্ধার করাও হয়, তাহলে আবার সাপ্লাই পেতে বেশী বিলম্ব হবে না।

মুরব্বী সংগঠনগুলোর মধ্যে সরকারীদলই আমাদের অধিকতর কাম্য। যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসেন, সে সরকারেরই ছাত্র সংগঠন থাকে। আমরা অর্থাৎ, মস্তানেরা থাকি সে সংগঠনের পুরোভাগে। দু'একটি ছাত্র সংগঠন ছাড়া বাকী সব কটি দলই মস্তানদের পুরোভাগে রাখেন। তবে সরকারীদলে থাকে ভীড়-ভাড় বেশী । কারণ, খুঁটির জোর সে সংগঠনে বেশী আর কামাই রোজগারও উমদা। পুলিশের ভয় নেই, পূর্ব অপরাধ সব মাফ হয়ে যায়, যেদিকে হাত বাড়ানো যায় সেদিকে ফায়দা লুটা যায়। বিভিন্ন অফিসে তদবীরের কাজ করে অর্থ রোজগার করা যায়। সভা-সমিতিতে লোক সংগ্রহের ঠিকাদারী করেও দু'পয়সা আয় করা যায়। সুযোগ আর সুযোগ, টাকা আর টাকা, তাছাড়া সাত খুনও মাফ।

www.nagorikpathagar.org

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, বিরোধীদলের মস্তানেরা কিভাবে অস্ত্র পায়? তারা তো আর সরকারীদল করে না? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ। যেসব সরকারী নেতা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বা অন্য কোন কারণে বিরোধীদলে চলে যান, তারা সাথে করে ঐ অস্ত্রগুলো নিয়ে যান। সরকারীদল সেসব অস্ত্র ফেরত চায় না গোমর ফাঁসের ভয়ে। যেসব মস্তানের হাতে অস্ত্র, তাদের মূল সংগঠন তো একদিন ক্ষমতায় ছিলেন। বড় বড় দল তো সাবেক ক্ষমতাসীন। অস্ত্র সেসব সূত্রে ঐ সময়েই হস্তগত হয়। ছুরি-চাকু-হকিস্টিক, বোমা আর দা-কূড়াল তো বাজার সওদার মত সহজলভ্য। সার্বক্ষণিক কাজে তো এগুলোই লাগে। আমরা এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই মস্তানী করিব। মস্তানী করতে বাধ্য হই। কিন্তু আমাদের এই মস্তানী জিন্দেগীর নিমর্ম একটি সত্য আছে আর তা হচ্ছে, মুরব্বীরা যতদিন প্রয়োজন মনে করেন, ততদিন আমাদের ব্যবহার করেন; কিন্তু প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নির্মম হস্তে আমাদের ধ্বংসও করেন। ইমদু, গালকাটা কামাল এবং অন্যান্যদের দৃষ্টান্ত এই নির্মম সত্যের এক একটি প্রমাণ। মাথায় আমাদের যখন খুন চড়ে, তখন হলের ছাদে উঠে আকাশের দিকে গুলী ছুড়ে মেজাজ ঠান্ডা করি। আমরা যে আছি, সে কথা সকলকে জানিয়ে দেই।

– আপনার বক্তব্যের সার কথা হলো এইঃ-

- একশ্রেণীর মারদাঙ্গা রাজনীতিবিদ তাদের লাঠিয়াল তৈরী করার জন্য আপনাদের নগদ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে মস্তান বানিয়েছেন।
- এক শ্রেণীর শিক্ষক পরকীয়া মতবাদের দীক্ষার জালে জড়িয়ে আপনাদের মস্তান বানিয়েছেন।
- মা-বাবা তথা অভিভাবকদের উদাসীনতাও আপনাদের মস্তান হতে সাহায্য করেছে।
- সমাজের কর্তাব্যক্তিদের নির্লিপ্ততা আপনাদের মস্তান হতে উৎসাহিত করেছে।
- কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মূল সমস্যা পাশ কেটে চলার নীতি আপনাদের মস্তান বানিয়েছে।
- সব কথার সারকথা হচ্ছে, সকলে এক কারণে একভাবে মস্তান হয়নি, শিকারের জাল এক প্রকারের নয়, নানা প্রকারের। যারা যে জালে আটকা পড়েছেন, তারা সে জালে আটকা পড়ার কাহিনী জানেন। আপনারা রাজনীতির জালে আটকা পড়ে মস্তান হয়েছেন এবং আপনাদের মত যারা এই জালে আটকা পড়ে মস্তান হয়েছে, এই

www.nagorikpathagar.org

জবানবন্দী তাদেরও।

– হাঁ, ঠিকই বলেছেন। পোনা মাছ শিকার নিষিদ্ধ। রাজনীতির জাল দিয়ে আমাদের মত পোনাদের যদি শিকার করা না হতো, জাল থেকে ফেলে দেয়া হত, তাহলে আজ মস্তান হিসাবে জাতির কাছে আমরা ধিকৃত হতাম না। আপনারাই ঐ রাজনীতিবিদদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা আমাদের কেন জালে জড়িয়ে এমন করেছেন?

'রাজনীতি আমাকে মস্তান বানিয়েছে', এই শিরোনামে যার জবানবন্দী পেশ করলাম, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দ্বিতীয় জনও ছাত্র তবে বাইরে চাকুরী করেন; কিন্তু হলে থাকেন। তৃতীয় জনও ছাত্র। বহু বছর ধরে একটি হলে আছেন।

এই জবানবন্দী মাত্র একজনের, যিনি সাবেক মন্ত্রীর তনয়। অপর দুজন আলাদাভাবে কোন বক্তব্য পেশ করেননি। তবে দল–নেতাকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে এবং তার বক্তব্যের মাঝে মাঝে সংশোধনী এনে জবানবন্দীকে মজবুত ও শুদ্ধ করেছেন। তাদের কথা এখানে আলাদাভাবে পেশ করলাম না। সাবেক মন্ত্রী তনয়কে মনে হলো, এই জীবনধারার কোন পরিবর্তন চান না। অপর দুজন মস্তানী জীবন ত্যাগ করতে চান, কিন্তু মুক্তির পথ তারা দেখছেন না বলে অভিমত রাখেন।

বিদায় নেয়ার সময় আবার তিনজনই বললেন, যদি আমাদের কথা কখনো লিখেন, তাহলে নাম ঠিকানা উল্লেখ করবেন না।

ওয়াদা করে বিদায় নিলাম।

www.nagorikpathagar.org

ভিসিআর আমাকে মস্তান বানিয়েছে

[দুর্দম ও দুর্ধর্ষ আমার এ মস্তান। পুরান ঢাকার একটি এলাকার জন্য এ মস্তান ছিলেন রীতিমত এক ত্রাস। তাকে কেউ কেউ বলতেন চেঙ্গিজ খান, কেউ কেউ বলতেন নাদির শাহ্, আবার কেউ কেউ বলতেন হালাকু খান। তিনি সাধারণত অপারেশনে নামতেন না। তার কর্মীবাহিনী অপারেশনে ব্যস্ত থাকতো। এলাকার ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উপর নির্ধারিত চাঁদা বিনা তাগাদায় হেড কোয়ার্টারে জমা হতো। তিনি প্রায়ই হেড কোয়ার্টারে বসতেন। খুব রিস্কি এবং বড় ধরনের অপারেশনে তিনি শুধু নেতৃত্ব দিতেন। থানা-পুলিশ ম্যানেজ্‌ড ছিল। সংগৃহীত অর্থের এক-ভগ্নাংশও এদিক ওদিক হওয়ার কোন উপায় ছিল না।

কঠিন, কঠোর ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনা। কর্মীবাহিনীর মাসোহারাও নির্ধারিত ছিল। প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে আগের মাসের মাসোহারা প্রদান করা হতো। অবশ্য 'বিশেষ দক্ষতা পুরস্কার'ও ছিল। এ মস্তানের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর হাতে অনেকেই জানেমালে শেষ হয়েছেন। শুনা যায়, প্রাণও হারিয়েছেন অনেকে। তার ও তার দলের দিনকাল তবুও ভালই যাচ্ছিল, কিন্তু সংগৃহীত অর্থের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে একদিন বৈঠকে কথা উঠে। উত্তপ্ত বিতর্ক হয়, কিন্তু কোন ফয়সালায় পৌঁছা সম্ভব হয়নি।

কতিপয় সদস্য এ দল ছেড়ে ভিন্ন দল গঠন করেন। এলাকা এক হওয়ার ফলে দু'দলে প্রায়ই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে সংঘাত-সংঘর্ষ বাধতো। মূল নেতার একক আধিপত্যের মাঝে বিভক্তির রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। দল দুভাগ হলো। ভাগ হওয়ার পর নেতা ও কর্মীরা বিভিন্ন ঘটনায় কয়েকবার গ্রেফতারও হয়েছিলেন।

কিছুদিন পর একদিন প্রভাতী কাগজে দেখলাম মূল নেতার লাশের ছবি। তিনি এক জঘণ্য স্থানে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। তার নিহত হওয়ার সংবাদ পাঠ করে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কারণ, অতি কষ্টে আমি কিছুদিন আগে তার থেকে মস্তান হওয়ার কাহিনী শুনেছিলাম। আজ তিনি নেই। তার জবানবন্দী নেয়ার এক পর্যায়ে তিনি আমার এক জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছিলেন, তিনি সৎ ও সরল পথে শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করবেন। সে ওয়াদা তিনি রক্ষা করতে পারলেন না। আমি তাকে পেয়েছিলাম একবার, মাত্র এক ঘন্টার জন্য। তার সংগে কথাবার্তার সময় কখনো আমার মনে হয়নি যে, তিনি হিংস্র, দুর্দম ও দুর্ধর্ষ। দলের বিভক্তির পরই আমি তাকে পেয়েছিলাম। তখন তিনি খুবই টেনশনে ছিলেন, ভবিষ্যতের ব্যাপারে ছিলেন সন্দিহান। পুলিশের তাড়াও ছিল বাড়তি

www.nagorikpathagar.org

জ্বালাতন। কিভাবে তার সংগে আমার সাক্ষ্য ঘটলো, শুনুন সে কাহিনী।]

এ মস্তানের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি একটি দৈনিকের ক্রাইম রিপোর্টারের শরণাপন্ন হই। তিনি আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, এ মস্তানের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের লাইন করে দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বরং ঐ মস্তানের ছাত্র সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্যের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। এ সদস্য আপনাকে হয়তো সাহায্য করতে পারবে। কারণ, সে আমার নিকট আত্মীয়। রিপোর্টার অবশ্য এ আশ্বাস দিলেন, যখনই এ ছাত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটবে, তখনি আমাকে টেলিফোন করবেন।

এ আলাপ শেষে আমি তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। ১৫/১৬ দিন কেটে গেল, এ রিপোর্টার থেকে কোন খবর পাই না। টেলিফোন করলে বলেন, ছাত্রটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। এভাবে আরও কয়েকদিন কাটল। একদিন বেলা প্রায় একটার সময় আমার অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন এক যুবক। আমি তাঁকে সামনের চেয়ারটিতে বসতে অনুরোধ করলাম। আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ঐ ক্রাইম রিপোর্টারের রেফারেন্স দিলেন। নিজের নাম বললেন। ইনি যে তিনি, এ ব্যাপারে আমি তখন নিশ্চিত হলাম। সাথে সাথে রিপোর্টার বন্ধুকে টেলিফোন করলাম, কিন্তু তাঁকে অফিসে পেলাম না। যাহোক, অফিসের অভ্যর্থনা কক্ষে তাঁকে নিয়ে গেলাম। সাধ্যমত চা-নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করে আমার মূল ইচ্ছা তাঁর কাছে প্রকাশ করলাম। আমি তাঁকে বললাম, অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই লিখেন, আমি বিভিন্ন ছাত্র নেতার (মস্তান শব্দটি উচ্চারণ করলাম না) বিপ্লবী জীবনকে ভিত্তি করে একটা বই লিখতে চাই। আমার এ বইতে কারও কোন নাম-ঠিকানা থাকবে না, শুধু জবানবন্দীটা থাকবে। যদি আপনি মেহেরবানী করে আপনার নেতার সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারেন, তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। আমার এ কথা শুনে আগন্তুক যুবকটি বললেন, নেতা খুব ব্যস্ত। দলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কোন্দলও শুরু হয়েছে, তবুও আমি চেষ্টা করে দেখব। যদি আমি সফল হই, তাহলে আপনাকে খবর দেব। আর যদি ব্যর্থ হই, তাহলে ক্ষমা করবেন।

আমি তাঁর কথায় সম্মতি প্রকাশ করলাম। তবুও বললাম, বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন কিন্তু। তিনি আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, চেষ্টার কোন ত্রুটি করবেন না। তারপর আরও ৫/৭ মিনিট গল্প-গুজব করে তাঁকে বিদায় দিলাম।

www.nagorikpathagar.org

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়ার জন্য একটা রিক্সা ভাড়া করে তাঁর হাতে ৫০ টাকা গুঁজে দিলাম। তিনি তো এটাকা নেবেনই না, তারপর যখন বললাম, আপনি ছাত্র মানুষ, টাকাতো রোজগার করেন না। ধরুন, আপনি আমার ছোট ভাই। বড় ভাই কি টাকা দিলে নিতে হয় না? একথা বলার পর তিনি আর আপত্তি করলেন না। চলে গেলেন। এ যুবকটির অরিজিন ভাল, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার তাই মনে হলো। কিন্তু পরিবেশ যে তাঁকে এমন বানিয়েছে, তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

তারপর চলে গেল আরও ৬/৭ দিন। কোন খবরাখবর পেলাম না। হঠাৎ একদিন বায়তুল মুকাররমের পশ্চিম ফুটপাতের একটি ফলের দোকানের সামনে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়ে গেল। কুশল বিনিময়ের পর তিনিই বললেন, আপনার ব্যাপারটা কিছুটা লাইনে এসেছে, তবে সফল হইনি। সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এর ঠিক তিন দিন পর যুবকটি আমার অফিসে এসে খবর দিলেন, আজই আপনাকে সময় দেয়া হয়েছে। রাত আটটায় আপনি এ ঠিকানায় চলে যাবেন। আপনার সংগে যেখানে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটবে, সেটা একটা দোকান। দোকানের পিছনেই একটা রুম আছে, সেখানে বসে আলাপ করবেন। আমি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো। চিনতে তো ভুল করবেন না? দুজনের মোলাকাতের ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি দোকানেই বসবো। নির্জনে আলাপ করতে পারবেন। তৃতীয় কেউ থাকবে না।

যুবকটি দোকানের ঠিকানা দিয়ে চলে গেলেন। আমি যথাসময়ে পুরাণ ঢাকার ঐ কাপড়ের দোকানের সামনে হাজির হয়েই দেখি, যুবকটি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সাথে করমর্দন করার পরই তিনি আমাকে সেই কক্ষে নিয়ে গেলেন। কক্ষটি খুবই সংকীর্ণ, তবে দু'তিন জন বসা যায়। শুধু একটি চৌকি পাতা আছে, আর আছে ছোট একখানা টেবিল ও দু'খানা চেয়ার। নেতার সংগে করমর্দন করে দু'জনই চৌকিতে বসলাম। নেতা আমাকে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, আমার সংগে দেখা করার জন্য আপনি কেন এত পেরেশান?

তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর আমি সংক্ষেপে দিলাম। আমার উত্তর শুনে বললেন, ঠিক আছে, তবে আমার নাম-ঠিকানা কখনও ছাপবেন না। তাকে অভয় দিলাম। এসময়ে চা-নাস্তা এসে গেল। নেতা তখন ঐ যুবকটিকে ডাকলেন। তিন জনে মিলে নাস্তা খেলাম। অতঃপর মাধ্যম যুবকটি চলে গেলেন। দুজনে আলাপ শুরু করলাম। নেতা বললেন, কি জিজ্ঞাসা করতে চান, করুন।

www.nagorikpathagar.org

– এবার বলুন তো ভাই, আপনি এপথে কিভাবে আসলেন?

– সে অনেক কথা। কেউ তো এভাবে কোনদিন জিজ্ঞাসা করেনি। আপনি যখন জানতে চেয়েছেন, তখন শুনুন। আমি এক ব্যবসায়ীর সন্তান। আব্বার বিরাট ব্যবসা। সংসারে আমার আম্মা-আব্বা ছাড়া রয়েছে কয়েকজন ভাই-বোন। বিরাট ব্যবসা পরিচালনার কারণে আব্বা সকাল ৮টায় বেরিয়ে পড়েন আর প্রায়ই রাত গভীরে বাসায় ফেরেন। ব্যবসায়ের কাজে তাঁকে দেশের বিভিন্ন জেলা সদরেও যেতে হয়। বছরে ৫/৭ বার বিদেশও যেতে হয়। সুতরাং আমি কোনদিন আব্বার গাইড পাইনি, এমনকি তাঁর আদর-সোহাগও আমার কপালে জোটেনি। এদিক থেকে যা পেয়েছি, তা শুধু আম্মার থেকেই পেয়েছি। চাকর-চাকরানী পরিবেষ্টিত জীবন। কোন প্রকার শাসনের নিগড়ে বাঁধা ছিলাম না। আব্বার সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার মূল লক্ষ্য ছিল প্রচুর অর্থ রোজগার। কখনও তিনি তাঁর ছেলেমেয়ের জীবনকে মহৎ গুণ আর জ্ঞানে ভরে তোলার চিন্তা করেননি। তিনি পেয়েছেন ধন, বিনিময়ে হারিয়েছেন পারিবারিক জীবন। প্রচুর সম্পদ পেয়েছেন, কিন্তু স্বস্তি পাননি। তাঁর বিশাল ব্যবসা আর টাকাকড়ি তাঁর মৃত্যুর পর ধরে রাখার জন্য 'আমি' নামের যে ছেলেটি রেখে যাচ্ছেন, তাকে সে অনুযায়ী কোন দিক দিয়েই যোগ্য করে তোলেননি। তবে হাঁ, একটা ব্যাপারে আমার আব্বার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে যে, ভিসিআর বাসায় থাকলে আমরা নাকি নষ্ট হয়ে যাব। তাঁর বিশ্বাস এতই দৃঢ় যে, আজও আমাদের বাসায় ভিসিআর নেই।

আমাদের বাসার চারদিকে শুধু ভিসিআর আর ভিসিআর। অনেকে চুটিয়ে ব্যবসা করছে থানা-পুলিশের সংগে লাইন করে। টিকেটের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি সকাল থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পোস্টার। ফিল্মের নাম এবং 'বুলু বুলু' (ব্লু) আওয়াজ করে প্রায় হরদম চলছে ডাকাডাকি। এসব দৃশ্য মনটাকে অস্থির করে তোলে। ভিসিআর কিনে দিতে আব্বার কেন এত আপত্তি? এর মধ্যে কি আছে, আমাকে অবশ্যই দেখতে হবে। একদিন পাশের বাসার বন্ধুর কাছে স্কুলের পড়া নিয়ে আলোচনার বাহানায় অন্য এক বন্ধুর সংগে ভিসিআর দেখতে বের হয়ে গেলাম। দুজনে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নিলাম, ধারে-কাছে কোথাও যাওয়া যাবে না। কারণ, পরিচিত অনেককেই পাওয়া যাবে। শেষে মহা ঝামেলা হবে শুরু। আব্বা জানলে হয়ত আর কোনদিন বাসা থেকে বের হতেই দেবেন না। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দূরের একস্থানে, ধরুন আলু বাজার এলাকায় ভিসিআর দেখতে গেলাম। ভিসিআর

www.nagorikpathagar.org

আমাকে মস্তান কিভাবে বানিয়েছে সেকথাই বলছি। কে কিভাবে মস্তান হয়েছেন তা আমি জানি না, কিন্তু আমাকে যে ভিসিআর মস্তান বানিয়েছে, সে সাক্ষ্য আমিই দিচ্ছি।

ভিসিআর দেখার আমার প্রথম অভিযান কিভাবে শুরু হলো তা শুনুন। ১৯৮৩ সাল। আষাঢ় মাসের এক সন্ধ্যা। বাবা ব্যবসা উপলক্ষে গেছেন সিঙ্গাপুর। সুতরাং ভয়শূন্য মন নিয়ে বন্ধুর সংগে বৃষ্টি-ঝরা সন্ধ্যায় গিয়ে উঠলাম ভিসিআরওয়ালা বাসায়। টিকেট কিনলাম, নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করলাম। এর আগে আমি কখনও ভিসিআর কি বস্তু, তার আকার-আকৃতি কি, সে সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এক্ষেত্রে এটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা বলতে পারেন। রামপুরার টিভি সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াই পৃথক ক্যাসেটে ভিসিআর-এর মাধ্যমে টেলিভিশনে ছবি দেখা যায়, সে জ্ঞানও আমার নতুন। দু'বন্ধু মিলে হিন্দি এক ছবি দেখলাম, সংলাপের অর্ধেক বুঝলাম আর অর্ধেক বুঝলাম না; তবুও ভাল লাগলো। বাসায় ফিরলাম রাত ১০টায়। মা ভাবলেন, আমি অনেক পড়াশুনা করে এসেছি। ব্যস্ততার সঙ্গে আমাকে তাড়াতাড়ি খেতে দিলেন। মায়ের ধারণা ভিন্ন অর্থে অবশ্য সঠিক। আমি তো পড়াশুনার নতুন সবকই নিলাম।

– এ দিন থেকেই কি আপনি ভিসিআর-এর ভক্ত হয়ে পড়েন?

– জ্বি-হাঁ, তা বলতে পারেন

সাথী পেলাম, তাই শখটাও বাড়লো। প্রথমে দেখলাম সপ্তাহে একটি, তারপর তা বৃদ্ধি করে সপ্তাহে ৩/৪ দিনই দেখতে লাগলাম। মা ভাবতেন, আমি পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি আর বাবা তো কোন খোঁজ-খবরই নিতেন না। পূর্ণ স্বাধীনতা আর কাকে বলে। শুরুতে বন্ধুসহ গেলেও পরে প্রায়ই একা একা যেতাম। এভাবে কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পর একদিন আমার বন্ধুটি এসে বললো, চল না ব্লু-ফিল্ম দেখে আসি। ইতোমধ্যে অবশ্য আমি ব্লু-ফিল্ম সম্পর্কে বন্ধু-বান্ধবদের থেকে মোটামুটি একটা আইডিয়া নিয়ে রেখেছি। তাই বন্ধুর প্রস্তাবে সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলাম, কিন্তু গোলমাল বাধলো সময় নিয়ে। যে ভিসিআর-এর সংগে বন্ধুটির লাইন, অর্থাৎ চেনাজানা, সে ভিসিআর-এ ব্লু-ফিল্ম দেখানো হয় রাত বারোটায়। এত রাতে কিভাবে বাসা থেকে বের হই সে চিন্তায় পড়লাম। বন্ধুটি বললো, উপায় একটা আছে, 'তুই তোর মাকে বলবি, তোর বন্ধুর বাসায় অনেকক্ষণ লেখাপড়া করতে হবে। অধিক রাত হলে তুই সে বাসাতেই রাতে থাকবি।' প্রস্তাবটি মন্দ ছিল না। সে অনুযায়ী মার কাছে প্রস্তাব রাখতেই মা রাজী হয়ে গেলেন। অবশ্য প্রথমে একটুখানি যেন আমতা আমতা

www.nagorikpathagar.org

করছিলেন। রাত দশটায় বের হয়ে পড়লাম। সে রাতেও টিপটিপ বৃষ্টি ঝরছিল, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। পুরাণ ঢাকার রাস্তাঘাট তো জানেনই। রিক্সা থেকে নেমে একটি গলিপথে কিছুদূর যেতে হয়, সেই গলিপথ এতই সংকীর্ণ যে, রিক্সা চলতে পারে না। সুতরাং বড় রাস্তায় রিক্সা থেকে নেমে গলিপথ দিয়ে চললাম। তারপর গিয়ে উঠলাম একটি ছোট চায়ের দোকানে। এতক্ষণে ভিজে গেছি। চায়ের দোকানটি আমাদের 'টিকেটঘরের' একেবারে লাগোয়া। টিকেটঘর হচ্ছে একটি মুদির দোকান। এ দোকান থেকেই টিকেট ক্রয় করে নিয়েছিল আমার বন্ধু। সে ঐ দোকানটি আমাকে দেখিয়ে দিল। চায়ের দোকানে যখন পৌছলাম তখন রাত পৌনে এগারটা। আমাদের প্রেক্ষাগৃহ হচ্ছে এরই দোতলায়। গেট এখন বন্ধ, খুলবে ঠিক ১১টা ৪৫ মিনিটে। এসব তথ্য আমার বন্ধুই পরিবেশন করতে লাগলো। সাড়ে এগারটার সময় দেখলাম কেউ কেউ দু'হাতে প্যান্টের নীচ অংশ যতদূর সম্ভব উপরে তোলে, কেউ কেউ লুঙ্গি হাফ-প্যান্টের মত করেও আসছেন। এই সরু গলিপথ কারো চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। যারা চেনেন না, তারা চেনা সাথী নিয়ে এসেছেন। যারা সাথী ছাড়া এসেছেন, তাদেরও পথ চিনতে অসুবিধা হয় না। কারণ, গলির মোড়ে পথ-প্রদর্শকরা দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা লোক দেখলেই বুঝতে পারেন, কে তাদের কাস্টমার। ঠিক ১১-৪৫ মিনিটে গেইট খুলে দেয়া হলো। অনেকেই এক সাথে প্রবেশ করলেন। সকলেরই বয়স ১২ থেকে ২৫/২৬। দু'একজন ৩০/৩৫ বছরের মনে হলো। সারারাত প্রোগ্রাম। পঞ্চাশ টাকা প্রতি টিকেটের মূল্য। প্রেক্ষাগৃহে ঢুকলাম। দর্শকের সংখ্যা প্রায় একশত হবে। কেউ কিন্তু কারো মুখের দিকে তাকান না। সকলেরই সলজ্জ আনত মুখ। মনটা সকলের নেংটা হয়ে গেলেও, মনে হলো চোখটা এখনও এত নেংটা হয়নি, যদিও নেংটা ছবি সবাই দেখতে এসেছেন। হাসি নেই কারো মুখে। কেউ কাউকে দেখছেন না। কেউ কারো চোখের দিকে এক মুহূর্তের বেশী তাকিয়ে থাকতে পারছে না। সবার মুখে অপরাধবোধের সুস্পষ্ট ছাপ। গেইট বন্ধ হয়ে গেল। সবাই বসে গেলাম। কিছু চেয়ার রয়েছে পিছনের দিকে, আমরা সবাই চাটাইতে বসলাম। অসুবিধা হবার নয়, প্রায় সকলের পরণেই লুঙ্গি। প্যান্টওয়ালারা বসেছেন চেয়ারে। চেয়ারে বসলে বেশী পয়সা দিতে হয়, বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিলাম। আমি এরপর যতবার ব্লু-ফিল্ম দেখেছি, ততবারই প্যান্ট পরে চেয়ারে বসেছি।

– ব্লু-ফিল্মের দর্শকদের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর দর্শক বেশী বলে আপনার মনে হয়েছে? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

www.nagorikpathagar.org

– কোন্ কোন্ বয়সী লোক ভিসিআর দেখে তা তো আগেই বলেছি। তবে শ্রেণীবিন্যাস করলে প্রথমেই যাদের কথা বলতে হয় তারা হচ্ছে ছাত্র। সিক্স সেভেনের ছাত্র থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পর্যন্ত এই শ্রেণীভুক্ত। কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তো স্বাধীন। যারা থাকেন ছাত্রাবাসে, তাদের তো নিরংকুশ স্বাধীনতা। ইচ্ছা করলেই তা পূর্ণ করা যায়। আবার যারা মা–বাবা বা অভিভাবকদের সাথে থাকেন, তারাও কোন না কোন কারণ সৃষ্টি করে মনের এই সাধ পূরণ করতে পারেন। স্কুল পর্যায়ের যেসব ছাত্র ভিসিআর দেখে, তারা সাধারণত দিনের বেলায় পালিয়ে দেখে। যারা রাতে দেখে, তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে তারা পড়েন, যারা আলালের ঘরের দুলাল। যদি সন্তান রাগ করে কোন অঘটন ঘটায়, তাহলে? শুধু সেই ভয়ে তারা কিছুই বলেন না। যেসব সন্তানের বাবা বা অভিভাবক সকালে বের হন আর গভীর রাতে বাসায় ফেরেন, তাদের ছেলেরা এ সুযোগ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত সেসব ছেলে, যারা বন্ধুর বাসায় ক্লাসের পড়া নোট করার নামে এই সুযোগ সৃষ্টি করে। যেমন আমি করতাম। এরপর যাদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে তারা হলো হোটেল, দোকান আর কলকারখানার অল্পবয়সী কর্মচারী। সরকারী ও বেসরকারী অফিসের কিছু মধ্যম ও প্রৌঢ় বয়সী কর্মচারীও আছেন। তবে বলতে পারেন, ছাত্র আর হোটেল দোকানের অল্প বয়েসী শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা বেশী।

– আপনি যখন ভিসিআর দেখা শুরু করেন, তখন পুরাণো ঢাকায় ভিসিআর প্রদর্শনী কেন্দ্র কতটি ছিল? বর্তমানে কতটি? পুলিশের হামলায় কি কখনো পড়েছিলেন? সে অভিজ্ঞতাও বলুন।

– আমি যখন ভিসিআর দেখা শুরু করি, তখন পুরাণো ঢাকায় ভিসিআর প্রদর্শনী কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৪০/৪৫ টি। বর্তমানে রাজধানী ও রাজধানীর আশেপাশে ভিসিআর প্রদর্শনী কেন্দ্রের সংখ্যা হবে অন্তত পাঁচ শতাধিক। তন্মধ্যে ১৫/২০টি অভিজাত বলতে পারেন। কারণ, এসব কেন্দ্রে যারা ভিসিআর–এ ব্লু–ফিল্ম দেখেন, তারা মোটামুটি শিক্ষিত, কাপড়–চোপড়েও ফিটফাট, পয়সাওয়ালাও বলা যায়। এসব কেন্দ্রে দর্শকদের আসন ব্যবস্থাও উন্নত। তাই টিকেট মূল্যও বেশী। কোন কোন কেন্দ্রে চা–নাস্তাও পরিবেশন করা হয়। হিন্দী এবং উর্দু ছবিই প্রদর্শিত হয় বেশী।

পুলিশী হামলার কথা বলছেন? হামলা তো হবেই। বেআইনী প্রদর্শনীতে দু'চার বার হামলা না করলে মামলা তো রুজু করা যায় না। দু'একটি মামলা যদি মাসে দু'মাসে রুজু করা না যায়, তাহলে আইন প্রয়োগ করা যে হচ্ছে, তা

www.nagorikpathagar.org

কিভাবে প্রমাণ করা হবে? এছাড়া তাতে ফায়দাও আছে। অলিখিত বন্দোবস্তের রেইটও বাড়ে। এ রেইট বৃদ্ধির সাথে আমাদের টিকেট মূল্য বৃদ্ধিরও নিবিড় সংযোগ থাকে। মহাজনদের কোন লোকসান নেই। পত্রিকাওয়ালারা সব সময় এসব প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে লেখেন। সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ আর চিত্রনির্মাতাদের তো ভিসিআর রীতিমত চক্ষুশূল। সরকারও মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়েন। বেশী হুলুস্থূল হলে নতুন করে ম্যানেজ করে নিতে সপ্তাহ দিন সময় লাগে, তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। যারা ধরপাকড় করেন, তাদেরই কেউ কেউ আয়ের উৎসস্থলে আগাম খবর দিয়ে থাকেন সপ্তাহ দিন অপেক্ষার জন্য। আবার তারাই বলে দেন 'এবার চালু করুন।' মামলায় পড়েন সেসব ভিসিআরওয়ালা, যারা পয়সা ছাড়েন না, ছাড়লেও অল্প পুঁজি' খাটিয়ে বেশী রোজগার করতে চান অথবা গোপনে ব্যবসা করে সব লাভ হাতিয়ে নিতে চান, তারাই মামলার ঝামেলায় পড়েন। এ লাইনের বখিল ব্যবসায়ীরাই দুর্ভোগ পোহান। প্রদর্শনী কক্ষ থেকে ভিসিআর থাকে বহুদূরে। কখনো পাশের বাসায় গোপন স্থানে রাখা ভিসিআর থেকে তারের মাধ্যমে কানেকশন দেয়া হয় প্রর্দশনী কালার টেলিভিশনে। ঝামেলা দেখা দিলেই কাট। পড়ে রইলো শুধু টেলিভিশন। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে অত্যন্ত মজবুত। পুলিশ এলেও দর্শকরা যাতে নিরাপদে পালাতে পারে সে ব্যবস্থাও থাকে। আমাকে কয়েকবারই পুলিশী অভিযানের কারণে পালাতে হয়েছিল। অভিজ্ঞতার কথা আর কি বলবো, কাঁচা পায়খানা মাড়িয়েও দু'তিনবার পালিয়েছি। একবার তো পুলিশ ধরে ধরে অবস্থা, কিন্তু ধরতে পারেনি। দেয়াল টপকিয়ে পালিয়েছি। ব্যাপারটা আর কিছু নয়। আমি যে ভিসিআর দেখতাম, তার মালিক বোধহয় খুবই কৃপণ লোক ছিল, তাই মাঝে মাঝে ঝামেলায় পড়তাম। অবশ্য বিরক্ত হয়ে কেন্দ্র বদলি করতে বাধ্য হই।

– ভিসিআর–এ যেসব ছবি প্রদর্শিত হয়, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ ভাষার ছবি বেশী জনপ্রিয়? কোন্‌সব ছবি দর্শকরা বেশী পছন্দ করে? বাংলাদেশের বাংলা ছবি কি ভিসিআর–এ প্রদর্শিত হয়।

– হিন্দী ছবির জনপ্রিয়তা বেশী, তারপর উর্দু আর সর্বশেষে আসে বাংলা। তবে ছবির মান অনুযায়ী জনপ্রিয়তার তারতম্য ঘটে থাকে। অনেক বাংলা ছবি আছে, যেগুলো দর্শকরা হিন্দী উর্দু ছবির চেয়ে বেশী পছন্দ করে। কোরবানী, সিলসিলা, ডিসকোড্যান্স, লা–ওয়ারিশ, সত্যম শিবম সুন্দরম, মোকাদ্দার ক্যা সিকান্দার, ববি, কাভি কাভি দোস্তানা, শোলে, ত্রিশূল প্রভৃতি ছবি খুব জনপ্রিয়।

www.nagorikpathagar.org

নতুন হিন্দী ছবি তো বোম্বে–কলকাতার হলগুলোতে প্রদর্শনীর আগেই আমাদের দেশে চোরাই পথে পৌঁছে যায়। এ লাইনের আমদানী ও রপ্তানীকারকরা খুবই দক্ষ ও স্পীডি। বাংলাদেশের কোন বাংলা ছবি ভিসিআর–এ প্রদর্শিত হয় না। বাংলাদেশী ছবি যারা দেখেন, তারা হলে গিয়েই দেখেন।

– ব্লু ছবি সম্পর্কে কিছু বলুন।

– ব্লু ছবির কথা আর বলবেন না। এ ছবি আমার সর্বনাশ করেছে। কিশোর ও যুব সমাজের একটি বিরাট অংশকে একেবারে বরবাদ করে দিয়েছে। সাধারণত নিষিদ্ধের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশী থাকে। সেই আগ্রহ আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নীল ছবির কাছে। অনেক ভিসিআর আছে, যেগুলোতে শুধু নীল ছবিই দেখানো হয়। আগে গভীর রাতে দেখানো হতো, এখন দিবাভাগেও দেখানো হয়। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলোয় নির্মিত ব্লু ফিল্মের সংখ্যাই বেশী। তবে বিলাতী, মার্কিনী, ফরাসী আর জাপানী ফিল্মের সংখ্যাও কম নয়। দুবাই, ব্যাংকক, হংকং, সিঙ্গাপুর হচ্ছে এসব ক্যাসেটের বাজার। এই ছবিগুলো ১৫ থেকে ২০ মিনিট দৈর্ঘ্যের। এসব ছবিতে কথা থাকে কম, কিন্তু এ্যাকশনই বেশী। সংলাপে ভরপুর ব্লুফিল্ম আমাদের দেশী দর্শক–শ্রোতারা তেমন পছন্দ করেন না। কারণ, তারা এ্যাকশনই দেখতে চান। প্রায় দর্শক ইংরেজী ভাষা তেমন বুঝে না, বুঝবার দরকারইবা কি, এসেছেন দেখতে, শুনতে তো নয়। যেসব দৃশ্য দেখানো হয়, তা এতই জঘণ্য যে, একজন সুস্থ মানুষ এমন দৃশ্য কল্পনাও করতে পারবে না। হায়া–শরমের শেষ কণাটুকুও যাদের মধ্যে নেই, একমাত্র তারাই এ ছবিগুলো চোখ খোলা রেখে দেখতে পারে। আমি তো প্রথম দিকে যেসব ফিল্ম দেখেছি, এসবের কোনটিই পূর্ণ দেখিনি। চোখ বন্ধ রেখেছি। তারপর দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে গেছে। অর্থাৎ, হায়া–শরম বিদায় দিয়ে তবেই না দেখতে সক্ষম হয়েছি। নীল ছবি বিভিন্ন প্রকার, তবে যৌন কর্মকান্ডই প্রধান। এরই ভিত্তিতে যে যত প্রকার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে পারে, তাই ধরে রেখেছে ছবিগুলোতে। এসব ছবিতে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের মধ্যকার যৌন সম্পর্কই দেখানো হয়, তারপর শুরু হয় যৌনক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃশ্য। বৃদ্ধের সংগে যুবতী, এমনকি বালিকা, বৃদ্ধার সংগে বালক, বাবার সংগে মেয়ে, মার সংগে ছেলে ইত্যাদি অকল্পনীয় নগ্ন চিত্ররূপ দেখেছি রুদ্ধশ্বাসে। ভিসিআর সাধারণ দর্শকরা খুব কমই দেখতে আসে। কারণ, এসব ছবিতে কথা নেই বললেই চলে। ১২/১৩ মিনিট একই দৃশ্য দেখানো হয়। পুরুষে পুরুষে সমকামের তুলনায় মেয়েতে মেয়েতে সমকাম বেশী দেখানো হয়। মুখ মেহন ও আত্মরতির

www.nagorikpathagar.org

দৃশ্যও প্রতিটি ছবিতে অবধারিত। পশু মৈথুনও বাদ যায় না। যৌনক্রিয়াভিত্তিক কার্টুন ছবিও আজকাল দেখানো হয়। লজ্জাশরমের মাথা এখনও খাননি এমন দর্শকও এসব দেখতে আসেন। তাদের দেখলেই মনে হয়, এলাইনে নতুন। বিভিন্ন দৃশ্য আসলে তারা মাথা নীচু করে থাকেন। বর্তমানে মেয়েরাও দলবদ্ধ হয়ে কোন বাসা ভাড়া করে বা দু একদিনের জন্য বন্দোবস্ত নিয়ে পর্ণ ছবি দেখছে।

এসব ছবির নাম হট লেডী ইন দি সিটি, হট কুকীজ, দি ইলেকট্রনিক গেম, দি লেডী কিলার, আন্টি এন্ড নেপিউ ইত্যাদি।

এধরনের ছবি দেখে শুধু আমার নৈতিক অধঃপতনই ঘটেনি; বরং দৈহিক দিক থেকেও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আচার-আচরণ, চাল-চলন, চিন্তা-ভাবনা অর্থাৎ, সব দিক দিয়ে আমি যেন একটা যৌনজীব হয়ে গেলাম। রাতের ঘুম আমার হারাম হয়ে গেল। যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। যা দেখছি তা করার একটা উন্মাদনা আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেল। এ অবস্থা কারো সৃষ্টি হলে যা হয়ে থাকে, আমার বেলায়ও তাই হলো। আমার মত যারা এ অভ্যাসের গোলাম হয়েছে, নিশ্চয়ই তাদেরও এ অবস্থাই হয়েছে। আমার মস্তানী জীবনের এটাই পটভূমি।

– এখনও কি আপনার ভিসিআর দেখার নেশা আছে, ব্লু ফিল্ম কি এখনও দেখেন?

– না, এ পথে এখন আর আমি নেই। ভিসিআর-এর প্রতি আমার প্রচন্ড ঘৃণা জন্মেছে। খুব রুচিশীল ছবি ভিসিআর-এ দেখানো হলেও আমি দেখতে যাই না। কারণ, ভিসিআর নামটি আমি আর পছন্দ করি না।

– এ ঘৃণা বোধ জন্ম নেয়ার কোন কারণ বা পটভূমি আছে কি?

– আমার এ অধঃপতন দেখে আব্বা একদিন আম্মার সংগে রাগারাগি করে কেঁদেই ফেললেন। আব্বার কান্না দেখে আম্মাও খুব কাঁদলেন। সে সময় আমি বাসায় ছিলাম। আশ্চর্য! আমার আম্মা-আব্বা সেদিন আমাকে কোন কথা বলেননি। তাদের এই সঙ্গোপন কান্না আমাকে এতই বিচলিত করেছিল যে, আমিও কেঁদেছিলাম। রাত্রে আমার ঘুম হয়নি। সে রাতে শপথ নিলাম, আমার আব্বা-আম্মাকে আমি আর কাঁদাবো না। আমি আরও লক্ষ্য করলাম যে, আমার আম্মা-আব্বা নামাজের পর যখন মোনাজাত করতেন, তখন উচ্চ স্বরে এই বলে প্রার্থনা করতেন, 'হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে তুমি সুপথে আন।' এ আহাজারি আমি তাদের মোনাজাতে কয়েকবার স্বকর্ণে শুনেছি। আমার এ অভ্যাসের জন্য

www.nagorikpathagar.org

আম্মা মাঝে-মধ্যে বকাবকি করলেও আব্বা কোনদিন একটি কথাও বলেননি। তাঁর এই নির্বাক শাসনে আমার ভীষণ ভয় লাগতো।

আর একদিনের ঘটনাও আমার মনে গভীর দাগ কাটে। আমার এক আত্মীয়ের বাসায় বসে ভিসিআর দেখছি। কিছুক্ষণ ছবিটি চলার পর একটি দৃশ্য এল। দৃশটি আমার কাছে নগ্ন মনে হলো না। কারণ, কত নগ্ন ছবিইনা দেখেছি, কিন্তু ঐ বাসার সবাই দৃশ্যটি নগ্ন মনে করলেন। দৃশ্যের মধ্যে ছিল আলিংগন আর চুম্বন। পাশাপাশি বসা ছিল দুই ভাই-বোন, উভয়ে কলেজে পড়ে। তারা মাথা নত করলো। তাদের মাকে দেখলাম আড়চোখে ছেলে-মেয়ের দিকে তাকাচ্ছেন। বাবা সিগারেট ধরাবার বাহানায় অন্য কক্ষে চলে গেলেন। কাজের আধ-বুড়ো ঝি ছি ছি বলে উঠেই গেল। আমি কিছুই করলাম না। শুধু চোখ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিক অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করলাম। প্রগতিশীল পরিবারের প্রগতিশীল সদস্যদের দেখলাম, প্রগতির চোখ যেন টিপ্পনী দিয়ে বলছে, 'লজ্জা আবার কিসের?' এ দৃশ্য তৎক্ষণাৎ আমার মধ্যে কোন ভাবান্তর সৃষ্টি করেনি বটে, কিন্তু তাদের মুখ লুকালুকির দৃশ্যটি আমাকে নতুন করে কিছু ভাবতে বাধ্য করে।

আর একটি ঘটনাও আমার উপর কম প্রভাব বিস্তার করেনি। আমার দাদা ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি। তাহাজ্জুদ নামাজ পর্যন্ত তিনি বাদ দিতেন না। হজ্জ করে এসে তিনি পূর্বের চেয়ে আরও বেশী করে এবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হলেন। তিনি একদিন সকাল বেলা নাস্তার টেবিলে বসে আমার আম্মা-আব্বা, বোন-ভাই ও আমার সামনে বললেন, আজ রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। জানি না এ স্বপ্নের তাবির কি। আমি দেখলাম, আমার নাতির পরিধানের কাপড়-চোপড়ে আগুন লেগেছে। আগুন নেভাতে কেউ আসছে না। সে শুধু ছটফট করছে। আমি শুধু চিৎকার করছি। এমন সময় তোমরা দু'জন (আব্বা ও আম্মাকে দেখিয়ে) পানি নিয়ে এসে আগুন নিভিয়ে তাকে বাঁচিয়েছ।

দাদা তাঁর স্বপ্নের কথা শেষ করে নাস্তা খেতে লাগলেন। আব্বাকে দেখলাম আম্মার দিকে আর আম্মাকে দেখলাম আব্বার দিকে অর্থবহ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। কোন কথা বললেন না। আমার বোনটি শুধু বললো, ভাইয়া খুব দুষ্ট, কোন্দিন না জানি আগুনে পুড়েই মরে। আমি চুপচাপ নাস্তা সেরে উঠে গেলাম।

এসব ঘটনা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তবে আমার আম্মা-আব্বার আকুল আহাজারিই বোধহয় আল্লাহ কবুল করেছেন। আজ আমি ভিন্ন মানুষ, কিন্তু বিগত বদনাম এখনও আমাকে তাড়া করে। এখনও কেউ কেউ দূর

www.nagorikpathagar.org

থেকে আঙ্গুল ঈশারা করে বলেন, ঐ যে মস্তান যায়! তবে আনন্দের কথা, আমার এ পরিবর্তন চেনা-জানা মহলের ভাল মানুষের দ্বারা নন্দিত হয়েছে। আব্বা-আম্মা তো কি যে খুশী, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। লেখাপড়া তেমন হচ্ছে না। বাবার ব্যবসায়েও লেগে আছি। বাবাও তাঁর ব্যবসা আস্তে আস্তে আমাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। আমার এ পরিবর্তনে কিন্তু সন্তুষ্ট নয় আমার সেসব বন্ধু-বান্ধব, যারা ছিল নীল ছবি দেখার সাথী আর মস্তানীর সহযোগী। তারা চটুল ও লঘু মন্তব্য করে বলে, কি রে, দরবেশ হয়ে গেলি নাকি। আমি বুঝি, এসব চটুল মন্তব্যের মধ্যে তাদের হাহাকারই প্রকাশ পায় আর আমি পাই কিছুটা সান্ত্বনা।

– আপনি বলছেন, ভিসিআর আপনার জীবনকে বরবাদ করেছে। আমি মনে করি, ভিসিআর সম্পর্কে আপনি অনেক খোঁজ-খবরই রাখেন। আমাদের দেশে ভিসিআর কবে আসে এবং এর পথিকৃৎ বলে কাকে ধরে নেয়া যায়? ভিসিআর আমদানী কিভাবে হয়ে থাকে?

– আমি সঠিকভাবে বলতে পারি না এ যন্ত্র আমদানীর পথিকৃৎ কে? তবে আমি শুনেছি, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরবর্তী কোন এক সময়ে ঢাকার গুলশানের আজিজ মোহাম্মদ ভাই নামক একজন অতি প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এদেশে সর্বপ্রথম ভিসিআর আনেন। সেই ভিসিআরই নাকি বাংলাদেশে আমদানীকৃত প্রথম ভিসিআর। আরও শুনেছি, তিনি ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দু ছবির প্রর্দশনীর আয়োজন করতেন। তার বৈঠকখানায় সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের দাওয়াত করে এনে ছবি দেখাতেন। তাদের নাম এখন উচ্চারণ করলে কেউ বিশ্বাসই করবে না।

ভিসিআর আমদানী বৈধ বা অবৈধ এ সম্পর্কে সরকার কোন চিন্তা করার প্রয়োজনবোধ করেননি এবং এ যন্ত্রটির সাহায্যে ছায়াছবি প্রদর্শন করা যায়, এ জ্ঞানটুকুও অনেকের ছিল না। কয়েকজন ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেউ জানতো না ভিসিআর কাকে বলে এবং এর আকার-আকৃতিইবা কি। তখন সুযোগসন্ধানী অভিজ্ঞ লোকেরা প্রচুর ভিসিআর আমদানী করেন। রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ, থ্রি-ইন-ওয়ান এর নাম করে ভিসিআর বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে। হিজবুল বাহারকেই এ সুবর্ণ সুযোগের বাহন হিসাবে অনেকে চিহ্নিত করেন। দুবাই, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর-এর চোরাচালানীচক্রের দ্বারা আনএকম্পেনিড লাগেজ ও ইন্টারন্যাশনাল পোস্টাল পার্সেল-এর সাহায্যে অনেক ভিসিআর যন্ত্র ভুয়া

www.nagorikpathagar.org

ইনভয়েসে আমদানী হয়েছে। ভিসিআর চিত্তবিনোদনের জন্য হলেও পরবর্তীতে চিত্ত জ্বালার কারণ হয়ে পড়ে।

– আপনি যখন এ ভিসিআরকে জাতীয় চরিত্র নাশের মস্তবড় এক হাতিয়ার মনে করেন, তখন আপনি কি কোন চিন্তা–ভাবনা করেছেন এর প্রভাব থেকে জাতিকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে?

–ভিসিআর এ জাতির কতটুকু ক্ষতি করেছে, তা আমি নিজেকে দিয়েই বুঝি। যে সর্বনাশ জাতির হয়েছে তা হয়ত কোন কালেই পূরণ হবার নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে আরও অধিক ক্ষতি হবে, যদি তা থেকে জাতিকে রক্ষা করা না যায়। অবৈধ প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে যে আইন রয়েছে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা দরকার এবং এর দর্শক শ্রোতাকেও এ আইনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। (উল্লেখ্য, ভিসিআর–এ অবৈধ ছবি প্রদর্শনী আমাদের দেশের প্রচলিত ফৌজদারী দন্ডবিধির ২৯২ ধারার আওতায় আসে। যার সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদর্শকের তিন মাসের কারাদন্ড অথবা জরিমানা। অথবা উভয়ই হতে পারে, কিন্তু যারা দর্শক, তারা কোন আইনের আওতায় আসেন না। –লেখক)। আমার মতে এ আইন প্রয়োগের জন্য নিম্ন ও উচ্চ পর্যায়ের দুটি দল থাকা দরকার। নিম্ন পর্যায়ের দলভুক্ত যারা থাকবে, তাদের দায়িত্ব থাকবে থানার আওতাধীন এলাকার কোথায় অবৈধ প্রদর্শনী হচ্ছে আর কার ভিসিআর–এ হচ্ছে, তা তারা অনুসন্ধান করে বের করবে এবং প্রদর্শক ও দর্শক–শ্রোতাদের গ্রেফতার করে আদালতে সোর্পদ করবে। উচ্চ পর্যায়ের যারা আইন প্রয়োগকারী হবে, তারা দেখবে নিম্ন পর্যায়ের সদস্যরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কিনা। তারা নজর রাখবেন নিম্ন পর্যায়ের আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যদের উপর এবং বেআইনী প্রদর্শনকারীর উপর। আমার মতে যথাযথভাবে যদি তাই করা হয়, তাহলে শুভ ফল ফলতে পারে। পর্নো ছবি যাদের কাছে পাওয়া যাবে, তাদের যে শাস্তি দেয়া হবে, তা হতে হবে কঠোরতম। আমি মনে করি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যদি ইচ্ছা করে, তাহলে ভিসিআর–এর দৌরাত্ম্য একেবারে বন্ধ করে দিতে পারে। আগে তাদের নিরপেক্ষ ও সংশোধিত হতে হবে, দুর্নীতি যারা দমন করবে তারা দুর্নীতিমুক্ত হলেই দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হবে, অন্যথায় নয়।

–আর কি কোন পরামর্শ আপনি দিতে পারেন?

– পরামর্শ আমি কিইবা দিতে পারি। অন্যকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে গেলেই আমার অতীত সামনে আসে। আমি তখন লজ্জায় মাথা নত করে ফেলি। তবুও আমার অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এ পরামর্শ দেই যে, কিশোর–

www.nagorikpathagar.org

যুবকদের মা-বাবা বা অভিভাবকগণ প্রতিদিন অন্তত এ খবর রাখা উচিত যে, তাদের সন্তানেরা কোথায় আছে, কি করছে, কোথায় যায় এবং কাদের সাথে মেলামেশা করে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অধিকাংশ মা-বাবা বা অভিভাবক এসবের কোন খবরই রাখেন না। যেমন, আমার মা-বাবা আমার গতিবিধি সম্পর্কে প্রায়ই উদাসীন থাকতেন। আব্বা ভিসিআর ক্রয় করেননি, আমি নষ্ট হয়ে যাবো বলে। অথচ এ ভিসিআরই আমার জীবন শেষ করেছে। সুতরাং আমার পরামর্শ হচ্ছে, মা-বাবা বা অভিভাবকরা যদি তাদের সন্তানদের দিকে সার্বক্ষণিক সতর্ক নজর রাখেন, তাহলে এ ভিসিআর-এর চরিত্রনাশা হামলা থেকে নিজ সন্তান ও অধীনদের অনেকাংশে রক্ষা করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

– আপনি বলেছেন, আপনি আপনার আব্বার ব্যবসা করেন, কিন্তু আমি জানি আপনি এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এখন ভিসিআর দেখেন না বরং ঘৃণা করেন। আমার প্রশ্ন আপনার বর্তমান জীবনধারা তো মনে হয় ভিসিআর জীবনের চেয়ে মোটেই উন্নত নয়। এ জীবন-পথ থেকে কি সরে আসতে পারেন না? আপনাদের মত লোক স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করলে সমাজে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হতো।

www.nagorikpathagar.org

পতিতালয় আমাকে মস্তান বানিয়েছে

আমার এই মস্তান বাবাজী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বললেন, তিনি এক গরীব কৃষকের সন্তান। আমি অবশ্য বিশ্বস্ত সূত্রে পরে জানতে পারি যে, তিনি কোন গরীব কৃষকের সন্তান নন, তার বাবা মস্তবড় এক জোতদার। এই জোতদার ছিলেন এক সময় জমিদারের লাঠিয়াল সর্দার। জমিদারের হুকুমে জমিদারের জন্য তিনি অনেকের জমাজমি দখল-অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন। খুনের মামলায় আসামী হয়ে হাজত জেলও খেটেছেন কয়েকবার। প্রতিবারই জমিদার নিজ স্বার্থে তাকে মুক্ত করেছেন প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এই লাঠিয়াল সর্দারের শরীরে জখমের অনেক দাগ আছে। মাথাও ফেটেছে তিনবার। লাঠিয়াল সর্দারের বিয়ের যাবতীয় ব্যয়ও বহন করেন জমিদার। এভাবে দিন চলছিল লাঠিয়াল সর্দারের। একদিন লাঠিয়াল সর্দারকে ডেকে জমিদার বললেন, তোকে নতুন চরের পাঁচ বিঘা জমি দিলাম। চাষবাস করে খা। চরে গিয়ে ঘর বাঁধ। বউকেও নিয়ে যা। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। নানা রোগ শরীরে বাসা বেঁধেছে। কখন যে চিরতরে চলে যাই, তা বলা যায় না। তুই আমার জন্য অনেক কিছু করেছিস। আপাতত পাঁচ বিঘা নে। এতে যদি না হয়, তাহলে আমাকে বলিস্; আরও তিন বিঘা দেব।

লাঠিয়াল সর্দার মহাখুশী। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন জমিদারের পা ছুঁয়ে। লাঠিয়াল সর্দার নতুন চরে ঘর বাঁধলেন। চাষাবাদে মনোযোগ দিলেন। অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। দানে পাওয়া নিজের জমি তো চাষাবাদ করেনই, জমিদারের জমিও চাষাবাদ করেন। এভাবে প্রায় চার বছর গত হলো। লাঠিয়াল সর্দারও এ মেয়াদের মধ্যে দুই ছেলের জনক হয়ে গেছেন। নতুন চরের তিনিই বড় জমিদার। এদিকে মূল জমিদারের দ্রুত স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। জমিদারের তিন মেয়ে বিবাহিত। তিন জনই দেশের বাইরে থাকেন স্বামীর সাথে। লাঠিয়াল সর্দারই জমিদারের পক্ষে জমিদারী পরিচালনা করেন। কার্যত তিনিই যেন জমিদার।

মূল জমিদারের বার্ধক্যজনিত ব্যাধি বৃদ্ধি পেল। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। প্রায় একমাস শয্যাশায়ী থেকে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় কোন মেয়ের জামাই বা নাতি-নাতনী শয্যাপার্শ্বে ছিল না। জমিদারের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় এ লাঠিয়াল সর্দারই জমিদারের মৃত্যুর পর মরহুম জমিদারের জমিদারী

www.nagorikpathagar.org

দেখতে থাকেন। দুই মেয়ে পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাড়ী এসেছিলেন। কিছুদিন পিত্রালয়ে থাকার পর আবার স্বামীর কর্মস্থলে ফিরে গেছেন। বড় মেয়ে স্বামীর সংগে জার্মান থাকতেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়েও আসতে পারেননি। কারণ, এসময় তিনিও খুব অসুস্থ ছিলেন। সুদূর প্রবাসে থেকে পিতার কথা স্মরণ করে শুধু কান্নাকাটি করেছেন।

পরের কাহিনীতে অনেক ঘটনার সমাহার ঘটেছে, কিন্তু পাঠকের দুঃখ বোধ করতে হবে না। কারণ, যে দামে কেনা সে দামে বেচা, মধ্যখানে শুধু বাটখারা আর দাঁড়িপাল্লার ব্যস্ততা। আমি এখানে এই দীর্ঘ কাহিনী বয়ান করতে যাচ্ছি না। সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলে রাখা এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট হবে যে, মরহুম জমিদারের বিশাল জমিদারী অন্যান্য জমিদারের মধ্যে আপোষে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গেল। লাঠিয়াল সর্দার সংঘাতে গেলেন না। তিনি নতুন চরের মরহুম জমিদারের সব ভূসম্পত্তি দখলে নিয়ে নিজেই বড় জোতদার হয়ে গেলেন। তিনি এখন নতুন চরের বড় জোতদার।

আমার আলোচ্য মস্তান বাবাজী লাঠিয়াল সর্দার তথা নতুন জোতদারের সন্তান। রাজধানীর দুর্ধর্ষ মস্তানদের তিনি অন্যতম। 'বাপ কা বেটা' বলতে যা বুঝায়, তিনিও তাই। তিনি নিজ জেলার এক কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য, কিন্তু ভর্তি হতে পারেননি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তির চেষ্টা চালিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। অবশেষে রাজধানীর এক কলেজে ভর্তি হন। কলেজ হোস্টেলে থাকার সুযোগ পেয়ে যান। জোতদার বাবা থেকে মাসে মাসে যে পরিমাণ টাকা আসতে থাকে, তাতে তিন জনের হোস্টেলবাস চলে অনায়াসে। বাপের মতই তিনি স্বাস্থ্যবান ও জঙ্গী। তার হোস্টেলের পাশেই পতিতালয়। বাবা মাসে মাসে যে অর্থ পাঠান, তার উল্লেখযোগ্য একটা অংশ পতিতালয়-খাতেই ব্যয় হত। এই বদভ্যাসে যারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাদের পরিণতি যে কেমন হয়, তিনি নিজেই এর এক দৃষ্টান্ত। পর পর তিন বছর ডিগ্রী পরীক্ষা দেন, কিন্তু একবারও কৃতকার্য হতে পারেননি। বারবার বিফল মনোরথ হয়ে লেখাপড়াই ছেড়ে দিলেন। যোগ দিলেন রাজনীতিতে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভিল্যান হতে হলে যা যা করা দরকার, তা স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে এ লাইনে দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ রাখেন। পিছনের ইশারায় তিনি বহু কিছু করে পিতার ধারা-ঐতিহ্য রক্ষা করেন। পিতা নানা মাধ্যমে খবরাখবর নিয়ে যখন জানতে পারলেন যে, ছেলের পড়াশুনার পাঠ শেষ, তখন বিয়ের প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু ছেলে সাফ জানিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দিল, 'জাতির মুক্তি আন্দোলনে মহাব্যস্ত'। আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে কেউ যেন তার বিয়ের নাম পর্যন্ত না নেন। বাবা-মা জানতেন না যে, তাদের পুত্রধন দীর্ঘদিন পতিতালয়ের সাহচর্যে থেকে এখন বিয়ের অযোগ্য হয়ে পড়েছেন। এ বদভ্যাস ত্যাগ করে ভাল চিকিৎসা না নিলে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কখন বিয়ের নাম নিতে হবে না।

আমার সঙ্গে তার দেখা মগবাজারের এক ক্লিনিকে। জবানবন্দী সেই ক্লিনিক থেকে নেয়া। কেমন করে তার সঙ্গে আমার মোলাকাত হল, সে কাহিনী সংক্ষেপে বলছি।

এ মস্তানের এক জেলাত ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে লেখালেখির ব্যাপারে প্রায়ই আমার কাছে আসত। একদিনের ঘটনা। আমি লেখা জমা দিয়ে একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন আমার এক আত্মীয়কে দেখার জন্য অফিসের গেট অতিক্রম করার সময় সাক্ষাৎ ঘটলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ ছাত্রের সঙ্গে। সাক্ষাতের স্থানটি অফিস গেট হওয়ার কারণে অফিসে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করিনি। তাকে বললাম, আমি তো এখন চলছি একটি ক্লিনিকে আমার এক আত্মীয়কে দেখতে। তার পেটে অপারেশন হয়েছে দুদিন আগে। সে আমাকে ক্লিনিকের নাম জিজ্ঞাসা করল। বললাম ক্লিনিকের নাম। ক্লিনিকের নাম বলতেই বলল, চলুন, আমিও সেই ক্লিনিকে যাব, আমারও একজন রোগী আছে এখানে।

বেশ চল, বললাম আমি। দুজন একই সাথে গেলাম। ক্লিনিকে প্রবেশের সময় আমি তার রোগীর রুম নম্বর জেনে নিয়ে বললাম, তুমি তোমার রোগীকে দেখতে যাও, আমি যাই আমার রোগীকে দেখতে। তুমি তোমার রোগীর কাছে বসে আমার অপেক্ষা করবে। আমি তোমার রোগীকেও দেখতে যাব। আমি আমার রোগীকে দেখতে গেলাম। প্রায় ১৫ মিনিট রোগীর সান্নিধ্যে থাকার পর বিদায় নিয়ে ঐ ছাত্রের রোগীর কক্ষে গেলাম। ছাত্রটি আমার সঙ্গে তার রোগীর পরিচয় করিয়ে দিল। কি রোগে তিনি ভোগছেন জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে বললেন, 'ইন্টারন্যাল'। নিজেকে প্রশ্ন করলাম 'ইন্টারন্যাল রোগ আবার কি'? সব রোগই তো ইন্টারন্যাল। চর্মরোগ হয়ে থাকলেও তার উৎসস্থান ইন্টারন্যাল। লোকটি কেন এ জবাব দিল? আবার জিজ্ঞাসা করলাম, রোগের নাম কি? এবারের জবাব হল এই 'কিছু একটা।' ভাবলাম, কোন গোপন রোগ হয়ত হবে, লোকটি যখন বলতে চাচ্ছে না, তখন পীড়াপীড়ি না করাই ভাল। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করার পর দুজন বের হয়ে আসলাম। ক্লিনিকের গেট সংলগ্ন বড় রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছাত্রটি বলল, চলুন রেস্টুরেন্টে। দুজনে চা-নাস্তা

www.nagorikpathagar.org

খাব আর সব কথা বলবো। মজার কাহিনী। এ রোগী আমার চাচার ছাত্র। সেই সুবাদে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। মানবিক কারণে কখনও কখনও দেখতে আসি। বিশ্বাস করুন, ওর জন্য আমার কোন মায়াদয়া নেই।

– কেন? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

– চলুন, রেস্টুরেন্টে ঢুকি। তারপর শুনবেন কাহিনী।

– চল।

দুজনে রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। কিছু নাস্তা ও দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। চা-নাস্তা খেতে খেতে সে সব কথা বলল, যা আমি শুরুতেই বলেছি। ছাত্রটিকে বললাম, আল্লাহ বড়ই মেহেরবান। এমন সুযোগ তো হাতছাড়া করা যায় না। এ মস্তানকে আমার দরকার। কেন যে দরকার, সব কথা তাকে খুলে বললাম। সে বলল, বেশ, সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন! আমার কি প্রয়োজন হবে? বল্লাম, না, আর প্রয়োজন হবে না। একাই সুবিধা বেশী। তুমি সামনে থাকলে হয়ত সে মনের কথা খুলে বলবে না।

দুজন রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে বিদায় নিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যের পথ ধরলাম।

ঠিক তিন দিন পর 'ইন্টারন্যাল' রোগীর জন্য কিছু ফল নিয়ে আমি ক্লিনিকে গেলাম। তার রুমের দরজা খুলে দেখি, তিনি শায়িত অবস্থায় একখানা দৈনিক পড়ছেন। আমি সালাম দিতেই তিনি দৈনিকখানা একপাশে রেখে প্রায় লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে আমাকে অভ্যর্থনার জন্য কক্ষের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। করমর্দনের জন্য তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন করলাম। তারপর নিজেই একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে বললেন। অভ্যর্থনায় তার অন্তর-খোলা আন্তরিকতায় সত্যিই মুগ্ধ হলাম। তার সম্পর্কে যা কিছু জানি, তা মনে হল যেন সঠিক নয়। কারণ, এমন কলুষিত হিংস্র চরিত্রসম্পন্ন লোকের যে পরিচয় এখন পেলাম, এর সঙ্গে আমার সংগৃহীত তথ্যের তেমন মিল পাইনি। যাহোক, তার জন্য আনা ফল তার দিকে এগিয়ে দিতেই রোগী বললেন, এসব কেন আনলেন? আপনার সঙ্গে পরিচয়ই আমার কয়েক মিনিটের। আমি ভাবতে পারিনি, আপনি যে আবার আসবেন বরং ভেবেছি বিপরীত, হয়ত আমাকে ঘৃণা করবেন। আপনার চিন্তাধারা ও চরিত্র আমার বিপরীত। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি তো আপনার কেউ নই, জেলার লোকও নেই, সহপাঠীও নই, সমবয়সীও নই, আমার সঙ্গে আপনার চেনাজানাও নেই, তবুও কেন আমাকে দেখতে আসলেন?

– থাক এসব কথা। এ নিয়ে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে কোন একদিন

www.nagorikpathagar.org

আলোচনা করা যাবে। আগে বলুন আপনার রোগের অবস্থা।

– চিকিৎসা চলছে। তবে মনে হয় কিছুটা উন্নতি।

– ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই সেরে উঠবেন। আপনার রোগটা কি? সেদিন শুধু বললেন 'ইন্টারন্যাল', বুঝতে পারলাম না।

– বলতে লজ্জা পাই, বিশেষ করে আপনার মত একজন মুরুব্বীর কাছে।

– আপনার ডাক্তারকে দেখলাম, তিনি আমার চেয়ে বেশী মুরুব্বী।

– চিকিৎসক তো, তাঁর কাছে রোগ লুকাতে পারি না।

অতঃপর তিনি রোগের নাম উচ্চারণ না করে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্রের ফাইল আমার হাতে দিয়ে বললেন, এতে সবই লেখা আছে। আমি ফাইল হাতে নিতে নিতে বললাম, আমি তো এ লাইনের লোক নই, এসব কাগজপত্র পড়ে কি আমি বুঝব? তিনি বললেন, খুব বুঝবেন, খুঁটিনাটি না বুঝলেও রোগের নাম জানতে পারবেন। সব কাগজপত্র দেখলাম এবং মোটামুটিভাবে বুঝলাম যে, তিনি গনোরিয়া সিফিলিস জাতীয় রোগে ভোগছেন।

ফাইল তার কাছে দিয়ে বললাম, নিরাময় সম্পর্কে চিকিৎসক কি বলছেন?

– চিকিৎসক বলছেন, ক্লিনিকে আরও দুসপ্তাহ থাকতে হবে, ছয় মাসের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ আরোগ্যও লাভ করতে পারব বলে চিকিৎসকের অভিমত।

– আরোগ্য লাভের জন্য তিনি কি আর কোন শর্ত আরোপ করেননি?

– না, শর্তটি কি?

– শর্তটি হচ্ছে, আপনাকে কঠোর সংযমী হতে হবে। যে পথে চলে আপনার এ রোগ হয়েছে, সে পথে আর কখন যেতে পারবেন না।

–হাঁ, তাও বলেছেন।

– আপনার সিদ্ধান্ত কি?

– এই দেখুন, আমি দুকানে ধরলাম। আর কখন এ পথে চলবো না।

– ছি ছি! একি করছেন, কানে ধরলেন কেন?

– মনে মনে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করুন। তওবা করে সৎ জীবন যাপন করতে শুরুকরুন।

– পাশের মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে তওবা করেছি।

– তওবা আপনার। তওবা করবেন আল্লাহর কাছে। ইমাম সাহেবের কাছে যাওয়ার তো প্রয়োজন ছিল না।

– তাঁকে সাক্ষী রাখলাম।

– যাক ভালই করেছেন। কিভাবে এই রোগ সৃষ্টি হল তাকি বলবেন?

www.nagorikpathagar.org

– আর বলবেন না, সে অনেক কথা।

তারপর তিন সব কাহিনী খুলে বললেন। জেলা শহরে থাকতে কি করতেন, রাজধানীতে এসে কিভাবে জীবন শুরু করেন। তার ছাত্রাবাস সংলগ্ন পতিতালয়ের কথা বললেন, সেই জাহান্নামে তার নিয়মিত যাতায়াতের কথাও বললেন। ডিগ্রী পাস না করার কারণ এবং বর্তমানের তার রাজনৈতিক জীবনধারার কথাও বললেন। যেসব সূত্র থেকে তার সম্পর্কে আমি বিচিত্র তথ্য অবগত হয়েছি, তার দেয়া বয়ানের সঙ্গে প্রায়ই মিল দেখলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

– তাহলে বলা যায়, ঢাকায় আসার পর পতিতালয়ই আপনার ক্ষতি করেছে?

– ক্ষতির কথা কি বলছেন? আমাকে শেষ করেছে, স্বাস্থ্য ও সম্পদের দিক থেকেও শেষ করেছে। পতিতালয় আমাকে ও আমার সহপাঠীদের অনেককে মস্তান বানিয়েছে। এ ছাত্রাবাসে যত ছাত্র ছিল, সবাই এ বদভ্যাসে অভ্যস্ত ছিল। তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি আমার মত হয়েছে কিনা তা জানি না, তবে তারা আমার সাথে রাজনীতি করছে।

– কি রাজনীতি করছে? এটার নাম রাজনীতি, না আত্মঘাতী নীতি? এ রাজনীতির মাধ্যমে আপনার জীবন গঠন কি কখনও সম্ভব হবে? ভাই-বোনদের মধ্যে আপনি তো সকলের বড়। তাদের প্রতি আপনার কিছুটা দায়-দায়িত্ব আছে। আপনার বাবার মৃত্যুর পর আপনাকেই পরিবারের হাল ধরতে হবে। এসব কথা কি চিন্তা করেন?

– খুব বেশী চিন্তা করি।

– বাংলাদেশে যে রাজনীতি চলছে, সে রাজনীতি নেতা-নেত্রীকে বানায় রাজা-রাণী আর জনগণকে বানায় ফকির। একথা কি বুঝেন?

– বুঝি।

– তবুও কেন তা করেন?

– তাও বুঝি না?

– এ প্রসঙ্গ আজকের জন্য থাক। এবার বলুন তো পতিতালয় সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা, মন্তব্য ও অভিমত কি? আমাদের দেশের পতিতালয়গুলো সম্পর্কে আপনার বর্তমানের উপলব্ধি কি?

তিনি অনেক কথাই বললেন। কিভাবে ছাত্রাবাসের ছাত্ররা এদের ভোগ করতেন। ভোগ করতে গিয়ে কি কি ঘটনা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, পুলিশের

www.nagorikpathagar.org

তাড়া খেয়েছেন, এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছেন, সবিস্তারে সবই বললেন।

আমার সঙ্গে তার দীর্ঘ কথোপকথন হয়েছে। এমন অনেক কথা বলেছেন যা তার ক্ষেত্রে অতি সত্য, কিন্তু অতি অশ্লীল। তার জীবনের এ অধ্যায়ের নোংরা দিকগুলো ব্যাখ্যাসহ জানার কোন প্রয়োজন নেই পাঠকদের। তাই আমি এ দিকটার সংলাপ উল্লেখ করলাম না। যে কথাগুলো পাঠকদের প্রভাবিত বা আক্রান্ত করবে না, শুধু তাই উল্লেখ করলাম।

– দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক পতিতালয় আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই তো এই জাহান্নামে যায় না। আপনার মত কিছু ছাত্র এ পথে গিয়ে নষ্ট হয়েছে, কিন্তু রাজধানীর লাখ লাখ ছাত্র এ পথও মাড়ায় না। নিজেকে সামলাতে জানলে অনেক অপকর্ম থেকে বাঁচা যায়। তাকি স্বীকার করেন?

– স্বীকার করি। কিন্তু নিজেকে সামলাবার শক্তি প্রত্যেকের সমান থাকে না। আমি এদিক দিয়ে দুর্বল ছিলাম বলেই তো আজ এমন দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা এবং রাষ্ট্র প্রশাসনের সহযোগিতা আর স্বীকৃতি নিয়ে বেড়ে ওঠা পতিতালয়গুলো অনেকের দুঃসময়ের আশ্রয়স্থল, চিত্ত-বিনোদনের নিরুপদ্রব ও নির্ভরযোগ্য নিলয়। এ পতিতালয়গুলো যদি সৃষ্টি ও লালন-পোষণ করে সক্রিয় না রাখা হত, তাহলে দুর্বল এবং দূষিত চরিত্রের লোকও এ পাপে নিমজ্জিত হত না। বাজারে যে বস্তু থাকে না, তার ক্রেতাও থাকে না। বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তি কি নিষিদ্ধ?

– এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে খুবই কঠিন। ১৯৩৩ সনের 'দি বেঙ্গল সাপ্রেশন অব ইম্‌মোরেল ট্রাফিক এ্যাক্ট' বাংলাদেশ সরকারও সযতনে আঁকড়ে ধরে আছেন। এ আইন জোড়াতালি দিয়ে চালু রাখা হয়েছে। আমরা বৃটিশকে তাড়িয়েছি। কিন্তু বৃটিশের দ্বারা স্থাপিত পতিতালয়গুলো বন্ধ করা হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পতিতালয়গুলোর ফটকে তালা লাগেনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রেসিডেন্টের ৪৮নং আদেশ বলে বৃটিশ আইনের শুধু নবায়ন করা হয়। আইনে আছে, কেউ যদি পতিতালয় হিসাবে ব্যবহারের জন্য নিজের জায়গা বা বাড়ী ব্যবহার করে বা এ উদ্দেশে ভাড়া দেয়, তবে তার শাস্তি দুবছর কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা উভয়ই। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে শাস্তি পাঁচ বছর জেল অথবা জরিমানা। যে ভাড়া দেয় বা নেয়, উভয়ই শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে থাকে। কিন্তু আফসোস, এ পর্যন্ত এমন কোন বাড়ীর মালিক এ অপরাধে গ্রেফতার হয়েছেন বলেও আমি জানি না। আইনে আছে, পুলিশ সুপার যদি

www.nagorikpathagar.org

জানতে পারেন যে, স্কুল, মাদ্রাসা, ছাত্রাবাস, আবাসিক এলাকা, প্রমোদ এলাকা অথবা প্রকাশ্য রাস্তার পাশে একটি পতিতালয় আছে, তাহলে তিনি সরিয়ে নেয়ার জন্য নোটিশ দেবেন এবং পতিতালয়ের তদন্ত করতে ইন্সপেক্টর অব পুলিশের নীচের কেউ পারবেন্ না।

– ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? আপনিই বলুন।

– ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই, একদিকে পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের আইন, এ কাজে ঘর ভাড়া না দেয়া ও না নেয়ার আইন আর অন্য দিকে পতিতালয় স্থানান্তর করা যাবে এ আইন–পরস্পর বিরোধী আইন বলবৎ আছে। এসব আইন তো পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধের আইন নয়, এ জঘণ্য বৃত্তি জিইয়ে রাখার আইন।

– আমি তো জানি, এ রাজধানীতে যতটি পতিতালয় আছে, সবই আবাসিক এলাকায়। কয়েকটি ছাত্রাবাসের পাশেই রয়েছে পতিতালয়। একটি মসজিদের সামনেই আছে পতিতাদের নিবাস। আমাদের ছাত্রাবাসের পাশেই ছিল একটি পতিতালয়। আজও সেই পতিতালয় আছে। শুনেছি সরকারী জরীপে নাকি পতিতালয়ের খদ্দেরদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যাই বেশী।

– হাঁ, তাই। ছাত্রদের হার শতকরা ৪৩.৮৩ আর ১২.৩৩ ভাগ তাদের সংখ্যা, যাদের নাম উচ্চারণ করলে 'সরিষার মধ্যে ভূতের বাস' প্রবাদ বাক্যটি স্মরণে আসে। আইনে আছে, পতিতার আয়ের উপর যে নির্ভর করবে, তার শাস্তি ৩ বছর জেল ও ১ হাজার টাকা জরিমানা, তবে পতিতার মা ও সন্তান এবং তার উপর নির্ভরশীলরা কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কিন্তু তারা পতিতার পতিতাবৃত্তিতে সহযোগিতা করলে বা খদ্দের যোগাড় করে আনলে তাদেরও একই শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ, তারা পতিতার রোজগার খাবে, কিন্তু পতিতার রোজগার বৃদ্ধির চেষ্টা করতে পারবে না। এ আইনে পতিতার কোন শাস্তি নেই। পতিতার খদ্দেরদেরও কোন শাস্তি নেই। আইনে আছে, দুই বা ততোধিক মেয়েকে নিয়ে কোথাও পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকলে একে পতিতালয় বলা হবে। এ আইনকে ফাঁকি দেয়ার জন্য একটি মেয়েকে নিয়ে যদি কেউ এ ব্যবস্যা করে অথবা তিনটি ফ্লাটে তিনটি মেয়েকে নিয়ে কেউ ব্যবসা শুরু করে, তাহলে আইন তাকে বাধা দিতে পারবে না। ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশের ৬০ নং ধারায় বলা হয়েছে, কোন মেয়ে যদি স্বেচ্ছায় পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে চায়, তাহলে কোর্টে তাকে সশরীরে হাজির হয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং পতিতালয় স্থাপিত হবে একটি নির্দিষ্ট এলাকায়।

– আজব আপনাদের আইন। একদিকে উচ্ছেদের আইন, অন্যদিকে নির্দিষ্ট

www.nagorikpathagar.org

এলাকায় পতিতালয় স্থাপনের কানুনী অনুমতি। স্ববিরোধিতা আর কাকে বলে? 'স্বেচ্ছায় পতিতাবৃত্তি গ্রহণ'-একথা শুনে শয়তানও বোধহয় হাসে। স্বেচ্ছায় কি কোন মুসলমান মেয়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে? শিকারীদের জালে আটকিয়ে জোর করে সম্মতি আদায় করা হয়। স্বেচ্ছায় কেউ এ পথে আসে না।

– স্বেচ্ছায় কেউ এ পথে আসে না, এ কথার সবটুকু সঠিক নয়। কেউ কেউ এ পথে স্বেচ্ছায় আসে। আপনি তো মুসলমান। স্বেচ্ছায় কেন এ পথে গেলেন? আপনাকে তো কেউ এপথে চলার জন্য জালেও আকটায়নি এবং আহবানও জানায়নি। তাহলে কেন গেলেন? যৌনজ্বালায় উন্মাদ যেমন এক শ্রেণীর পুরুষ থাকে, তেমনি থাকে এক শ্রেণীর নারীও।

– মানলাম আপনার কথা। আমার দিকটা ভাবুন। আমাদের ছাত্রাবাসের পাশে যদি পতিতালয় না থাকত, তাহলে আমি এ বদভ্যাসে অভ্যস্ত হতাম না। সুযোগের আকর্ষণ খুবই প্রবল। সে সুযোগ যদি ভাল ও মহৎ ধরনের কিছু হয়, তাহলে ভাল ও মহৎ লোকেরা এদিকে ধাবিত হয়। যদি সে সুযোগ মন্দ ও অসৎ হয়, তাহলে এদিকে ধাবিত হয় মন্দ ও অসৎ লোক। আমরা তো শহর জীবনে এসে এগুলো দেখে বরং তাজ্জব হয়েছি। যে রাজধানী থেকে পাপ আর পাপীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর কথা, সে রাজধানীতেই পাপ আর পাপীদের লালন করা হয়। এ খবর যখন প্রথম জানলাম, তখন অবাক হলাম। রাজধানীতে এসে স্বচক্ষে দেখলাম। অতঃপর ভাবতে বাধ্য হলাম যে, আমাদের মুরুব্বীরা আইন-কানুনের বেড়া দিয়ে এসব সাজিয়ে রেখেছেন আমাদের চিত্তবিনোদনের জন্য। সিনেমা হলে টিকেট কিনে প্রবেশের ব্যবস্থা আপনারা রেখেছেন, তেমনি পতিতালয়ে অর্থের বিনিময়ে প্রবেশের ব্যবস্থাও রেখেছেন আপনারাই। তাই এ ব্যবস্থাকে আমরা সমাজস্বীকৃত ও রাষ্ট্রস্বীকৃত চিত্তবিনোদনের একটা সাধারণ অঙ্গন মনে করেছি। পতিতালয় উচ্ছেদ আন্দোলন শুরু হলে আপনাদেরই এক অংশ তা কায়েম রাখার জন্য বিপরীত আন্দোলনে নামেন। তারা বলেন, পতিতারা নাকি সমাজের সেফটি বাল্ব, সমাজের ভারসাম্য তারা রক্ষা করছে। যুবকদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য নাকি পতিতারা বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পতিতাবৃত্তির পক্ষে সাফাই গাওয়া দেখে মনে করতাম, পতিতালয়গুলো সমাজে থাকাটা তাহলে অন্যায় নয় বরং সঠিক। তাই আমরা আপনাদের গলাবাজি আর কলমবাজিতে বিশ্বাস করে সিনেমা গৃহে সহজ যাতায়াতের মত পতিতালয়ে যাতায়াতও সহজ এবং বিনোদনমূলক মনে করতাম।

– আপনি তো লম্বা একখানা লেকচার ছাড়লেন। আমিও পতিতা আইন

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে অনেক কথা বললাম, লেকচার দিলাম। কিন্তু এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কোন বাদানুবাদ তো হলো না বরং একপক্ষেই দু'জন বললাম। দুজনের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন, এ সমুদ্দুরে আমি ঝাঁপ দেইনি, আপনি ঝাঁপ দিয়েছেন।

– এজন্য আমরা কি সম্পূর্ণ দায়ী?

– দায়ী আপনারা নন, দায়ী হচ্ছে আমাদের সমাজ আর সরকার। পতিতারাই হচ্ছে সিফিলিস আর গনোরিয়া রোগের জীবাণুবাহী। এইডস রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পতিতা। আপনি বলেছেন, পতিতালয়ে যাতায়াত করেই আপনি এবং আপনার মত অনেকেই দেহ–মনে শেষ হয়েছেন। এক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা প্রচুর। এবার আপনি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের উদ্দেশে কিছু বলুন, যারা আপনার মতই এ বদভ্যাসে লিপ্ত আছে। এ ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলবেন, এ ব্যাপারে আপনার নতুন উপলব্ধিইবা কি?

– দেহ–মনে সুস্থ থাকতে চাই, কিন্তু সমাজ আর সরকার তা দিচ্ছে না। এই সমাজ আর সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চাই।

– কিন্তু আপনি কিভাবে সংগ্রাম করবেন? আপনি যে দল করেন, সে দলই তো পতিতা–শিল্প আর পতিতা–সংস্কৃতির উন্নয়ন চায়। আপনি পারবেন তাদের বিরুদ্ধে লড়তে?

–না, পারবো না। আমার এত ক্ষমতা নেই।

– তাহলে কি করবেন?

– আগে আমি সুস্থ হই।

– সুস্থ হওয়ার পর আপনার পরিকল্পনা কি হবে?

– পরিকল্পনা যা ছিল, সব ওলটপালট হয়ে গেল।

– কিভাবে ওলট পালট হল?

– কিভাবে ওলট–পালট হলো তা জানি না, তবে এজন্য আপনি দায়ী?

– তাহলে আপনার ক্ষতিই করলাম, তাই না?

– ক্ষতি তো নয়ই, আমাকে বাঁচিয়েছেন।

– আমি নই, তা করেছেন আল্লাহ। অবশ্য মনটা যদি আবার সাবেক অবস্থায় ফিরে যায়, তাহলে আমি হবো আপনার বড় দুশমন।

– বোধহয় মনটা সাবেক অবস্থায় ফিরে যাবে না আর আপনিও আমার দুশমন হবেন না।

– আল্লাহ যেন তাই করেন।

www.nagorikpathagar.org

– আমি যে হিংস্র মস্তান হয়েছি চরিত্র বরবাদ করে, তার সূচনা ঘটে পতিতালয় থেকে। এজন্য এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, পতিতাদের সাহচর্য আমাকে মস্তান বানিয়েছে।

– অনেক কথা হল, এবার যাই। এই নিন আমার অফিসের ও বাসার ঠিকানা। ক্লিনিক থেকে ছাড়া পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

– অবশ্যই দেখা করব। শুধু দেখাই করব না, আপনাকে গাইড হিসাবে বরণ করে নিয়ে অহরহ জ্বালাতন করব। আমার হিংস্র আচরণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, সে কাহিনী তো শুনলেন না।

আমি তার এ কথায় কান দিলাম না। কারণ, এ ব্যাপারে আমি বিস্তারিত জানি। তবুও বললাম, অন্য দিন শুনব। করমর্দন করে যখন আমি কক্ষ ত্যাগ করতে যাচ্ছি, ঠিক তখনই তিনি আমার পথ আগলে নাটকীয় ভঙ্গিতে আমার কদমবুছি করলেন। আমি দুহাত দিয়ে তাকে বাধা দিলাম, কিন্তু তিনি জোর করে কদমবুছি করলেন। তিনি বললেন, এতে কোন অভিনয় নেই, এ দ্বারা আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম আর আমি পেলাম মানসিক সান্ত্বনা।

এরপর তার সংগে বহুবার আমার দেখা হয়েছে। ভিন্ন মানুষ হিসাবে দেখেছি। ঢাকা ছেড়েছেন। সুস্থ হয়েছেন দেহ ও মনে। তার সম্পর্কে শুধু এটুকু জানি, তিনি দেশে জোতজমি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েছেন। সংসারী হয়েছেন, তিন সন্তানের জনক হয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

টেলিভিশন আমাকে মস্তান বানিয়েছে

এক আইনজীবীর পাঁচ পুত্র সন্তানের মধ্যে তৃতীয় সন্তান মস্তান। আইনজীবীই একথা আমাকে বললেন। আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম আমার এক আত্মীয়ের মামলার খোঁজ-খবর নিতে। মোটামুটিভাবে বলা যায় তিনি ব্যস্ত আইনজীবী। তাঁর ৫/৭ জন জুনিয়র আছেন। বাসায়ই মূল চেম্বার। এর আগে আমি তাঁর সংগে মোটেই পরিচিত ছিলাম না। তিনি যখন জানতে পারলেন আমি একজন সাংবাদিক, তখন দেশ ও সমাজ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। আমার মনে হল, আজ তাঁর ব্যস্ততা কম। তাছাড়া মনটা হাল্কা করার জন্য ধরাবাঁধা প্রোগ্রামের প্রোগ্রামের বাইরে কিছুক্ষণ বিচরণ করতে চান। আমারও এ অভ্যাস আছে। ভীষণ ব্যস্ত থাকা অবস্থায়ও শিশুদের কাছে পেলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় বা খেলায় লেগে যাই। মনটা হাল্কা হলে আবার কাজে ডুবে যাই। উকিল সাহেবকেও এ প্রকৃতির মানুষ বলেই বোধ হল। আমরা দুজনে কথা বলছি, এমন সময় তাঁর পিয়ন এসে বলল, বারান্দায় মহল্লার ৫/৬ জন লোক দাঁড়িয়ে আছেন, তারা উকিল সাহেবের সংগে কথা বলবেন। তিনি আমাকে বসতে বলে বারান্দায় গেলেন। মহল্লার ৫/৬ জন লোক তাঁর সঙ্গে যা আলাপ করলেন, তা আমি সবই শুনলাম। কারণ, তাঁর চেম্বার বারান্দার অতি নিকটবর্তী। অতএব, কথাবার্তা সবই কানে আসল। কথাবার্তার সারকথা হল, কিছুক্ষণ আগে উকিল সাহেবের তিন নম্বর পুত্রধন মহল্লার দক্ষিণ পার্শ্বের রাজপথে তিন জন সাথী নিয়ে একটা হাইজ্যাক ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনাচক্রে ছিনতাইর শিকার দম্পতি এ মহল্লায় থাকেন। মহিলার ভ্যানিটিব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। তিনি উকিল তনয় এবং তার সাথীদের চিনেছেন। আইনজীবী পিতার কাছে হাইজ্যাকার সন্তানের বিচার এসেছে। তিনি আশ্বাস দিলেন, সকালেই এর ফয়সালা করে দেবেন। আজ রাতটা শুধু অপেক্ষা করতে বললেন। মহল্লাবাসী বিদায় হয়ে চলে গেলেন। ভ্যানিটিব্যাগটা হাইজ্যাক হওয়া নাকি তাঁদের জন্য বড় কথা ছিল না, ব্যাগটির মধ্যে মাত্র তিনশত টাকা ছিল। ব্যাগটিও পুরাতন। তাঁদের অভিযোগ হলো, মহল্লার ছেলে হয়ে, বিশেষ করে উকিল সাহেবের ছেলে হয়ে মহল্লার এক দম্পতির সঙ্গে এ ঘটনা কিভাবে ঘটাতে পারল?

উকিল সাহেব চেম্বারে ফিরে এসে কপালের দুপাশে দু হাতের তালু চেপে আমাকে বললেন, বিশ্বাস করুন সাংবাদিক সাহেব, বাঁচতে আর ইচ্ছা হয় না।

www.nagorikpathagar.org

একটি ছেলে আমাকে যা জ্বালাতন করছে তা রীতিমত অসহ্য। ওর মা তো হাইপারটেনশনে ভুগেছেন ওর জন্য। বিদেশে পাঠাবার দু'বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। সে বিদেশে যাবে না। বলুন তো, আমি কি করি?

উকিল সাহেব ছেলের কুকীর্তির ৬/৭ টা শিহরণমূলক ঘটনা বললেন অত্যন্ত মুক্ত মনে, যা সাধারণত কোন বাবাকে এভাবে খোলাখুলি বলতে আমি দেখিনি। উকিল সাহেবের মনের গহিন থেকে শুধু ঢেউ উঠছে। প্রচন্ড আঘাতে তিনি ভেঙ্গে পড়ছেন। কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। আমাকে তিনি ছাড়তে চাচ্ছেন না। আমি তাঁকে অনেক প্রবোধ দিলাম। আশ্বাস দিয়ে বল্লাম, আপনার ছেলেকে আমার হাওয়ালায় এক মাস ছেড়ে দিন। আমি চেষ্টা করে দেখি লাইনে আনতে পারি কিনা। উকিল সাহেব আবেগে বললেন, একমাস কেন, সারাজীবনের জন্য নিয়ে যান। তার ভাত-কাপড়ের খরচও আমি বহন করব, আমার আর সহ্য হয় না। কিভাবে যে এইচএসসি পাস করল তাও বুঝি না। লেখাপড়া আর করাতে পারিনি। মাঝে মাঝে ৫/৭ দিন উধাও হয়ে যায়, তারপর বাসায় ফিরে আসে। বলুন তো, এখন মারধর করার কি বয়স? আমার এক ভায়রার ছেলে তার মাথা খারাপ করেছে।

দিনটি ছিল সরকারী ছুটির দিন। চেম্বারে জুনিয়ররা ছিলেন না। বিদায় নেয়ার আগে বললাম, ছেলেটির সঙ্গে কিছু কথা বলার সুযোগ আমাকে দিন। আপনি দোয়া করুন, সে হয়ত নিরাময় হতে পারে।

উকিল সাহেব বললেন, আমার সামনে সে গুডবয়। এখানে সেখানে কোন কাজে পাঠালে ঝড়-তুফানের মধ্যেও সে যায়। ঠিক আছে, আপনার বাসার ঠিকানা আমাকে দিন। আমি কোন একটা কাজ দিয়ে আপনার বাসায় পাঠাব। কি বারে যাবে বলে দিন।

আমি তারিখ, বার ও সময় দিলাম। অতঃপর বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরলাম। সত্যিই নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে সে এসে হাজির। আমি তাকে আর কোনদিন দেখিনি। উকিল সাহেবের চিঠি পাঠ করেই তাকে চিন্লাম।

কে একজন বেল টিপলো। দরজা খুললাম। লম্বা চুলওয়ালা এক যুবক, প্রায় ছয় ফুট লম্বা। আমাকে সালাম দিয়ে জানতে চাইল আমি জহুরী সাহেব কিনা। বললাম, হাঁ, আমি জহুরী। সে একখানা চিঠি আমাকে দিল। চিঠি হাতে নিয়ে দেখলাম, এনভেলাপের একপাশে উকিল সাহেবের নাম। যুবককে ঘরে আসতে বললাম। সে ঘরে আসল. বৈঠকখানায় বসল। কোন আলোচনায় না বসে প্রথমে

www.nagorikpathagar.org

চা পানে আপ্যায়িত করলাম। দুপুরে সে আমার সঙ্গে খাবে তা জোর করে রাজী করালাম।

চা নাস্তার পর প্রথমেই তিনি কি করেন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদিও তার সম্পর্কে আমার সবই আগে জানা হয়ে গেছে।

– লেখাপড়া কি করছেন?

–না।

– তাহলে কি করছেন? চাকুরী না ব্যবসা?

– না, তাও করছি না।

– সে কেমন কথা? একটা কিছু তো করবেন? শুনলাম আপনার বড় ভাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। দু নম্বর ভাই বিদেশে লেখাপড়া করছেন। আপনার নম্বর তো তৃতীয়। আপনি কিছু না করলে পিছনে যে পড়ে থাকবেন।

– কিছুই ভাল লাগে না।

– কি বলেন, কিছুই আপনার ভাল লাগে না?

– জ্বি না।

– কী করতে আপনার মন চায় বলুন তো আমার কাছে খোলাখুলি। আমি আপনাকে সর্বাত্মক সাহায্য করব।

– আমি বিদেশে যেতে চাই।

– ভাল কথা। লেখাপড়া যখন করছেন না, তখন বিদেশে যাওয়া ছাড়া হয়ত কোন বিকল্পও নেই। কিন্তু আমি শুনলাম, আপনার বাবা নাকি দু'বার চেষ্টা করেছেন আপনাকে বিদেশে পাঠাবার জন্য। কিন্তু আপনি রাজী হননি?

– হায় হায়। আপনি এখবরও জানেন দেখছি। আমি রাজী হইনি এজন্য যে, আরবদেশে গিয়ে শ্রমিকের কাজ আমি করতে পারবো না। কানাডা, জার্মান, অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকায় পাঠালে অবশ্যই যাব।

– সেসব দেশে তো আপনাকে কেউ ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী দেবেনা।

– তবুও

– ঠিক আছে, আপনার আব্বার সঙ্গে আলাপ করে দেখি। আমি তাঁকে রাজী করাতে সক্ষম হব বলে আশা করি। ইনশাআল্লাহ।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে তিনি বিদায় হয়ে গেলেন। যাবার আগে তাকে বললাম, অতি শীঘ্রই আপনাকে বিদেশে পাঠাবার চেষ্টা করব। কিন্তু একটি কথা, আজ থেকে শুরু করে বিদেশ যাওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত কোন গোলমাল করতে পারবেন না। কোন নালিশ যেন আপনার বিরুদ্ধে না আসে। যদি এভাবে কয়েকদিন

www.nagorikpathagar.org

চলতে পারেন, তাহলে আপনার বিদেশ যাওয়ার আশা পূর্ণ হবে। তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এর প্রায় ৭/৮ দিন পর উকিল সাহেব আমাকে টেলিফোনে বললেন, আপনি কি মন্ত্র দিয়েছেন ভাই, তা জানি না। সে এখন বাসায়ই থাকে। আগের চরিত্র নেই। বেশ শান্ত। বুঝলাম না ব্যাপার?

– উকিল সাহেব, আমার চিকিৎসা খরচ দিতে হবে। একদিন এসে নিয়ে যাব।

– কত রেডি রাখব? পাঁচ হাজার? দশ হাজার? আমি রাজী। তবুও আমার সন্তান ভাল হয়ে যাক।

– ঠিক আছে, আমি আগামী শুক্রবার বাদ মাগরিব আসব। জরুরী কথা আছে। এখন টেলিফোন ছাড়ি।

উভয়ই টেলিফোন রাখলাম। নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর বাসায় পৌঁছলাম। ঐ রাতে মনে হল আমি তাঁর মক্কেল নই বরং তাঁর এক বিশিষ্ট সম্মানিত মেহমান। উকিল পত্নী এসে রীতিমত আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর মস্তান ছেলেও আমাকে সালাম করল। তারপর উকিল সাহেব আর তাঁর গিন্নীর সঙ্গে ছেলের বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আলাপ করলাম। তারা দু'জনই প্রস্তাব দেয়ার সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলেন। উকিল সাহেবের এক ভাই থাকেন আমেরিকায়। বেচারা নিঃসন্তান। তাকে উকিল সাহেব কালই লিখবেন বলে জানালেন। তারপর খাওয়ার জন্য ভীষণ পীড়াপীড়ি। আহার করলাম। আহারের পর উকিল সাহেব তাঁর গাড়ী দিয়ে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিলেন। এর ঠিক ২৫ দিন পর আমেরিকা থেকে উকিল সাহেবের ভাই কাগজপত্র পাঠিয়ে দিলেন। আবার আমার ডাক পড়ল। গিয়ে দেখলাম জরুরী কাগজপত্র এসেছে। এ ব্যাপারটা খুব গোপন রাখতে বললাম। কারণ, তাঁর ভায়রা-পুত্র তা জানতে পারলে ক্ষতি করতে পারে। কয়েকদিন পর যুবকটি এ্যামবেসীতে গিয়ে দাঁড়াল। ভিসা পেল। যাত্রার দিন-তারিখ ঠিক হয়ে গেল। যাত্রার পূর্বদিন আমার বাসায় যুবককে দাওয়াত করলাম। সেদিনই খাওয়া-দাওয়ার পর তাকে নিয়ে বাসার ছাদে গেলাম। শুনলাম তার মস্তান হওয়ার পটভূমি। জীবনটা প্রথমে নষ্ট করেছে অবচেতনভাবে টেলিভিশন আর সচেতনভাবে নষ্ট করেছে তার খালাতো ভাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম–

– টেলিভিশন কিভাবে আপনাকে নষ্ট করল সে কাহিনী খুলে বললে আমি খুবই খুশী হব।

৮

www.nagorikpathagar.org

– বলছি, তবে এখন আমি টেলিভিশন দেখার সময়–সুযোগ পাই না।

– অন্য ব্যস্ততায় ব্যস্ত থাকেন বলে? যুবকের নির্বাক আনত দৃষ্টি এবং সলজ্জ মুখ।

– টেলিভিশন আমার জীবন বরবাদ করেছে। এখন তা বুঝি। এর প্রভাব যে কত শক্তিশালী তা হাড়ে হাড়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

– টেলিভিশন তো প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই আছে, তার খারাপ প্রভাবও আছে, কিন্তু টেলিভিশন ঘরে থাকলেই যে সবাই খারাপ হয়ে যাবে, তা তো ঠিক নয়।

– অন্যের কথা বলছি না, আমি যে খারাপ হয়ে গেছি এটাই ঠিক। ভাইরাসে সবাই আক্রান্ত হয় না। সকলের দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তিও সমান নয়।

– টেলিভিশনকে আপনি এখন কোন্ নজরে দেখেন আর আগেই বা কোন নজরে দেখতেন?

– রেডিও পরিবেশিত নানা যৌন আবেদনমূলক গান আর প্রেম–সংলাপ আমাদের তারুণ্যের খুনকে উত্তপ্ত করতে পারলেও ঘরছাড়া করে বাইরে নাচাতে পারেনি, কিন্তু টেলিভিশন বাইরে নাচাতেও সক্ষম হয়েছে। টেলিভিশন হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন সিস্টেমের একটি স্কুলের মত। সে স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে গোটা বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক নাগরিকই এ স্কুলের ছাত্র। বয়সের কোন বালাই নেই, শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই ছাত্র। রোজ রোজ যারা টেলিভিশন দেখেন, তারা নিয়মিত ছাত্র, আর অনিয়মিত যারা দেখেন, তারা অনিয়মিত ছাত্র। টেলিভিশনের শিক্ষার এত ভয়ঙ্কর প্রভাব যে, তিন বছরের শিশু থেকে তিরাশি বছরের বুড়া–বুড়ীও হন প্রভাবিত।

টেলিভিশনের শিক্ষা–কারিকুলাম অদ্ভুত রকমের বৈচিত্রপূর্ণ। তালে তাল রাখতে গিয়ে একদিকে আমাদের নৃত্যের তালে তালে নাচাচ্ছে, আবার কুরআন তালিমও দিচ্ছে। একদিকে নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধের আহবান জানাচ্ছে, অপরদিকে সংস্কৃতির নামে ছেলে–বুড়া সকলের নৈতিক অবক্ষয়ের যাবতীয় প্রোগ্রাম প্রতিদিন আঞ্জাম দিচ্ছে। রেডিও যা পারেনি, টেলিভিশন তাই পারছে। রেডিও হচ্ছে শব্দযন্ত্র, কিন্তু টেলিভিশন হচ্ছে শব্দসহ সচল জীবন প্রদর্শনের যন্ত্র। তাই রেডিওর ক্ষমতার চেয়ে টেলিভিশনের ক্ষমতা ডবল। রেডিও অন করে শুধু শুনতাম, কিন্তু কিছুই দেখতাম না। সেই না দেখার বঞ্চনা টেলিভিশন দূর করে দিয়েছে। বিভিন্ন সিনেমা হলে প্রদর্শিত মারদাঙ্গা সিনেমার সঙ্গে টেলিভিশন

www.nagorikpathagar.org

রীতিমত পাল্লা দিচ্ছে। এ পাল্লাপাল্লির জন্যই বোধহয় টেলিভিশনে ইংরেজী সিনেমাগুলো প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আমরাও সেই তালে তালে নাচতে শুরু করি, এখনও নাচছি, হয়ত আগামীতে আরও বেশী করে নাচতে থাকব। বেতারের গান, বিজ্ঞাপনও নাটক প্রেমের যে মাদকতা সৃষ্টি করেছে, সিনেমা তা হাতে-কলমে মহড়া দিয়ে প্রেমের নিকুঞ্জ বনে হারিয়ে যাওয়ার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তাতেও বোধহয় সরকারের মন ভরেনি। সরকার মনে করলেন, প্রেমের এসব ব্যাপার-স্যাপার সার্বজনীন করে তোলা দরকার। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে প্রেমের কিন্ডারগার্টেন তালিম যদি সংস্কৃতি ও চিত্তবিনোদনের নামে শুরু করা না যায়, তাহলে এ জাতটাকে নৈতিক দিক দিয়ে নির্জীব করা যাবে না। বোধকরি এ অভিপ্রায়ে ঘরে ঘরে টেলিভিশন পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন সরকার। টেলিভিশন কাউকে বানিয়েছে ফুল মস্তান, কাউকে বানিয়েছে হাফ মস্তান, কাউকে বানিয়েছে তার চেয়েও কম, কিন্তু সকল দর্শককে টেলিভিশন কম-বেশী প্রভাবিত করেছে, তা মেহেরবানী করে কেউ যেন অস্বীকার না করেন।

– আপনাকে টেলিভিশন কিভাবে নষ্ট করল, সে কথা বলুন।

– হাঁ, সে কথাই বলছি। আমার ছোট বেলার কথাই বলছি; তখন আমাদের বাসায় টেলিভিশন ছিল না। আমি আর আমার ভাই-বোন সুযোগ পেলেই টেলিভিশন দেখার জন্য যেতাম পাশের বাসায়। মা-বাবা নিষেধ করতেন না বটে; কিন্তু এভাবে অন্যের বাসায় যাই, তা পছন্দও করতেন না। ঐ বাসার লোকজনও পছন্দ করতেন না এভাবে সব সময় তাদের বাসায় টেলিভিশন দেখতে আসি। একদিন মা-বাবা এ সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসলেন। আমি টেলিভিশনের জন্য আবদার করলাম। মা-বাবা রাজী হয়ে গেলেন। দু-তিন দিন পর মা-বাবা খুব শখ করে রঙিন ছাব্বিশ ইঞ্চি টেলিভিশন কিনে ড্রয়িং রুমে বসালেন। পাশের বাসায় সাদা-কালো বিশ ইঞ্চি টেলিভিশন। আমাদের টেলিভিশন ছাব্বিশ ইঞ্চি, তাছাড়া রঙিন। কি আনন্দ আমাদের। চেনাজানা নিকট পড়শীদের মধ্যে যাদের টেলিভিশন নেই, তাদেরও ডাকা হল, মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হল। সবাই আসলেন, বসলেন, দেখতে লাগলেন। লগ্নটা শুভই ছিল বলা চলে। কারণ, যে মুহূর্তে টেলিভিশন অন করা হল, তার প্রায় দশ মিনিট পর একটা বাংলা সিনেমা শুরু হল। কিছুক্ষণ চলার পর একটি দৃশ্য আসে। নায়ক-নায়িকা জড়াজড়ি, ঢলাঢলি আর হাত ধরাধরি করে প্রেমানন্দে উছলে পড়ছেন। নায়িকা দৌড় দিয়ে একটি গাছের আড়ালে চলে গেলেন, নায়ক গেলেন নায়িকাকে ধরতে। নায়িকা দৌড় দিয়ে পালাতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

নায়ক ঝাঁপ দিয়ে নায়িকার উপর পড়লেন। তারপর সে অবস্থায় দু'জনের কি অট্টহাসি। আমার মা ছি-ছি করে উঠলেন। সোজা দাঁড়িয়ে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এমন বেলাজদের এসব কারবার দেখার জন্য কি কেউ এত টাকা দিয়ে টেলিভিশন কিনে? অবশ্য টেলিভিশন ক্রয় করার সময় মা কিন্তু বাবার সঙ্গেই ছিলেন, মা সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন এ দৃশ্য দেখে। ড্রয়িং রুম ভর্তি বিভিন্ন বয়স আর সম্পর্কের মানুষ। কেউ মাথা নীচু করে ফেলেছেন, কেউ না দেখার ভান করে পাশের কারও সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, আর কেউ ড্রয়িং রুমের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এদিকে মা ক্ষেপে গেছেন। বাবা মৃদু ধমকের সুরে এবং কিঞ্চিত সান্ত্বনা দিয়ে মাকে উদ্দেশ করে বল্‌লেন, আহ! তুমি এত চটলে কেন? আধুনিক যুগ, কি আর করা যায়, বরদাশত করে নিতে হবে। মা আরও রেগে বল্‌লেন, এই ছাই-ভস্ম তুমিই দেখ, ছি ছি। অন্তর থেকে চরম ঘৃণা প্রকাশ করে মা ভিতরের কক্ষে চলে গেলেন। বাবা একটা হাসি দিয়ে বুঝালেন যে, আমার মা অবুঝ। আধুনিকতার সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করে চলতে জানেন্ না। বাবার এ ভূমিক্কা আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। বাবা একজন উচ্চ শিক্ষিত প্রভাবশালী মানুষ। বাবা অনেক জানেন, অনেক বুঝেন। মা স্বল্প শিক্ষিতা। তাই ভাবলাম, মা বোধহয় ভুল বুঝেছেন শিক্ষার কমতির কারণে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, আমার বিবাহযোগ্যা দু'টি বোনের উপস্থিতিতে এ দৃশ্য দেখে মার অস্বস্তি বোধ করা তো স্বাভাবিক। প্রশ্ন জাগল, বাবা এটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে? তিনি কি এই ছেলেকে কখনও এ অবস্থায় দেখলে একইভাবে স্বাভাবিক ঘটনা বলে গ্রহণ করে নেবেন? তাহলে কার শিক্ষাটা আমার গ্রহণ করা উচিত, মায়ের না বাবার? মনে দ্বন্দ্ব; কিন্তু টেলিভিশন দেখা বন্ধ হল না। ঐ রাতে টেলিভিশনের অন্য কোন অনুষ্ঠান মা দেখেননি। পরদিন দেখলাম, মা টেলিভিশন দেখছেন। কিছুদিন পর মার মধ্যেও দেখলাম বেশ পরিবর্তন। প্রথম দিন মা যা দেখে রাগ করে উঠে গেলেন, দ্বিতীয় দিনেও উঠে গেলেন বটে, কিন্তু রাগ করে নয়। তৃতীয় দিনে দেখলাম আরও পরিবর্তন। তারপর এভাবেই পরিবর্তন আসল। যে দৃশ্য দেখে মা প্রথম দিন রাগ করে উঠে গিয়েছিলেন, পরবর্তীতে দেখলাম তার চেয়েও জঘণ্য দৃশ্য নিশ্চিন্তে বসে দেখতে পারছেন। আমার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। বাবার বিশ্বাসই প্রাধান্য পেল। বাবা আর মার বিশ্বাসের ঐক্য আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করল। এ সুযোগ আর সুবিধা ভোগের কারণে পরিবারে যে পরিবেশ সৃষ্টি হল, সে পরিবেশে শীঘ্রই সংযোজিত হল একটি ভিসিআর। এ পদ্ধতিতেই

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে টেলিভিশন আমাদের পরিবারের সকলের চক্ষুলজ্জা দূর করার ক্ষেত্রে মস্ত বড় ভূমিকা পালন করে।

– এসব কথা কি এখন বুঝতে পারছেন?

– জ্বী হাঁ, এখন বুঝতে পারছি খুব বেশী।

টেলিভিশন-প্রভাবের এ ফর্মুলা কম-বেশী সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সকলের লাজলজ্জা এভাবেই গিয়েছে এবং যাচ্ছে। সকলেই বলছেন, টেলিভিশন চিত্তবিনোদনের মাধ্যম। অতএব, এ মাধ্যম তো আর ছাড়া যায় না। টেলিভিশন টেনশন মুক্তির মোক্ষম দাওয়াই। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সরকার প্রদত্ত সুযোগ, ছোটদের আবদার, অভিভাবকদের সম্মতি আর অনুকূল পরিবেশের সঙ্গে কেমন করে যেন আমাদের তারুণ্য এক হয়ে গেল। আমরা টেলিভিশন স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। টেলিভিশন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে যারা শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করছেন, তারা পশ্চিমা সংস্কৃতির সিলেবাস অনুযায়ী আমাদের তরুণ সমাজকে নানাভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। আমরা সে সিলেবাস অনুযায়ী মনোযোগের সঙ্গে পাঠ নিতে শুরু করেছি। 'আরও শিখতে চাই, আরও দেখতে চাই', আমাদের এ আকুল আবেদন টেলিভিশন শিক্ষকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। কারণ, তারা আমাদের মন-মানস সেই ধাঁচে আগেই তৈরী করে নিয়েছিলেন। তারা আমাদের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য নানা ধরনের প্রোগ্রাম তৈরী করে মাতিয়ে তুলছেন। নাচেগানে পাগল করে ছাড়ছেন। নানা রুচির আর নানা স্বাদের নাচনেওয়ালীদের আমদানী করে তাদের নাচিয়ে আমাদের মনটাকে পুলকিত ছন্দে নাচাচ্ছেন। ডিসকো নাচ কাকে বলে তা আমরা জানতাম না, টেলিভিশন স্কুলেই আমাদের প্রথম দেখানো হলো ডিস্‌কো নাচ কাকে বলে। ছায়াছন্দ অনুষ্ঠান চালু করে সে অনুষ্ঠানে যৌনমিলন, যৌন নাচন আর যৌন গাওনের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়ে টেলিভিশন ওস্তাদরা আমাদের লজ্জা-শরমের অবশিষ্ট পর্দাটাও যোগ্যতার সঙ্গে অপসারণ করে দিলেন। প্রেম করা, প্রেমিক হওয়া, প্রেম প্রেম খেলা করা, প্রেম সাগরে ঝাঁপ দেয়া, ডুব দেয়া, সাঁতার কাটা, প্রেমে পাগল হওয়া, প্রেম নিয়ে কেলেঙ্কারী করা, প্রেম নিয়ে খুনাখুনি করা ইত্যাদি সব ইলিম-তালিমই আমরা হাতে-কলমে টেলিভিশন স্কুল থেকে অর্জন করেছি এবং এখনও করছি। গত সপ্তাহে এক টিভি নাটকে দেখলাম, এক বাসার যুবক এবং অন্য বাসার যুবতীর মধ্যে কিভাবে প্রেম-খেলা শুরু হয়, কিভাবে প্রেমের অংকুর গজায়, পাতা মেলে, ডালপালা ছড়ায়, প্রেমের ফুল ফোটে, কিভাবে ঝোপ-জঙ্গলে, বাঁশ ঝাড়ের দুই বাড়ীর নির্জন স্থানে, পার্কে, পথেঘাটে,

www.nagorikpathagar.org

সমুদ্র সৈকতে প্রেমের মহড়া দেয়া হয়, রিহার্সেল হয়। এমন শিক্ষাও ড্রয়িং রুমে বসেই পাচ্ছি টেলিভিশনের মাধ্যমে। মুরুব্বীরা এসব কান্ডকারখানা টেলিভিশনে টেলিভিশনে দেখেন, কিন্তু কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে দেখি না। তাঁদের এ নীরবতা দেখে মনে হয়, তাঁরা হয়তো এটাই ভাবেন যে, এভাবে যদি বিনা খরচায় ছেলেমেয়ের বিয়েটা হয়ে যায়, তাহলে মন্দ কি! কিন্তু আফসোস! বিয়েটা সহজে সম্পন্ন হয় না। আগে বা পরে বা বিয়ের সময়ে কোন না কোন কেলেংকারী ঘটেই থাকে। প্রেমের বিয়ে, আদালতী বিয়ে আর ধর্মীয় বিয়ের মধ্যে আসমান–যমীন ফারাক। প্রেমের বিয়ে হচ্ছে বটে, ইংলিশ ম্যারেজের মত। কাজীর অফিসে যেতে হয় নিতান্ত ঠেকায় পড়ে, সমাজের ভয়ে, ফর্মাল আনুষ্ঠানিকতা পালনের খাতিরে। তবুও এ মিলনে প্রায়ই বিরহের সুর বাজে। এক যুবতী ৫/৭ জনের সঙ্গে প্রেম করেন, শেষ পর্যন্ত একজনের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত হন। অন্যান্য প্রেমিক টের পেয়ে পথ আগলায়। অনিবার্য হয়ে উঠে মারামারি, এমনকি খুনাখুনি। মামলা চলে, খবরের কাগজে প্রেম–সংঘাত কাহিনী ছাপা হয়। প্রেম–বাজারের অন্যান্য প্রেমিক এমন একটা কাহিনী সৃষ্টির লোভে পড়ে যান। আমরাও তো সেই প্রেম–বাজারের মস্তান। তাই আমরাও এমন প্রেমের কলা আর কেলি শিখে কাহিনী সৃষ্টিতে আগ্রহী হয়ে উঠি। এসব শিক্ষা নাটকের মাধ্যমে টেলিভিশন আমাদের সামনে তুলে ধরছে। টেলিভিশন শুধু দেশী প্রেমের দেশজ প্রেমলীলাই শিখাচ্ছে না; বরং দেশী প্রেম শিক্ষাদানের সাথে সাথে ইংলিশ প্রেমের প্রশিক্ষণও প্রতিদিন দিচ্ছে। এ সুযোগে আমরা পশ্চিমা গুন্ডামি–পান্ডামি শিখতে পারছি এবং শিখেছিও অনেক। প্রয়োজনবোধে সেই স্টাইলের গুন্ডামি–পান্ডামি করে থাকি। পশ্চিমা ফাইটিং ছবি দেখে সেই ফাইটিং মনোবৃত্তিই শুধু আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি বরং ফাইটিং অভ্যাসও আমাদের হয়ে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে জাতির গরীবী আরও তীব্রতর করে আমাদের সরকার পশ্চিমা ফাইটিং ছবি আমদানী করছেন। আমরা মনে করি, এসব ছবি আমদানীর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ফাইটিং শিখানো, মস্তান বানানো। হাঁ, সরকারের সে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে, টেলিভিশন সে ভূমিকা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছে, আমাদের মস্তান বানিয়েছে ।

ভদ্রপাড়ার একশ্রেণীর স্বদেশী সুন্দরীকে ফ্যাশন–ভূষণে সাজিয়ে–রাঙিয়ে টেলিভিশনের পর্দায় তুলে ধরে আমাদের খুন গরম রাখার মহান খেদমত টেলিভিশনই আঞ্জাম দিয়ে থাকে। বলুন তো, তাদের এত সেজেগুজে হাস্যে–

www.nagorikpathagar.org

লাস্যে অপরকে আকর্ষণ করার মত ম্যাকআপ নিয়ে টিভির পর্দায় বেপর্দা হওয়ার উদ্দেশ্য আমাদের পাগল করা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? আমরা বিশ্বাস করি, টেলিভিশন আমাদের মস্তান হওয়া থেকে ঠেকাতে পারত, আমাদের জীবনকে পরিচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত করতে পারত, আমাদের পৌরুষ, উদ্যম আর সাহসকে উন্নত এক সমাজ গড়ার কাজে লাগাতে পারত। কিন্তু টেলিভিশন তা করেনি, করেছে বা করে যাচ্ছে এমন কিছু, যা দিয়ে ঘটিয়েছে আমাদের সর্বনাশ আর আমাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে সমাজের সর্বনাশ। হয়ত কোনদিন টেলিভিশনের লক্ষ্য–আদর্শ পরিবর্তিত হবে, যে সিলেবাসে রোজ তালিম দেয়া হয়, তারও বদল হবে, টেলিভিশন শিক্ষকদের গোটা ব্যাচও হয়ত একদিন বিদায় নেবে, কিন্তু এতদিনের পাওয়া তালিম আর অনুশীলনে গড়ে উঠা চরিত্রের তো কোন পরিবর্তন ঘটবে না। জাতির চরিত্র ধ্বংসের জন্য তখন আদালতে যারা অভিযুক্ত হবেন, তাদের প্রায় সকলেই গত হয়ে যাবেন, শাস্তির কথা লেখা থাকবে কাগজে–কালিতে, কিন্তু সেসময় দশের গালি শুনার জন্য গোটা দেশব্যাপী বিদ্যমান থাকবে টেলিভিশনে তালিমপ্রাপ্ত লাখ লাখ মস্তান।

টেলিভিশনের নীতি যারা নির্ধারণ করে, প্রোগ্রাম তৈরী করে, প্রোগ্রামে যৌনতার বিষ ছড়ায়, গোটা জাতির সম্ভ্রমের পর্দা ছিন্ন করার কূট–কৌশল চালিয়ে যারা তরুণদের নৈতিক জীবনকে যৌন জীবনে রূপান্তরিত করে, যারা যুবকদের শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত না করে পাশবিক কুকর্মে নিয়োজিত করে মস্তান বানিয়েছে, তারা বড়লোক ও বুদ্ধিজীবী। বছরে বছরে তারা পদক পায়, বদনাম শুধু আমাদের। খুনীরা দোষী নয়, যে খুন হয়েছে সে দোষী। কারণ, সে কেন প্রতিরোধ করতে পারল না। আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। যারা আমাদের চরিত্রের দিক দিয়ে ভিখারী বানিয়েছে, তারা অভিজাত, গায়ে তাদের হাঁসের পালক, শত ড্রাম পানি ঢাললেও পালক ভিজে না। সকল দোষের উর্ধে তাদের অবস্থান। টেলিভিশন তাদের কথাই শুনে। টেলিভিশনের নিয়ন্ত্রণভার কি মস্তানদের উপর ন্যস্ত? এসব কি মস্তানদের দ্বারা সৃষ্টি, না মস্তান সৃষ্টির জন্য এগুলোর সৃষ্টি? টেলিভিশনের প্রোগ্রাম কি মস্তানরা তৈরী করে দেয়? বিদেশ থেকে কি ফাইটিং আর পর্ণ ছবি মস্তানরা আমদানী করে? প্রেমের নামে টানাটানি আর একে অন্যকে নগ্ন করার নাটক কি আমরা লিখি না প্রচার করি? যারা এসব করে, তারা দোষী নয়, দোষী তারা, যারা এসব দেখে মস্তান হয়েছে। টেলিভিশন প্রথমে আমাকে যে ধাক্কা দেয়, সে ধাক্কাই আমাকে বাকী পথঘাট চেনার আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

০ আজ আমরা বুঝি, টেলিভিশন এক টেরর, এ টেররই টেররিস্ট সৃষ্টির সহায়ক।

০ জাতীয় টেলিভিশন বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত। সেই প্রভাব নিয়ন্ত্রণেই প্রোগ্রাম তৈরী করে প্রর্দশন করা হয়। সুতরাং আমাদের আচরণে সেই শংকর প্রভাব সাংঘাতিক।

০ টেলিভিশন আমাদের বর্তমান আচরণ ও চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

০ আমাদের মুরব্বীরা টেলিভিশনের প্রোগ্রাম তৈরী করে যা সম্প্রচার করছেন, আমরা তা দেখছি, তারই প্রভাবে আমরা প্রভাবিত হচ্ছি।

০ আমাদের অভিভাবকরা টেলিভিশন কিনে ঘরে এনে পরিবারের সকলকে দেখার যে সুযোগ দিয়েছেন, আমরা শুধু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি।

০ টেলিভিশনের মাধ্যমে জাতির নৈতিক জীবন ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে, বিভিন্ন প্রোগাম তৈরী করে, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান নাম দিয়ে যা করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, এসবের বিরুদ্ধে মুরব্বীদের কোন আন্দোলন হয়নি বলে আমরা এসবে তাঁদের সম্মতি আছে বলে ধরে নিয়েছি।

আমি তো বেঁচে গেলাম। আপনি আমার যা উপকার করলেন তা কোনদিন ভুলব না। কিন্তু একারণেই আমার যে সব সাথী নষ্ট হয়েছে বা এমন হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বরবাদ হয়েছে, তাদের রক্ষার কি ব্যবস্থা?

– পরিস্থিতি এখন এমন, আপনার প্রাণ নিয়ে আপনি পালান। সকলের কথা এখন ভাবতে গেলে নিজেই শেষ হয়ে যাবেন। আগে আপনি গহবর থেকে উঠুন, অতঃপর পরিকল্পনা রাখুন টেলিভিশনকে মানুষ করার।

– হাঁ, তাই করা উচিত।

পরদিন ফ্লাইট। বেশীক্ষণ আটকিয়ে রাখলাম না। খানাপিনা শেষ করে তাকে সাথে নিয়ে গেলাম তাদের বাসায়। বিমান বন্দরে গিয়ে তাকে বিদায় দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ। সে এখন আর মস্তান নয়, ভিন্ন এক মানুষ।

www.nagorikpathagar.org

রূপসীরা আমাকে মস্তান বানিয়েছে

পুলিশ অফিসারের ছেলে যদি মস্তান হয়, তাহলে সে হয় ভয়ঙ্কর মস্তান। বাপের কর্ম-দায়িত্বের পরিধির অন্তর্ভুক্ত যদি হয় পুত্র ধনের মস্তানী এলাকাটি, তাহলে ছেলের জন্য এ সুযোগ যেন সুবর্ণ সুযোগ। সোনায় সোহাগাও বলা যায়। এ মস্তান যুবকটিও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তার সংগে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে রাজধানীর একটি থানায়। থানার বড় কর্তা ছিল আমার এক আত্মীয়, বয়সেও আমার ছোট। একদিন থানায় গেলাম বড় কর্তার কাছে তার দেশের বাড়ীর এক খবর নিয়ে। সৌভাগ্য আমার বলতে হয়, সেদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। থানা অফিসে বসেই তার সঙ্গে আলোচনা করছি। এমন সময় দেখলাম, তিন জন মস্তানকে হাতকড়া পরিয়ে দারোগা সাহেবের সামনে নিয়ে আসলেন দু'জন পুলিশ। দারোগা সাহেব বললেন, জবানবন্দী নিয়ে হাজতে রাখ।

দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা কোন্ অপরাধের অপরাধী? তিনি বললেন, ওরা সব ধরনের অপরাধের অপরাধী।

– ঠিক বুঝলাম না।

– আমি বলতে চাচ্ছি, এমন কোন অপরাধ নেই যা তারা করে না। লাউ-শসা চুরি থেকে শুরু করে ছিনতাই, নারী ধর্ষণ, এমনকি খুন-খারাবীও করে।

– এখন কোন্ অপরাধের কারণে গ্রেফতার হয়েছে?

– ঠিক বলতে পারছি না। কিছুক্ষণ পরই জানতে পারব।

অতঃপর আমরা দু'জন পারিবারিক আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এ আলোচনায় প্রায় ১৫ মিনিট কাটল। এসময় একজন পুলিশ এসে দারোগা সাহেবের কানে কানে কি যেন বললেন। দারোগা সাহেব আমাকে বললেন, আপনি একটু বসুন, আমি ৫ মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে আসছি। আমি তার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকলাম। তিনি ফিরে আসলেন। কেন তিনি কানকথা শুনে চলে গেলেন, আমি এ জিজ্ঞাসা তাকে করার আগেই বললেন, কি যে জ্বালাতন! ধর্ষণ ঘটনা। তিন যুবকের একজনের পরিচয় জানেন?

– আমি কেমন করে পরিচয় জানব?

– সে এমন একজনের ছেলে, যাকে দেখলে আমিই সালাম দেই। আমাদের লাইনের চাকুরী তাঁর।

– তিনি কি এখনও চাকুরী করছেন, না রিটায়ার্ড?

www.nagorikpathagar.org

– এখনও কিন্তু কর্মরত, রিটায়ার্ড হওয়ার সময় অতি নিকটবর্তী।

– তুমি কি তাঁর ছেলেকে ছেড়ে দিলে?

– না, ছেড়ে দেইনি, তবে তিন জনকেই ছেড়ে দিতে হবে। অপর দুজনের খুঁটির জোর আরও শক্ত।

– তাহলে যে ধর্ষণের শিকার হল, সে কি বিচার পাবে না?

– কিভাবে বিচার পাবে? একূল রাখি না ওকূল রাখি? একূল যদি না রাখি তাহলে হয়ত আমার বদলী হবে খাগড়াছড়ি, চাকুরীও পাতলা হয়ে যেতে পারে। আর ঐ মেয়েটি যদি বিচার না পায়, তাহলে আমি মনে শান্তি পাব না। কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

– এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন কি আরও হয়েছ?

– অনেক অনেক।

– সেসব ঘটনায় কি ভূমিকা পালন করেছ?

– কোন কোনটায় সুবিচার করেছি, আবার অধিকাংশ ব্যাপারে অবিচার করেছি। জেনেশুনে বহুবার বিষপান করেছি।

দারোগা হলেও সে আমার আত্মীয় এবং সম্পর্কে ছোট ভাই। তার মন-মানসিকতা সম্পর্কে আমি পরিচিত। তার আহত মনকে আর নাড়াচাড়া করলাম না। বললাম, যা ভাল বুঝ তাই কর। আমাকে বিদায় দাও, তবে বিদায়ের আগে তোমার খোঁয়াড়ে আটকা তিন জন আসামীকে একনজর দেখে যাই। তুমিও আমার সঙ্গে থাক।

খোঁয়াড়ে আটকা তিন জনকে ভালভাবেই দেখলাম, কিন্তু তাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করলাম না। তবে পুলিশ অফিসারের সন্তানকে নয়ন ভরে দেখলাম।

তারপর চলে গেছে প্রায় চার মাস। থানায় কয়েকবার গিয়েছি দেশের বাড়ীর নানা খবর নিয়ে। সে বড় কর্তার সাথে মস্তানদের নিয়ে কোন কথা হয়নি।

এ ঘটনার একটি কাকতালীয় দিক আছে, যা আমার জন্য শাপে বর হয়ে গেল। ঐদিন বিদায় নেয়ার সময় দারোগাকে বলেছিলাম, আমার মনে হয়, প্রকৃতিগতভাবে ওরা মস্তান নয়। চেহারায় খান্দানী ছাপ আছে। সুযোগ পেলে ওরা ভাল হতে পারত। আমার এ কথাগুলো যদিও দারোগাকে উদ্দেশ করে বলা, কিন্তু আসামী তিন জন আমার সব কথা শুনেছে। আমি থানা ত্যাগের ১৫/২০ মিনিট পর ওরা ছাড়া পেয়ে যায়। দারোগা সাহেব উপর থেকে টেলিফোন পেয়ে তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। একথা দারোগাই আমাকে একদিন কথাচ্ছলে বলেছিলেন। যাহোক, যুবক তিনটি ধরে নিয়েছিল যে, তারা আমার দ্বারাই ছাড়া পেয়েছে। এ

www.nagorikpathagar.org

ঘটনার প্রায় চার মাস পর এলিফ্যান্ট রোডের এক জুতার দোকানে দেখা হয়ে গেল পুলিশ অফিসারের ছেলের সঙ্গে। সে-ই আমাকে প্রথম দেখে এবং এগিয়ে এসে সালাম করে। আমার চিনতে কোন অসুবিধা হয়নি। সালাম নিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। আমার ভয় হল, আমি কি মস্তানের খপ্পরে পড়ে গেলাম। মনের শংকা-সন্দেহ চাপা দিয়ে দু'চার কথা বললাম। তখন আমি যুবকের মাথায় লম্বা চুল দেখলাম না। মাথায় একটি ফ্লাট হেট। মাথার দিকে তাকাতেই যুবক বললেন, অসুখ হয়েছিল, তাই চুল কামিয়ে ফেলেছি। অতঃপর তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন-

- সেদিন আপনি আমাদের যা উপকার করেছেন তা কখনও ভুলব না। আপনার কথায়ই দারোগা সাহেব আমাদের ছেড়ে দিলেন। মনে হল দারোগা সাহেব আপনাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। তিনি আপনার কি হন?

- তাদের ছাড়া পাওয়ার দিকটির ব্যাপারে কোন কথা বল্‌লাম না। শুধু দারোগার সাথে আমার সম্পর্কের কথা জানালাম। কি কারণে তারা গ্রেফতার হয়ে থানায় আসে তাও জিজ্ঞাসা করলাম না। কেটে পড়তে চাইলাম, কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। আমাকে চা-নাস্তা খাওয়াবেনই। অনেক অজুহাত পেশ করলাম, পেটে আমার গণ্ডগোল চলছে, তাও বললাম, কিন্তু কোন কাজ হলো না। অবশেষে আল্লাহর নাম নিয়ে রাজী হলাম। বাধ্য হয়ে রিক্সা নিয়ে দুজনই গুলিস্তান এলাম, গুলিস্তান এলাকায় তারও কি একটা প্রয়োজন ছিল। গুলিস্তানের পিঠাঘর নামের রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। বেচারা আমাকে শানদার নাস্তা খাওয়ালেন। নাস্তা খাওয়ার পর তিনি আমার বাসা ও অফিসের ঠিকানা চাইলেন। বাসার ঠিকানা দিলাম না, অফিসের ঠিকানা দিলাম। তারপর বিদায় নিলাম। ঘাম দিয়ে যেন আমার জ্বর ছাড়ল।

ঈদের পর অফিস খুলেছে। অফিসে বসে লেখায় খুবই ব্যস্ত রয়েছি। লেখা শেষ করে কম্পিউটারে পাঠিয়ে যেই বসেছি, সামনে দেখি মস্তান বাবাজীর মোটা-তাজা দেহ। আজ আবার কি মতলবে এসেছেন, নিজেকেই প্রশ্ন করলাম। সালাম বিনিময়ের পর অন্যান্য কুশল বিনিময় করে প্রশ্ন করলাম-

- বলুন, আপনার কি খেদমত করতে পারি? কি মনে করে আসলেন?
- কারণ ছাড়াই এসেছি। বলতে পারেন সৌজন্য সাক্ষাৎকার।
- দারোগা সাহেব তো বদলী হয়ে চলে গেছেন। এখবর কি জানেন?
- জি হাঁ, জানি।
- লোকটা মন্দ নয়।

www.nagorikpathagar.org

– হয়তবা তাই।

অতঃপর তাকে নিয়ে গেলাম লাইব্রেরী রুমে। সময়টা ভাল ছিল। এসময়ে লাইব্রেরী রুমটা নির্জনই ছিল। চা-বিস্কুট খেতে খেতে তাকে আমি প্রথম প্রশ্ন করলাম–

– লোকে যাই বলুক, আসলে আপনি একজন ভাল মানুষ। সঙ্গদোষ আর বয়সের কারণে কোন কোন সময় বেয়াড়া চলেন, তাই না?

– আপনি ঠিকই ধরেছেন।

– আচ্ছা বলুন তো, আপনি ধর্ষণ টর্ষণের পথে কেন গেলেন? রাজনৈতিক দলের লাঠিয়াল হলেন কেন?

– আপনি এসব কথা কোথা থেকে শুনলেন?

– দারোগা সাহেবই সব কথা বলেছেন। দারোগা সাহেবকে বলেছেন আপনার আব্বা।

– তাহলে দেখছি, আপনি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। আমার সম্পর্কে কি পত্রিকায় লিখবেন?

– না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। পত্রিকায় আমি আপনাদের সম্পর্কে লেখি, কিন্তু আলাদাভাবে কারও সম্পর্কে লেখি না।

– আমাকে এ পথে টেনে নিয়েছে আমার দুই বন্ধু। বিএ পাস করতে পারিনি। দুই বন্ধু যে দল করে, আমাকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করে। দলভুক্ত হওয়ার আগেই আমাকে কিছু টাকা দেয়। চাকুরীর আগেই যেন মাহিনা দিল তারা। ভাল লাগল। আমি নাকি তাদের দলে থাকলে দলের বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ, আমার বাবা পুলিশ অফিসার।

– বিএ পাস না করার কারণ কি?

– বিএ পাস না করার একমাত্র কারণ ছিল এই, আমি এক রূপসীর প্রেমে পড়েছিলাম, কিন্তু তাকে পাইনি। এদিকে পড়াশুনাও আর হল না। তারপর রূপসীদের দেখলেই আমার হুশ থাকে না।

– সে আবার কেমন কথা? তাই বলে পথে ঘাটে তাদের কি হামলা করতে থাকবেন? আপনারও বোন-ভাগ্নি আছে। রাজনৈতিক দলের লাঠিয়ালী করছেন তাই না হয় করুন, রূপসীদের পিছ ছাড়ুন।

– সাধে কি পিছ ধরি?

– এর মানে?

– এর মানে অতি সোজা। তাদের চালচলন আর বেশভূষা আমার মত

www.nagorikpathagar.org

অনেককে আকৃষ্ট করে।

– রূপসীরাই কি আপনাকে মস্তান বানিয়েছে?

– জি হাঁ, শুধু আমাকে নয়, অনেককে। অনেকেরই পদস্খলনের কারণ এ রূপনগরীর রূপসীরা। রূপসীদের রূপের আগুনে আমরা পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়েছি। সে আগুনে আমাদের পাখা পুড়েছে, দেহ পুড়েছে, মনও পুড়েছে। রূপের অগ্নিজ্বালা অন্তরে যে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে, তা কিন্তু আজও ঠান্ডা হয়নি। আগুনে পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়েই থাকে। দোষটা আগুনের, না পতঙ্গের? এ বিচার করবে কে? কবি বলেছেন "তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সেকি মোর অপরাধ?" এ যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে এর বিচার হবে কোন্ আদালতে? আমরা শুধু চেয়েই থাকি না, সেই রূপের আগুনে ঝাঁপিয়েও পড়ি। আগুন দেখলে পতঙ্গ আসে, সেকথা সকলেই জানেন। যারা নিজ নিজ রূপের আগুন জ্বালিয়ে প্রেম-পতঙ্গদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 'আয় তোরা আয়' বলে আহবান করেন! তারা বরাবরই 'বেশরম' থাকেন। যারা সে আগুনে ঝাঁপ দেয়, সব দোষ যেন তাদের। বিচিত্র ও অদ্ভুত বিচার!

– কে কার বিচার করে? বিচার হলে তো ভালই হত। ভ্রাম্যমাণ রূপসীরাও নিয়ন্ত্রণে আসত, আপনারাও সংযত হতেন। বিচার হয় না বলেই এত ঝাপটাঝাপটি। অনেকেই তো আপনাদের মত এমন করে না। নিজেকে সংযত রাখতে পারে।

– আমাদের আছে আবেগ-অনুভূতি, প্রেম-ভালাবাসা, কামক্রোধ, লোভ-লালসা সবই, কিন্তু তাই বলে আমরা যৌন জীব নই, তবে যৌন চাহিদা আপনাদের মত আমাদেরও যে আছে, তা তো অস্বীকার করতে পারবেন না। সমাজে আমরা নবীন। প্রবীণের কাতারে পৌঁছতে এখনও অনেক দেরী। এ নবীন বয়সটা বড়ই স্পর্শকাতর। একথা আপনাদের মত বয়স্করাও বলেন। যেদিকে ডাক পড়ে, সেদিকে কান যায়। যে রূপ প্রদর্শিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি চলে যায়। যারা প্রভাব খাটাবার কৌশল জানেন, তারা প্রভাবিত করতে পারেন। কারণ, আমরা যে নবীন, কাঁচা মাটি।

– এসব কথা যে বুঝে, সে তো নিজেকে কাঁচা মাটি বলতে পারে না, যারা নিজেদের সম্পর্কে বুঝে না, তারা এসব কথা বলতেও পারে না। আমার মনে হয় আপনি বুঝেই এমন করেন। ঠিক বলিনি?

– দেখুন, বুঝা এক কথা আর সে বুঝ অনুযায়ী চলা আর এক কথা। এ

www.nagorikpathagar.org

দুটিকে মিলিয়ে চলার বয়স আমার হয়নি। বয়সের পরিপক্কতা এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

– তখন তো মহাজনীও থাকবে না।

– থাকবে, অবশ্যই থাকবে। আমরা রূপসীদের বাজারের নতুন খরিদ্দার। যে লোক কখনও শহর দেখেনি, সে লোক শহরে এসে চলাফেরায় কিছুটা অস্বাভাবিক আচরণ প্রদর্শন করবেই। এমন লোক শহরের বড় বড় দালানের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কারণেই অবাক হয়। এক সাথে হাজার হাজার মোটরগাড়ী দেখে বিস্মিত হয়, নানা বর্ণের পোশাকের আর নানা আচরণের মানুষ দেখে তাজ্জব হয়। হাজার হাজার বিজলী বাতির বিচিত্র আলোকচ্ছটা দেখে অভিভূত হয়। রাস্তা পারাপারে হিমশিম খায়, গাড়ী চাপাও পড়ে। প্রতারকরা এ হাবভাব দেখে প্রতারিত করার মতলব আঁটে। কারণ একটাই, সে কোনদিন শহর দেখেনি। শহরের কায়দা–কানুন সে জানে না। কেউ কোনদিন শিখায়নি, তাই শিখেনি। যদি এ আগন্তুককে কেউ গাইড করে, শহর দর্শনে সাহায্য করে, শহরে চলাফেরা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করে, তার কাছে শহরের যাকিছু নতুন এবং বিস্ময়কর বলে মনে হয়, সেসবের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করে, তাহলে এ আগন্তুক শহরে এসে পাগলের মত চলাফেরা করবে না, গাড়ী চাপা পড়বে না, প্রত্যরিত হবে না বরং নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে আরও জ্ঞানবান হয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে দশ জনকে সবক দিতে পারবে, গ্রামবাসীদের কাছে শহরের সঠিক বর্ণনা দিতে পারবে।

শহরে ঐ নবাগতের মত আমরাও এ সমাজে নবাগত। পথঘাট চিনি না, রীতিনীতি জানি না। সামনে যা আছে তা দেখছি, যা বলাবলি হচ্ছে তাই শুনছি, যেভাবে বুঝানো হচ্ছে সেভাবে বুঝছি। যে বাগান সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সে বাগানই দেখছি। কোন্ ফুলের কি গুণ, তা জানি না, কেউ জানায়ও না। কোন্ দিকে তাকালে চোখের জ্যোতি নষ্ট হবে, কোন্ কথা শুনলে কানে তালা লাগবে, কোন্ পথে চললে পা গর্তে পড়বে, কোন্ গাড়ীতে কিভাবে চড়লে দুর্ঘটনায় পড়তে হবে, সে জ্ঞান কেউ দেয়নি, এমনকি সে ব্যবস্থাও এ সমাজে নেই। সমাজপতিরা বলেননি যে, এটা করলে হয় শ্লীলতা আর ওটা করলে হয় অশ্লীলতা, এদিকে দৌড় দিলে জীবনটা বরবাদ যাবে আর ঐদিকে দৌড় দিলে জীবনের রাজপথ খুঁজে পাওয়া যাবে। এমন কাউকে দিশারীর ভূমিকা পালন করতে দেখিনি বরং সব দিক থেকে একই আহবান শুনেছি, 'সংস্কৃতিবান হও, সংস্কৃতিবান হও।' কোন্টা সংস্কৃতি আর কোন্টা অপসংস্কৃতি, তাও কেউ

www.nagorikpathagar.org

পার্থক্য করে দেখাননি। সংস্কৃতির যে রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়, তাতে আমাদের কামভাবই বেশী জাগ্রত হয়। এ জাগরণকেই আমরা সংস্কৃতি মনে করে অগ্রসর হচ্ছি। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বলে যা দেশে প্রচলিত, তার সদর অন্দর তো তাই। এসব কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বে যারা আছেন, তাদের তো সব সময়ই কাম-সাগরে সাঁতার কাটতে দেখি। তাদের সাঁতার কাটার দৃশ্য দেখে আমরাও স্থির থাকতে পারি না। রিপুগুলো জেগে উঠে। সংস্কৃতির আঙ্গিনায় দেখি শুধু কামনার আগুন জ্বলছে। সে আগুনের তাপ আমাদের দেহ-মনে লাগে। যত লাগে তত পাগল করে। সেই কামনার অগ্নিজ্বালায় অস্থির হয়ে ঘর ছেড়ে অনেক রূপসীও রাজপথে বের হয়ে পড়ে। এ সংস্কৃতির আগুনে আমরাও দিগভ্রান্ত হয়ে উদভ্রান্তের মত যেমন ঘুরাফেরা করি, তেমনি ঐ রূপসীরাও পেটপিঠ উদোম করে অস্থির ঘুরাফেরা শুরু করে। কামনার আগুন অস্থির করে তুলে আমাদের ও তাদের। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, অপহরণ করি, ধর্ষণ করি। তারাও কিছু বলে না। কি প্রতিবাদ করবে? প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্যই তো আকর্ষণ। যত বেশী আকৃষ্ট হয় ভ্রাম্যমাণ দর্শকরা, তত বেশী সন্তুষ্ট হয় প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা। আপনাদের দৃষ্টিতে যা অকাম-কুকাম, সেসবে প্রগতির রং লেগে তা প্রগতিশীল কর্মকান্ডে রূপান্তরিত হয়। সন্ধি-সমঝোতা ছাড়া ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করার নাম দেয়া হয়েছে অপহরণ আর ধর্ষণ। তাতে কিন্তু একপক্ষ থাকে দোষী আর অন্যপক্ষ থাকে নির্দোষ। অথচ সন্ধি-সমঝোতায় সমান সমান ভোগের দ্বিপাক্ষিক যে ভাগাভাগি হয়, তাতে সমাজ কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে না, অথচ দু'পক্ষই তো নৈতিকতার মানদন্ডে দোষী। কিন্তু আপোষের অপকর্মের বিরুদ্ধে আপনাদের কোন কথা শুনি না। কথা বলেন শুধু আপোষ না করে যে অপকর্ম ঘটে তারই বিরুদ্ধে। এতে কি পরোক্ষভাবে আপোষের অপকর্মকে সমর্থন বুঝায় না? বিচিত্র আপনাদের নীতিবোধ!

– আপনি এত কথা জানেন ও বুঝেন, কিন্তু কর্মটি উল্টা।

– দোষ কি আমার? ভুখা বাঘের সামনে হরিণ তার নাদুসনুদুস দেহখানা নিয়ে নৃত্য শুরু করলে বাঘ কি চোখ বুঁজে থাকতে পারে? পারে না। বাঘ কখনও হরিণকে ছেড়ে দেবে না। যে সমাজ আমাদের মস্তান বানিয়েছে, সে সমাজ আমাদের চরিত্র থেকে নৈতিক সকল উপাদান সুকৌশলে বের করে দিয়ে জীবনকে অপকর্মের উপসর্গে আর হতাশায় ভরে তুলেছে। এ সমাজ আমাদের মধ্যে অনৈতিকতার ভাইরাস প্রবিষ্ট করিয়ে আমাদের যৌন জীবে পরিণত করেছে। সমাজ কেন এসত্য মেনে নেয় না যে, এ নবীনদের দেহমনে ভোগের ক্ষুধা থাকা

www.nagorikpathagar.org

স্বাভাবিক। এই ক্ষুধার্তদের সামনে মানবরূপী রূপসী হরিণীরা যদি হাস্যেলাস্যে ঠমকেচমকে নৃত্যের তালে তালে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে বাঘের ক্ষুধা নিয়ে মস্তানেরা ঝাঁপ না দিয়ে কি পারে? লোহা টানে চুম্বককে, না চুম্বক টানে লোহাকে, সে বিচার বিজ্ঞানের গবেষণাগারেই করুন, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা যায়, দুটোরই আকর্ষণ শক্তি আছে বলে এক হতে পারছে।

– আপনাদের শিকার ধরার উপযুক্ত স্থল কোনটি?

– আমাদের শিকার ধরার উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ। একদিনের ঘটনা বলি। আধুনিক এক ষোড়শী গিয়েছিলেন প্রেমিকের সঙ্গে নাইট শো সিনেমা দেখতে। মনে করুন 'যৌবনজ্বালা' নামের এক ছায়াছবি প্রদর্শিত হচ্ছিল। দু'জন যখন প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করেন, তখনই আমরা লক্ষ্য করলাম, দু'জনেরই যৌবনজ্বালা শুরু হয়ে গেছে। কি যে নষ্টিফষ্টি, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। হলের ভিতরে ছায়াছবির যৌবনজ্বালা না দেখে রক্ত-মাংসের এ যুগলের অস্থির যৌবনজ্বালা অনেকেই দেখলেন, আমরাও দেখলাম। ছুটির ঘন্টা বাজলো। তারা বেরিয়ে এলেন। আমাদেরই একজন রিক্সাওয়ালা হয়ে দুজনকে রিক্সায় তুলে নিল। আসল রিক্সাওয়ালাকে কুড়ি টাকা দিয়ে সুবিধাজনক স্থানে বসিয়ে রাখলাম। আমরা চার জন বেবীট্যাক্সি নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করতে লাগলামা। এদিকে ওরা দু'জন রিক্সায় উঠেই আবার নষ্টিফষ্টি শুরু করে দিল। নির্দিষ্ট জায়গায় রিক্সা এসে থামল। অজুহাত পেশ করা হল, স্যার, চেইন পড়ে গেছে। মুহূর্তে অন্য দৃশ্যের অবতারণা। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ্যাকশন শুরু হল। প্রেমিক দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল। নায়িকাকে করলাম আমরা অপহরণ। পরদিন খবরের কাগজে ষোড়শী অপহরণের সংবাদ ছাপা হলো। কি কারণে আর কিভাবে এ অপহরণ হল, তা কেউ জানল না। মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করলাম। কেউ বললেন, আহ! কি দিনকাল পড়েছে। সিনেমা দেখে বেচারী বাসা পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। ওর জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। বদমায়েশদের দৌরাত্ম্য সাংঘাতিক বেড়েছে। কেউ কেউ আবার অন্য মন্তব্য করলেন, ভাল হয়েছে। এবার মজাটা বুঝ। ছি ছি! বেলাজ যুবতী! একা সিনেমা দেখতে যায়, সাহস কত! তাও আবার নাইট শোতে। ওর মা বাবাই বা কেমন। এতবড় মেয়েকে একা একা কেমন করে ছেড়ে দেয়? মা বাবা কি ঐ মেয়ের অবৈধ রোজগার খায়?

– বুঝলাম, একা-একা ছেড়ে দেয়, তাই বলে কি আপনাদের ভোগের জন্য?

– আমি বলব অবশ্যই।

www.nagorikpathagar.org

– যাক, তারপর এ ঘটনার কি হল?

– কি আর হবে? পক্ষে বিপক্ষে নানা মন্তব্য চলল। মন্তব্য করেই সারা। সমস্যার উপর টিপ্পনী, কিন্তু সমস্যা সৃষ্টির পটভূমি জানার আগ্রহ কেউ দেখালেন না। জানতে চাইলেন না ভোগের বস্তু উদোম থাকলে ক্ষুধার্তদের দৃষ্টি কেন পড়ে? বাঘে হরিণে বন্ধুত্ব অকল্পনীয়, এ নিয়ে গল্পও ফাঁদা যায় না। সংহার যেখানে স্বাভাবিক, সেখানে সখ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। সম্ভ্রমের আবরণে যে নারী চলে, সে নারীর প্রতি আমরা ভোগের নজরে তাকাই না বরং সম্ভ্রমের দৃষ্টি দিয়ে তাকাই। খোসাবিহীন কলা বাজারে বিকায় না, তা কীট–পতঙ্গের ভোগে যায়। পর্দা–বিহীন নারীও ভদ্র সমাজে খোসাবিহীন কলার মত, সমাজে বিকায় না, আমাদের মত মানবরূপী কীটদের ভোগে হজম হয়।

আপনাদের বিচারে আমরা তবুও দোষী। দোষী তো বটেই, কিন্তু ঐ 'সতী যুবতীর' দিকটাই একটুখানি বিশ্লেষণ করুন। বিয়ের পরের জীবনটা বিয়ের আগেই কি এ যুবতী শুরু করেনি? আল্লাহ্ ও সমাজ সাক্ষী রেখে সে জীবনসঙ্গী বেছে নেয়নি, সে নিয়েছে ভোগের ভাগী, যা তার স্বামীর আমানত, সে শয়তানকে ভোগ দিয়েছে, আমরাও শয়তানের সারিতে দাঁড়িয়ে ভোগের ক্ষুধা নিবৃত্ত করলাম। এবার বলুন তো, অপরাধ কি খুব বেশী করে ফেললাম? সে যে বৈধ যৌনজীবন চায় না, তাতে কি কারও সন্দেহ আছে? ওর মা বাবাও তাই চায়। যে বাজারে পুরুষরাই ঠেলাঠেলি করে সওদা কিনে, সে বাজারে নারী যদি ফিফ্‌টি পার্সেন্ট অধিকারের দাবী নিয়ে প্রবেশ করে, তাহলে ঠেলাঠেলির ফিফটি পার্সেন্টও তাকে অবশ্যই নিতে হবে। যে মা–বাবারা বাজারের মধ্যে নিজ নিজ সেয়ানা কন্যাদের সাজিয়ে–গুজিয়ে ছেড়ে দেয়, তারা কেমন করে আশা করতে পারেন যে, তাদের কন্যাদের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে না, কোন পুরুষের হাওয়া–বাতাস তাদের গায়ে লাগবে না? প্রকৃতপক্ষে ঐ মা–বাবারা কমবেশী এই ঠেলাধাক্কা চায়। ঐ যুবতীরাও সে জাতের, সেই শ্রেণীভুক্ত। অবৈধ জীবন ভোগই যখন তাদের কাম্য, তখন তাদের প্রেমিকের সঙ্গে ভাগাভাগিতে এমন দোষটা কি হয় শুনি? ওরা আর আমরা যখন একই পথের পথিক, তখন ভোগের ভাগাভাগি হওয়াটাই স্বভাবিক।

– মন্দ বলেননি। মন্তব্য করলাম আমি।

– জীবনচলার সঠিক পথ যে চেনে এবং সে পথে চলে, তাকে পথহারা করা খুবই কঠিন। যে সঠিক পথ চেনেও বাঁকা পথে চলে, আলো দেখলে চোখ জ্বালা করে, অন্ধকার দেখলে পুলকিত হয়, তাকে পথহারা করার প্রয়োজনই পড়ে না।

www.nagorikpathagar.org

কারণ, সে পথহারা হয়েই আছে। আমরা ঐ পথহারাদের খুঁজি, তাদেরই শিকার করি। কারণ, তাদের পথ আর আমাদের পথ এক মোহনায় একাকার হয়ে গেছে। রাজপথের লোক আমাদের পথে চলে না। তাই তাদের সঙ্গে দেখা হয় না। ওরা আমাদের ঘৃণা করে, আমরাও তাদের থেকে তফাৎ থাকতে ভালবাসি।

ঐ ষোড়শীকে আমরা কলুষিত করিনি। সে আগেই কলুষিত হয়ে গেছে, চরিত্র নষ্ট করেছে, সতীত্ব হারিয়েছে, আসল পতির আমানত আগেই খেয়ানত করেছে। আমরা শুধু এ দুর্বলতার সুযোগটাই নিলাম। কে কত ভাগ দোষী, এবার আপনরাই বিচার করুন। আমরা মস্তান, আমাদের দোষের আর বদনামের অন্ত নেই। আমরা সব রকমের অকাম-কুকাম করি। মহিলারা আমাদের কারণে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারেন না, এ অভিযোগ সব সময় শুনি। এ অভিযোগ কিন্তু আংশিক সত্য, সবটুকু সত্য নয়। যারা নিজেদের মানসম্ভ্রম রক্ষায় সদা সতর্ক ও সচেতন, এমন কোন নারীর সতীত্ব আমরা নষ্ট করিনি? চালচলনে নম্রতা ভব্যতার ছাপ রেখে যেসব মহিলা পথ চলেন, তাদের কেউ কি কোনদিন মস্তানদের হামলার শিকার হয়েছেন? যে নারী নিজেকে হেফাজত করতে শিখেছে এবং লজ্জা-শরমের আবরণ দিয়ে নিজেকে সব সময় হেফাজত করে, তেমন কোন নারী কি কখনও আমাদের হাতে অপমানিতা হয়েছেন? আপনারা এমন একটি দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করতে পারবেন না। আমরাও এসব নারীকে কখনো জ্বালাতন করার সাহসই করি না। তাদের চরিত্রই তাদের রক্ষা করে। আমরা তাদের দূর থেকে সালাম জানাই। কিন্তু যারা মান-সম্ভ্রমের পর্দা ছিন্ন করে আর লজ্জা-শরমের মাথায় পদাঘাত করে আওয়ারা সেজে প্রগতিবাদিনী হওয়ার অনুশীলনে ব্রতী হয়, তাদের দিকেই আমরা নিশানা ঠিক করি। ওরা সেজেগুজে দেহের কোন কোন অংশ নিরাভরণ করে রূপ-বৈচিত্রে অপরূপ করে যখন পথে নামে, তখন মনে হয়, তাদের প্রত্যেকেই রূপ-প্রদর্শনীর এক একটি ভ্রাম্যমাণ স্টল। এ স্টলগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকে, আমরা সঙ্গত কারণেই সাড়া দেই। এটাওকি আমাদের অপরাধ? আগুনের কাছে ঘি থাকবে অথচ ঘি গলবে না, এমন অদ্ভুত ও আজব কথা তো কেউ কোনদিন শুনেনি। পূর্বাকাশে মেঘ-মুক্ত দিনে সূর্য উঠেছে, কিন্তু আলো ছড়িয়ে পড়ছেনা, এমন কথা যদি কেউ বলে, তাকে কি পাগল ঠাওরাবেন্ না? পুর্নিমার চাঁদ আকাশে উঠলে তার স্নিগ্ধ আলো পৃথিবীতে পড়বেই। সেন্টের বোতল রাজপথে পড়ে ভেঙ্গে গেলে তার সুঘ্রাণ আশপাশে তো ছড়াবেই। ঐ সুন্দরীরা কেন আমাদের কামনার পূর্ব আকাশে উকি ঝুকি দেয়? কেন আমাদের মত কামুকের কামনার অগ্নি

www.nagorikpathagar.org

সান্নিধ্যে ঘি-বর্ণের স্নিগ্ধ তনু নিয়ে তাপ গ্রহণ করে? তাদের মা-বাবা কেন তাদের এভাবে ছেড়ে দেয়? কেন তারা চাঁদ হয়ে আমাদের স্নিগ্ধ আলো দান করে? সে স্নিগ্ধ আলো আমাদের মাতোয়ারা করে তোলে। তাই এ্যাপলো হয়ে অবতরণে উন্মুখ হয়ে পড়ি। তাদের চরিত্রের সুষমা সৌরভ পথের মাঝে কেন লুটায়? সেই সুঘ্রাণ আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে বলেই সৌরভের খোঁজে বের হয়ে পড়ি। এ অবস্থায় আর পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় আমাদের অপরাধ কতটুকু, তার বিচারের ভার আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম।

– কোন্ কোন্ শ্রেণীর রূপসীরা আপনাদের দৃষ্টি খুব বেশী আকর্ষণ করে?

– পথ চলে যেসব রূপসীরা রূপের পসরা অঙ্গে সাজিয়ে, তাদের আকর্ষণ-শক্তি অত্যন্ত প্রবল, চুম্বকের আকর্ষণ শক্তিকেও হার মানায়। তাদের হাঁটার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, তারা হাঁটছেন্ না, যেন নাচছেন। হেলেদুলে ছন্দে ছন্দে তারা পথ চলেন। সাজসজ্জা আর রূপ প্রদর্শনের মারাত্মক উন্মাদনা, অলক্ষ্যে যেন তারা ডাকছেন, কে কোথায় আছিস্, আয় তোরা ছুটে আয়, দেখে যা কেমন সেজেছি। দূরে দাঁড়িয়ে তোরা আমাদের রূপ আর সাজ-সৌন্দর্যকে উপভোগ কর। হাঁ, সাজই বটে। দুই ঠোঁট করেছেন বুলবুলির গুহ্যদ্বারের চেয়েও অধিক লাল। ব্লেড দিয়ে কামানো দুটি ভ্রুতে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরী বিদেশী ছাই দিয়ে কৃত্রিম ভ্রু রচনা করেছেন। কপালে দিয়েছেন ফোঁটা, যেন দিগদর্শনের বাতি, আকর্ষণের আরেক হাতিয়ার। রাঙা ঠোঁটে শিকার ধরতে যদি তারা ব্যর্থ হন, তাহলে কপালের টিপ যেন তাদের সহায়তা করে। গালে রংয়ের আস্তরণ, হাতে আর পায়ের নখে লাল বার্নিশ লাগিয়ে বাঘিনীর হিংস্র নখরের মত নিজের হস্তপদের নখর করেছেন শিকারের উদ্দেশে। ললনার সুবাসিত কুন্তল বাতাসে উড়ছে, এ যেন শরতের আকাশে বাতাসের জোরে কালো মেঘের আনাগোনা। নাভি পর্যন্ত গোটা পেট উন্মুক্ত, এ উন্মুক্ত স্থান যেন বায়ু চলাচলের বাতায়ন, খদ্দের আকর্ষণের শক্তিশালী হাতিয়ার। পরনে বগলকাটা ব্লাউজ। শাড়ী পরেছেন ক্রস বেল্টের মত, যাতে তার বাচ্চার খাদ্যভান্ডার বাচ্চার চাচারাও যেন অবলোকন করতে পারেন। সুঘ্রাণ আর সৌরভে গোটা বদন সুবাসিত। সে সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে ছন্দে ছন্দে কোথায় যে চলছেন তা তারাও জানেন্ না। তারা এভাবে বের হন অভিসারে, না সাজসজ্জা প্রদর্শনে, না নওজোয়ানদের পৌরুষ জাগিয়ে তোলার জন্যে? এ ধরনের নারী আমাদের রক্ত কণিকায় কামনার জোয়ার ডেকে আনে। রোমাঞ্চে শিহরিত হয় গোটা দেহ-মন। এ আগুনে আমরা পতঙ্গ হয়ে ঝাঁপ দেই। তারা এভাবে এ সাজে যৌন ছন্দে না

www.nagorikpathagar.org

চললে আমরাও যৌন উন্মাদনায় মেতে উঠতাম না। দিনরাত তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এখন আপনারাই বলুন, এই রাঙা ঠোঁট, এই কপাল ফোঁটা, পেট-নাভির প্রদর্শনী আর বক্ষদেশের লুকোচুরি খেলা দেখার পর মাথা ঠিক রাখা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? শুরুতে বলেছি, এখনও বলছি, বিশ্বাস করুন, এ পর্যন্ত আমরা কোন সতী নারীর সতীত্ব নষ্ট করিনি, যে নারী তার সতীত্ব রক্ষায় সর্বদা সচেতন। বোরকা পরিহিতা কোন সুন্দরীর রূপ-সৌন্দর্য ভোগ করার জন্য বোরকার নেকাব আমরা খুলিনি। শালীন পোশাক পরিহিতা কোন ললনার মুখোমুখি হয়েও আমরা কখনও কটু মন্তব্য করিনি। আমরা চরিত্রহীন হলেও একথা বুঝি যে, রূপ-সৌন্দর্য আল্লাহর দেয়া এক নেয়ামত। এ নেয়ামতের যারা হেফাজত করে, আবরণ দিয়ে বাইরের দূষিত বাতাস আর রোগবীজাণু থেকে আড়াল করে রাখে, তাদের স্বভাব-সৌন্দর্যে কোন কালিমা পড়ে না, রোগবীজাণু আক্রান্ত করে না। বাকলে ঢাকা কলায় ময়লা লাগলেও সে ময়লা মুছে ফেলা যায়, ভিতরে প্রবেশ করে না। পানিতে পড়লেও ভিতরে পানি প্রবেশ করে না, বাকল থাকলে মাছি বসে না, রোগবীজাণু প্রবেশ করতে পারে না; কিন্তু বাকল ফেলে দিলে সাথে সাথে গলাধঃকরণ করা ছাড়া তা রক্ষা করা যায় না। যেসব নারী তাদের নারীত্ব সতীত্ব আর সম্ভ্রমের পর্দা ফেলে দেয়, তারা খোসাবিহীন কলার মত মূল্যহীন হয়ে পড়ে, মনুষ্যাকৃতির মনুষ্য নামের বীজাণুবাহী মাছি আর পিঁপড়ার খোরাকে পরিণত হয়। আমাদের টার্গেট ঐ খোসাবিহীন কলার মত সম্ভ্রমের আবরণমুক্ত নগ্ন চরিত্রের নারী।

আমরা মনে করি, যে নারী লজ্জা-শরম হারায়, সে সবই হারায়। যে নারী সম্ভ্রমের আবরণ ছিন্ন করে, সে নারী নারীত্বের উপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করে।

– বাহ্! অনেক দার্শনিক বক্তাও তো আপনার মত বক্তৃতা দিতে পারবেন না। আপনার বক্তব্যে কোন ভেজাল নেই, যত ভেজাল সবই হল.......।

– আমার চরিত্রে, তাই না?

– আপনার দিকটা আপনিই ভাল বুঝেন।

– বুঝি বলেই এসব কথা বলতে পারলাম। বিশেষ করে আপনাদের মত লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কথার মান-স্ট্যান্ডার্ড উন্নত হওয়াই উচিত।

– চমৎকার! অদ্ভুত আপনার সমন্বয়ী গুণ। অন্তত আমি মনে করি। যে বস্তু যত বেশী মূল্যবান, তার রক্ষাব্যবস্থা ততবেশী মজবুত হওয়া উচিত। সিন্ধুকে স্বর্ণ

www.nagorikpathagar.org

রাখা হয়, কিন্তু লোহা খোলা মাঠে পড়ে থাকে। সোনা বিক্রি হয় তোলার ওজনে আর লোহা বিক্রি হয় টন আর হন্দরের ওজনে। নারীর সতীত্ব দেহের কোন বিশেষ গোপন স্থানে নয়, নারীর সতীত্ব সারা অঙ্গে, মনে, চোখে–মুখে, চুলে–পায়ে, পেটে পিঠে, চালচলনে, কথাবার্তায়, কৈশোরে যৌবনে। সুতরাং সতীত্বের একটি দিক আক্রান্ত হলে গোটা সতীত্বই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। একথা শুধু নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, পুরুষের ক্ষেত্রেও।

– সব কথার বড় হল, আমি যা বুঝি তা পালন করতে পারছি না। এর কি কোন ওষুধ আছে?

– ওষুধ অবশ্যই আছে, তবে আপনার মত রোগীদের নিরাময়ে এ ঔষধ কাজে আসবে কিনা তাতে আমার সন্দেহ রয়েছে। কারণ, যারা বুঝে বেশী, মানে কম, অত্যন্ত কম, এমনকি মানার পরিমাণ কোন কোন চরিত্রে শূন্যের কোটায়, তাদের অন্তরে জাহেলিয়াতের মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ।

– তবুও ওষুধটার নাম বলুন।

– আপনার জন্য এ ওষুধ হলো আপনার বিবাহযোগ্যা বোন।

– এ কথার মানে?

– এ কথার মানে হল, যখনই আপনি রূপসীদের পিছনে পিছনে দৌড় শুরু করবেন, এর আগে ভাববেন, আপনার ঘরেও এ বয়েসী আপনার একটি বোন আছে। আপনার বোনের পিছনেও যদি অন্য কোন যুবক দৌড় দেয় তাহলে আপনার কেমন লাগবে? এ চিন্তাটা বাড়িয়ে তুলন। তাহলে যে ব্যাধিতে ভুগছেন তা থেকে হয়ত মুক্তি পেতে পারেন। আপনি যে রাজনৈতিক দলের লোক হয়ে লাঠিয়ালী করেন, তারা কি আপনার বাবার চাকুরীর পরও লাঠিয়াল হিসাবে আপনাকে রাখবে?

– আপনার শেষ কথাগুলো আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমি এমন করে কখনও ভাবিনি। আপনার কথাগুলো হয়ত আমাকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনিই আমার এ মরণব্যাধির ওষুধ। আপনি যদি বিরক্ত না হন, তাহলে মাঝে মাঝে আপনার অফিসে আসব।

– অবশ্যই আসবেন, সাদর অভ্যর্থনা জানাব।

– আস্‌সালামু আলাইকুম।

– ওয়াআলাইকুমুস সালাম।

www.nagorikpathagar.org

সিনেমা আমাকে মস্তান বানিয়েছে

মস্তানদের সাথে আমার উঠাবসা কখনও ছিল না এবং এখনও নেই, বরং তাদের ভয়ে ভীত আমি থাকি সর্বক্ষণ। প্রত্যেক সরকার তাদের পোষেণ, তাই ভয় করি বেশী। কে কিভাবে মস্তান হয়েছে, তা জানার আগ্রহ হঠাৎ একদিন আমার মাথায় চাপে। তাদের মনের কথা নিয়ে একটি বই রচনার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল আমার বয়স। তাদের সাথে মেলামেশা করার মত বয়স আমার নেই। এ বাধা থাকা সত্ত্বেও আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চিন্তায় তাদের সাথে মোলাকাতের জন্য মাধ্যম তালাশ করতে লাগলাম। একজন মস্তানকে টার্গেট করলাম। তার সঙ্গে কার চেনাজানা ও বন্ধুত্ব সম্পর্ক আছে, তা তালাশ করতে থাকি। অনেককে জিজ্ঞাসা করলাম; কিন্তু কেউই আমাকে সাহায্য করতে পারলেন না। একদিন আমার এক ছাত্রের কাছে বিষয়টা পাড়লাম। মস্তানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের কারণ জানতে চাইল সে। আমি সবিস্তারে তাকে কারণ বললাম। সে তখন আমাকে অভয় দিয়ে বলল, আপনাকে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তিনি আমার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসেন। আমার আব্বা কিন্তু চান না যে, তিনি আমাদের বাসায় আসেন। আমার নানাবাড়ীর দিকের আত্মীয়, তাই মায়ের আদর তিনি পান। আমি চেষ্টা করব, তবে হয়ত সময় লাগবে।

আমি যেন আসমানের চাঁদ হাতে পেলাম। ছাত্রটিকে ব্যাপারটা স্মরণ রাখার তাগাদা দিয়ে চলে এলাম। কিন্তু এরপর দুমাস হয়েছে অতিবাহিত হয়েছে, কোন সাড়া নেই। একদিন ছাত্রটিকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে সে বলল, গত দু'মাসের মধ্যে তিনি একদিনও আমাদের বাসায় আসেননি। কোন এক বন্দুক লড়াইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার হয়ে জেলে আছেন। তবে শুনেছি শীঘ্রই ছাড়া পেয়ে যাবেন।

ছাত্রটির সঙ্গে আমার আলাপের পর আরও দশ পনর দিন চলে গেল। আমি তখন এই টিউশনি ছেড়ে দিয়েছি। একদিন ছাত্রটি বিয়ের একখানা কার্ড হাতে নিয়ে আমার অফিসে আসে। তার ছোট চাচার বিয়ে। তার মাধ্যমে জানলাম, জামিনে মস্তান ছাড়া পেয়েছেন, বিয়েতে আসবেন। বিয়ের দিন মস্তানের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে পারবে বলে আমার ছাত্রটি আশ্বাস দিল।

নির্দিষ্ট দিনে আমি বিয়ের আসরে যোগ দিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায়

www.nagorikpathagar.org

নেয়ার সময় আমার ছাত্রটি এসে কানে কানে বলল, স্যার, আপনার ঐ লোকটি এসেছে। আমি তার সঙ্গে আলাপ করেছি। তিনি রাজী আছেন। একটা সুযোগ আছে স্যার, আমাদের বাসায় এখন কেউ নেই। আপনি তাকে নিয়ে বাসায় চলে যান। তিনি আমাদের প্রয়োজনেই বাসায় যাচ্ছেন। আমরা না ফেরা পর্যন্ত বাসায় থাকবেন। আমার ছোট ভাইও আপনাদের সাথে যাবে। আপনি কাজ সেরে চলে যেতে পারবেন। কি কি আলাপ করেন, তা আমাকে জানাবেন কিন্তু।

ছাত্রটি একটা গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিল। এ গাড়ী নিয়ে আমরা তিন জন বাসায় চলে গেলাম। ড্রয়িং রুমে বসলাম। এ বাসার লোকজনের সাথে আমার কি সম্পর্ক, মস্তান যুবক ভালভাবেই জানেন। তিনি বললেন–

– আপনার সুনাম অনেক শুনেছি, কিন্তু আপনাকে দেখিনি। আজ আপনাকে দেখে খুব খুশী হলাম। টিউশনিটা ছেড়ে দিলেন কেন, ওরা তো আপনাকে ছাড়তেই চায় না। তারা খুব দুঃখ পেয়েছে। আমি বললাম, ওর বাবা আমার বন্ধু মানুষ। টিউশনিটা আমার পেশা নয়। তাই বন্ধুর অনুরোধে মাস ছয়েক তাঁর বড় ছেলেকে পড়িয়েছি। এখন তার পরীক্ষা শেষ হয়েছে, আমারও ব্যস্ততা বেড়ে গেছে, তাই ছেড়ে দিলাম। আমার কথা শেষ হওয়ার পর মস্তান বললেন–

– আপনি কি আমাকে চিনেন? তাকে যে আমি হাড়ে হাড়ে মর্মে মর্মে চিনি এবং তাকেই যে অনেক দিন ধরে খুঁজছি, তা গোপন রেখে বললাম,

– হাঁ, আপনি ওদের আত্মীয় এবং অমুকের ছেলে, শুধু এটুকুই জানি। এ পরিচয়ই আমার জন্য যথেষ্ট।

– আমার সম্পর্কে আর কিছুই জানেন না?

– না, অধিক কিছু জানি না, আপনার সম্পর্কে বরং আপনিই কিছু বলুন। লেখাপড়া কি চালিয়ে যাচ্ছেন?

– না, এইচএসসি পাস করে সামনে আর অগ্রসর হয়নি।

– বাধাটা কে দিল?

– কেউ দেয়নি, আমার বাধা স্বয়ং আমিই।

– এখন কি রাজনীতি করেন?

– হাঁ, করি, তবে বাবার রাজনীতি করি না।

– বাবার রাজনীতি কেন করেন না?

– এতে আমার পোষায় না।

– পোষায় না কথাটার অর্থ কিন্তু বুঝলাম না।

– বাবার রাজনীতি করে অর্থ রোজগার করা তো সম্ভব নয় (অট্টহাসি)।

www.nagorikpathagar.org

– তাহলে কোন্ দল করেন?

– নির্দিষ্ট কোন দল বা সংগঠনের কাজ করি না। চুক্তি ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে কাজ করি। অফারের সাইজ অনুযায়ী লাঠি ঘুরাই। (আবার অট্টহাসি)।

– তাতে কি পোষায়?

– হাঁ, ভালই পোষায়।

– আপনি তো সচ্ছল পরিবারের সন্তান। অর্থাভাব তো নেই, লেখাপড়া কেন বাদ দিলেন? কি এমন ঘটল যে, লেখাপড়া বাদ দিতে হল?

– হাঁ, স্বীকার করি, আমি সচ্ছল পরিবারের সন্তান। অর্থাভাব নেই। সিনেমা দেখার অভ্যাসটা আমাকে বরবাদ করেছে। এখন আমি যে জীবন যাপন করছি, তা বলতে পারেন সিনেমা থেকে প্রমোশন পাওয়া জীবন। সিনেমা দেখে বিশেষ অভ্যাস আর চরিত্র গঠন করে রাজনীতির ময়দানে লাঠিয়ালী করছি। যেমন ধরুন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বের হয়, তাদের কেউ হয় আইনজীবী, কেউ হয় শিক্ষক, কেউ হয় অফিসের অফিসার, কেউ হয় ব্যবসায়ী, কেউবা হয় কনট্রাক্টর। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তো সবাই হয় না, হাজার দুহাজারে এক বা দুজন মাত্র। আমার ব্যাপারটাও তাই মনে করতে পারেন। জীবনের শুরুতে সিনেমায় ডুবে যাই, কিন্তু পরবর্তী জীবন অর্থাৎ আমার বর্তমান জীবন সিনেমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

– আপনি কি মনে করেন যে, বয়স্করা যে পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছেন, আপনি বা আপনার অনেক সাথী এ পরিবেশেরই শিকার হয়েছেন, প্রশ্ন রাখলাম আমি।

– নিশ্চয়ই, এ কথা একবার নয়, শতবার স্বীকার করব। মুরব্বীদের গড়ে তোলা সমাজে বেড়ে উঠা মানুষ আমরা। ঘরে যা শিখেছি, ঘর ছেড়ে আঙ্গিনায় এসে যা দেখেছি, আঙ্গিনা পার হয়ে রাজপথে পা রেখে যেসব দৃশ্য অবলোকন করেছি, সাজানো পরিবেশে বেড়ে ওঠে অবাধ বিচরণ করে যেসব উপকরণ আহরণ করেছি, তা দিয়ে গড়ে তুলেছি আমাদের জীবন। এ পরিবেশ আর জীবন বলতে আমি শহরের পরিবেশ আর জীবনকেই বুঝে থাকি। কারণ, শহরের পরিবেশেই আমাদের জীবন গড়ে উঠেছে।

শহর-পরিবেশের প্রভাবে আমরা প্রভাবিত। শহর জীবনে সিনেমার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সিনেমা হলগুলোর সামনে ঝুলানো বিরাট বিরাট নষ্টি-ফষ্টিমার্কা ছবি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

– আপনি কিভাবে আকৃষ্ট হলেন সে কাহিনী বলুন।

www.nagorikpathagar.org

– শুনুন। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হল, সাইনবোর্ডে আঁকা ছবি হাতছানি দিয়ে যেন আমাকে ডাকছে। সিনেমা হলের সামনে দেখলাম বিভিন্ন রয়সী মানুষের প্রচন্ড ভীড়। অধিকাংশই কিশোর আর যুবক। চিত্তবিনোদনের সুবর্ণ এবং সুলভ সুযোগ আমার শিশু মনকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়। ভাবলাম, এ সুযোগ তো আর হেলায় হারানো যায় না। চিত্তবিনোদনের এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভাল হবে। ভাল না হলে কি আমাদের মুরব্বীরা এ আয়োজন করে রেখেছেন? কি মজা! বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ছবিগুলো কথা বলে, হাসে, কাঁদে, গান গায়, নাচে, প্রেম করে, যুদ্ধ করে। এমন তেলেসমাতি খেলা না দেখে তো থাকা যায় না। হলের ভিতরে প্রবেশের ভীষণ কৌতূহল জাগে। একদিন এক সহপাঠীকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়লাম। নেশায় যেন হলাম গ্রেফতার। দিওয়ানা হলাম। তারপর এ নেশায় ডুবে থাকি, সম্মোহিত হয়ে পড়ি, নেশার আমেজ দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, নেশার ফাঁদে আটকা পড়ে যাই। বলতে পারেন, মস্তান জীবনে আমার প্রবেশ সিনেমার পথ ধরেই। আমার মত অনেকেই ছবি দেখে মত্ত হয়ে এ পথ ধরেছে। সিনেমা হলগুলো শুরু থেকেই মস্তান গঠনের ইনস্টিটিউশন হিসাবে ভূমিকা পালন করে আসছে।

সিনেমা হলে সিনেমা দেখানো হয়, এ জ্ঞান শৈশবেই আমার মত অনেকে অর্জন করেন। কিভাবে তারা এ জ্ঞান অর্জন করেন, সে কথা খুলে বলছি।

– আপনি যখন প্রথম সিনেমা দেখা শুরু করেন, তখন কোন্ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন?

– আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখন থেকে সিনেমা দেখা শুরু করি। শুরুর দেখাটা মা বাবা ছাড়া, পরে মা বাবার সংগে দেখেছি।

আমাদের অনেকেরই মা-বাবা বাসায় বিভিন্ন সিনেমা ম্যাগাজিন নিয়মিত রাখতেন এবং এখনও রাখেন। আমরা নিজ নিজ ঘরে বসেই দেখতে পারতাম বিভিন্ন চিত্রনায়ক ও নায়িকার নানা অঙ্গভঙ্গির ছবি। ঘরে বসেই পড়তে পারতাম তাদের রঙ্গ-রসের প্রেম প্রেম খেলার কথা ও কাহিনী। এ ধারা-প্রক্রিয়ায় আমাদের প্রত্যেকের না হলেও অনেকেরই সিনেমার প্রতি প্রগাঢ় ভালাবাসা সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায়, আমারও সিনেমার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টির মানসিকতা ঘর থেকেই শুরু।

– আপনার মা-বাবা কি বাসায় সিনেমার কাগজ রাখতেন?

– অবশ্যই রাখতেন এবং এখনও রাখেন। তাছাড়া যেসব দৈনিক পত্রিকা রাখতেন, সেসব দৈনিকের পৃষ্ঠাভর্তি সিনেমা বিজ্ঞাপন দেখতাম। এগুলো যে

www.nagorikpathagar.org

ভাল নয়, বরং মন্দ, এমন কোনদিন মনে করিনি এবং মা–বাবাও এসব যে মন্দ তা কোনদিন বলেননি। আমি ভাবতাম, এসব মন্দ হলে মা–বাবা নিশ্চয়ই এমন পত্র–পত্রিকা পয়সা দিয়ে ঘরে রাখতেন না এবং আমাদের সামনেও পাঠ করতেন না।

অনেক মা–বাবা সন্তানদের সাথে নিয়ে সিনেমা দেখতে যান। আমিও মা–বাবার সাথে সিনেমা দেখতে গিয়েছি অনেকবার। বাসায় ফিরেও মা–বাবার কণ্ঠে সিনেমার সংলাপ শুনেছি। আমিও বিভিন্ন সংলাপ মুখস্থ করে সমবয়সীদের কাছে পেশ করতাম। মা–বাবার সাথে সপ্তাহে অন্তত একদিন সিনেমা দেখাটা ছিল আবশ্যিক প্রোগ্রাম। অনিবার্য কারণে কোন সপ্তাহে সিনেমা দেখা বাদ গেলে মা–বাবাকে জ্বালাতন করতাম। কোন কোন ছায়াছবি দেখার সময় মা–বাবা নিজেদের মুখ লুকাছাপা করতে দেখতাম। তখন মনে করতাম, এসব দৃশ্য নিশ্চয়ই খারাপ, তাই মা–বাবা বোধহয় শরমে মুখ লুকাচ্ছেন। কি কারণে কোন্ দৃশ্য দেখে মা–বাবা নিজেদের মুখ লুকাছাপা করতেন, তা বুঝতে পারতাম আর সে দিকটাই বন্ধুদের কাছে এসে বলতাম। কারণ, মা–বাবা যেটাকে গুরুত্ব দেন, আমি কি এই দিকটাকে গুরুত্ব না দিয়ে পারি?

– তাহলে শৈশবেই আপনার পাকা বুদ্ধি ছিল, তা বুঝতে পারছি।

– না মাস্টার সাহেব, এসব বুঝতে পারছি এখন, তখন তো মা বাবাকে শুধু অনুসরণ করেছি। তবে হাঁ, যেসব মা–বাবা সিনেমা হলে সন্তানদের নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতেন না, তাদের একাংশের আচার–আচরণ, কথাবার্তা, বাসার পরিবেশ নিশ্চয়ই একটু ভিন্নতর হত। এমন মা–বাবাও ছিলেন, যারা তাদের ছেলেমেয়েদের উপর প্রখর নজর রাখতেন। তবে এসব মা–বাবা যখন দেখতেন যে, তাদের ছেলের দাড়ি–গোঁফ গজাচ্ছে, দেখতেও মাশাআল্লাহ্ বেশ বাড়–বাড়ন্ত, তখন ঐ শ্রেণীর মা–বাবা ছেলেদের 'লায়েক' ছেলে মনে করে হাল ছেড়ে দিয়ে শাসনের শক্ত আঁটুনিতে ফস্কা গেরো দিতেন। তাঁরা ভাবতেন, ছেলে আর লাইন ছেড়ে বেলাইনে চলবে না। মাঝপথে ভুল বুঝে হাল ছেড়ে দেয়া মা–বাবার সন্তানেরা অতিমাত্রায় সিনেমার দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি। আমার চেয়েও তারা কয়েক কদম অগ্রসর। আর এক শ্রেণীর মা–বাবা ছিলেন, তারা সব সময় নীতিকথার তুবড়ি মারতেন, কিন্তু তাদের মধ্যে নীতি মানার কোন আমল দেখা যেত না। ছেলেকে ধূমপান করতে দেখলে প্রহার পর্যন্ত করতেন। কিন্তু তারা ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করতেন না। ছেলেকে সিনেমা দেখতে নিষেধ করতেন

www.nagorikpathagar.org

বটে; কিন্তু নিজেরা গোপনে গোপনে সিনেমা দেখতেন। এমন মা-বাবার সন্তানেরা স্বাভাবিক কারণেই সিনেমার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। আমাদের দলে এমন ছেলেও আছে, যাদের মা-বাবা নেই, পরের হাতে লালিত-পালিত, তাদের অভিভাবকদের দেখেছি মানসিকতার দিক থেকে তিনটি শ্রেণীভুক্ত।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত অভিভাবকেরা মনে করতেন, ছেলেটির মা-বাবা নেই। এতিম-অসহায় ছেলেটিকে কঠোর শাসনে না রাখাই ভাল। এ সংবেদনশীলতা অনেক ছেলেকে সর্বনাশের পথে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তারাই, যারা লালন-পালনের বা শিক্ষাদানের অধিকার পেয়ে মনে করতেন যে, কত বড় এক মহান খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন, তাই আশ্রিত ছেলেটির পান থেকে চুন খসে পড়তে দেখলে অর্থাৎ, নিতান্ত নগণ্য অপরাধেও অত্যন্ত বেশী নির্মম আচরণ করতেন। এ কারণেই এধরনের আশ্রিত ছেলেরা বেপরোয়া হয়ে লাইন ছেড়ে বেলাইন ধরতে দেখেছি।

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত তারা, যারা একটা সীমা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে দায়িত্বের লাগাম একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। এ ছেড়ে দেয়া ছোকড়ারা কেউ কেউ লাইনে থেকেছে আবার কেউ কেউ লাইন ছেড়ে বেলাইনে চলে গেছে। এ পরিবেশ যাদের ঘরে বিরাজ করত, তাদের ঘরের প্রায় প্রত্যেক সন্তানই পরিবেশের শিকার হয়।

– নিশ্চয়ই এসব আপনার এখনকার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করছেন?

– জ্বি হাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বলুন এবার, দোষী কে? আপনারাই বিচার করুন। আমরা তো মস্তান, কিন্তু মস্তানরা তো সিনেমা হল তৈরী করেনি, ছায়াছবি নির্মাণ করেনি, ছায়াছবির কাহিনী রচনা করেনি আর প্রর্দশনীর অনুমতিও মস্তানরা দেয়নি। এসব যারা করেছেন, তারা মস্তানদের বাবার বয়সী। তারা এসব করার সময় কেন চিন্তা করেননি যে, তারা চরিত্র হননের যে জাল বুনে ছড়িয়ে রেখেছেন, সে জালে তো তাদের সন্তানেরাই আটকা পড়বে। জাতি গঠনের জিম্মাদারী যে সরকার নেয়, সে সরকারের তো একথা চিন্তা করা উচিত ছিল। জেনারেশনকে বদমায়েশ বানাবার মত বদমায়েশী ছবি কেন প্রদর্শনীর অনুমতি তারা দিলেন? মুরুব্বীরাও চিন্তা করেননি, সরকারও খবর রাখেননি, বরং ছাত্র-ছাত্রীদের কনসেশন রেটে সিনেমা টিকেট প্রদানের জন্য একবার সরকার বাহাদুর হল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশও দিয়েছিলেন। অনেক ছাত্রই এ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এক মন্ত্রী তো প্রতি ইউনিয়নে একটি করে সিনেমা হল স্থাপনে

www.nagorikpathagar.org

আগ্রহীদের সরকারী সহযোগিতা প্রদানেরও আশ্বাস দিয়েছিলেন। এবার ভেবে দেখুন, আপনারা যেখানে উৎসাহ দিচ্ছেন, কনসেশন রেটে সিনেমা টিকেট দিচ্ছেন, ইউনিয়নে ইউনিয়নে সিনেমা হল স্থাপনের জন্য সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করছেন, এমন মহৎ (?) কাজে কি আমরা সাড়া না দিয়ে পারি? আমরা এসব অনুশীলন করতে গিয়ে আমাদের কোন ক্ষতি হয়েছে বলে যদি মনে করেন, তাহলে এজন্য আমাদের কি দায়ী করবেন?

– না, আমি কখনও আপনাদের দায়ী করি না এবং করবও না।

– আমরা এখন যেমন, তেমন তো কখনও ছিলাম না। আমাদের চলাফেরার পরিধি যতদিন ছিল সীমিত, ততদিন আমরা ছিলাম ভাল ছেলে হিসাবে পরিচিত। যতদিন তথাকথিত আধুনিক আর সুসভ্য হওয়ার সুযোগ ছিল না, ততদিন রিপু ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। যেদিন শহর দেখলাম, মা বাবার বন্ধন মুক্ত হলাম, কালচার্ড হওয়ার তালিম নিলাম, উদার হওয়ার অনুশীলন শুরু করলাম, ফুলবাবু হয়ে চলতে লাগলাম, জীবনচলার ছকবাঁধা রুটিন ত্যাগ করে জীবনের দিগন্ত সম্প্রসারণের চেষ্টা শুরু করলাম, ঠিক সে সময় থেকে পশুত্ব যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, পশুর মত্ততা মানবিক আচার-আচরণের সাজানো বাগান তছনছ করে দিল।

পারিবারিক শাসন সীমানায় আমরা লজ্জা-শরমের সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতাম। পরনারীর দিকে চোখ তুলে তাকাতাম না। এ পরিবেশে ইন্দ্রিয় উষ্ণতা মাথা তুলবার সুযোগ পেত না; কিন্তু মুক্ত অঙ্গনে এসে যখনই পা রাখলাম, তখনই আমাদের জীবনে শুরু হল নৈতিক অবক্ষয়ের ধস।

সিনেমা হলগুলোতে প্রবেশ করে দেখলাম, এমন সব ছবি আর নাচ গান, রং-ঢং, যা আমাদের দেহ-মনে নতুন এক অনুভূতি আর আমেজ সৃষ্টি করল। যতই দেখতে লাগলাম ততই বিনোদনের নতুন পরিবেশে যেন মিশে যেতে লাগলাম। স্পষ্ট বুঝলাম, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আর সাধারণ লজ্জা-শরমের অনুভূতি যেন হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে এ বিশ্বাসই বদ্ধমূল হতে লাগলো যে, এগুলো সাধারণ অর্থে ছবি নয়, এসবের মাঝেই আমাদের জীবন। শুধু প্রেম আর প্রেম। শহরে এত প্রেম যে রয়েছে, তা আগে কোনদিন ভাবিনি। প্রেম যেন উপচে পড়ছে। যুবক-যুবতীর মধ্যে প্রেম প্রেম খেলা, প্রেমের মহড়া, প্রেমের মিলন, প্রেমের ফাইটিং, প্রেমের কেনাবেচা-এসব নিয়েই সিনেমা। এ প্রেম বিচিত্রার বিচিত্র রূপ দেখে আমরাও প্রেম প্রেম খেলার তরতাজা সঙ্গিনী খুঁজতাম। কিভাবে প্রেম করতে হয়, কিভাবে ধরা পড়লে লাইলী-মজনুর মত

www.nagorikpathagar.org

অভিভাবকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়, কিভাবে প্রেমিকা নিয়ে পালাতে হয়, এসব ইলিম–তালিম আমরা সিনেমার মাধ্যমেই পেয়ে যেতাম। ঘরে ফিরে শুরু করতাম বাস্তব অনুশীলন। আমরা যেন এমন করতে পারি, এমন হতে পারি, এ কামনা–বাসনাও মনে জাগত। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে মনে মনে প্রেমিকা তালাশ করতাম। টার্গেট ঠিক করে প্রেমের ঢিল ছুঁড়তাম। কোনটা কাজে লাগত আবার কোন কোনটা ফসকে যেত। রাত জেগে প্রেমেরই জাল বুনতাম। অধিক রাতে যখন ঘুমের আমেজ খুব বেশী আসত, তখন ঘুমিয়ে পড়তাম। খোয়াব দেখতাম প্রেম খেলার সাফল্য আর ব্যর্থতার। এ ব্যাপারে কোন্ বন্ধুর কি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে, কে কোন্ খোয়াব দেখেছেন, কে কিভাবে অনুশীলন শুরু করেছেন, তা নিয়ে আলোচনা হত আমাদের মধ্যে।

– আপনিও তাহলে অনুশীলনে ব্যস্ত ছিলেন?

– নিশ্চয়ই।

– সরকারী সেন্সর বোর্ড, ছবির কাহিনীকার, পরিচালক, প্রযোজক এবং সিনেমাহলগুলো সম্পর্কে আপনার এখনকার মূল্যায়ন কি?

সরকারী সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র শিরে ধারণ করে যেসব ছায়াছবি প্রদর্শিত হত, আমরা সে মডেল অনুসরণ করতাম। আমরা চিন্তা–ভাবনাও করতাম সেই ধাঁচে। এক কথায় বলা যায়, প্রেম আর মারদাঙ্গার সিনেমা আমাদের প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশী। এসব ছবির কাহিনীকার, পরিচালক ও প্রযোজকদের মধ্যে কোন মস্তান ছিল না, একথা তো আপনারা স্বীকার করবেন। নতুন নূতন ছায়াছবি প্রেমের নতুন নতুন টেকনিক শিখাচ্ছে। এজন্য প্রেমের জ্বালায় এত অস্থিরতা। এ অস্থিরতাই আমাদের অনেককে একসাথে পাঁচ সাতটা প্রেম করার শক্তি–সাহস যুগিয়েছে। সিনেমা হলগুলো প্রেমের পাঠশালা, সমাজ হচ্ছে সেই শিক্ষার অনুশীলন ক্ষেত্র। এজন্য যে যেমনভাবে পারে প্রেম করছে। ধর্ষণ অপহরণ হল প্রেম–উন্মাদনার প্রকাশমাত্র। এবার বলুন, এ কান্ডকারখানার জন্য মস্তানরা কতটুকু দায়ী?

– আমি তো আপনাদের দায়ী করি না।

– আমরা এত হিংস্র হলাম কিভাবে, তাও শুনুন। আপনাদের তৈরী মারদাঙ্গা সিনেমা আমাদের সে তালিমই দিয়েছে। এ মারদাঙ্গা বা ফাইটিং সিনেমা দেখে রপ্ত করলাম কিভাবে প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে হয়। কিভাবে আর কোন্ টেকনিকে নাকে–মুখে ঘুষি মেরে রাস্তায় ফেলে দিতে হয়। কিভাবে পিস্তল উঁচিয়ে পথচারী থেকে টাকা ছিনিয়ে নিতে হয়। কিভাবে সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

করে সমাজের সমঝদার বিবেকগুলোকে স্তব্ধ করতে হয়। কিভাবে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহসী পদক্ষেপকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে দুর্বল করে তুলতে হয়, কিভাবে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে পরের কন্যা-জায়া-জননী অপহরণ করতে হয়, কিভাবে সমাজে ভীতি সঞ্চার করে প্রচুর অর্থ রোজগার করতে হয়, সমাজে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করে চলতে হয়, এসবই শিখার সুযোগ পেলাম ঐ ফাইটিং বা মারদাঙ্গা সিনেমা থেকে। দোষটা কার, আপনারাই বলুন।

আমরা চোখ খোলার পর এসব যদি না দেখতাম অর্থাৎ, আপনারা এসবের ব্যবস্থা করে না রাখতেন, তাহলে মারদাঙ্গার মানসিকতা আমাদের মধ্যে কখনও সৃষ্টি হত না। এ সত্যও কি আপনারা স্বীকার করেন না? এসব যারা করল, আমাদের জীবন যারা বরবাদ করল, যারা সামাজিক মূল্যবোধের বারোটা বাজাল, যারা সুকৌশলে লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে সমাজে বেহায়াপনার সয়লাব সৃষ্টি করল, যারা কিশোর-কিশোরী আর যুবক-যুবতীদের পরিচ্ছন্ন সহজ-সরল মন-মানসে গঠনমূলক কোন চিন্তা-ভাবনার বীজ বপন না করে হৈ-হল্লোড় আর উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ বপন করল, যারা যৌন আবেদনমূলক নাচগানের জমকালো পরিবেশ সৃষ্টি করে তারুণ্যের গরম খুন টগবগিয়ে তুলল, যারা মা-বাবার সুসন্তানদের নানা সম্মোহনী হাঁকডাক দিয়ে সম্মোহিত করে কুপথের-পথিক বানাল, তারাই প্রতিবছর সরকারী পুরস্কারে হয় পুরস্কৃত। আপনারা তাদের বলেন শিল্পের রূপকার, সংস্কৃতিসেবী, প্রগতিবাদী, অথচ তাদেরই সম্মোহনী জালে আটকা পড়ে যারা সর্বস্ব হারায়, তারা শুনে সমাজের দশ জনের গালি আর খায় পুলিশের ঠ্যাঙ্গানি। তাদের নাম রাখা হয় মস্তান।

দেশী ছবি আমাদের মস্তানী প্রশিক্ষণ দিতে যতটুকু বাকী রাখে, সেই অপূর্ণ অংশটুকু পূরণ করে দেয় বিদেশ থেকে বৈধ ও অবৈধভাবে আনা ইংরেজী ছবিগুলো। নানা কারণে দেশী ছবিতে থাকে না চুম্বন, সমুদ্রে নগ্ন স্নান, সমুদ্র সৈকতের সূর্য স্নান ও যৌন ক্রিয়াকাণ্ডের দৃশ্য। অবৈধভাবে সন্তান ধারণ এবং অবৈধ সন্তানের মা হওয়ার গর্বের সংলাপ দেশী ছবিতে প্রায়ই থাকে না; কিন্তু এসব থাকে আমদানী করা কোন কোন বিদেশী ছবিতে। এবার বলুন তো, এসব ছবি আমদানী করে কারা? আমদানীর অনুমতি দেয় কারা? প্রদর্শনের বৈধ সার্টিফিকেট প্রদান করে কোন্ কোন্ মহাত্মন? গোপনে যেগুলো অনুমতির সার্টিফিকেট ছাড়াই প্রদর্শিত হয়, সেসব ফিল্ম কোন্ আইনের লোকেরা

www.nagorikpathagar.org

মাসোহারা খেয়ে প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয়? এজন্য কি মস্তানরা দায়ী? পাপের হাজারটা পথ যারা করে দিল, তারা পাপ করে না, পাপ করে তারা, যারা এ পথে চলে বা চলতে বাধ্য হয়- অদ্ভুত এ বিচারবোধ!

এবার আপনারাই বলুন, আইনের ছাড়পত্র পেয়ে চুম্বনের দৃশ্যসম্বলিত যেসব ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়, সেসব দৃশ্য থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি আমরা সিনেমা হলের বাইরে এসে তেমন দু'চারটা কান্ড ঘটাই, তাহলে কোন্ বিচারে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করবেন? সমুদ্র সৈকতে যা হয়, আমরাও যদি তাই করি আর সে বিদেশী ফর্মূলা অনুযায়ী অবৈধ মেলামেশা শুরু করি, তাহলে কি আমরা অপরাধী হব? সংস্কৃতির সেবকরা, সংস্কৃতির ব্যবসায়ীরা আর সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক সরকার এ ব্যবস্থাটা করে না রাখলে কি আমরা এসব প্রশিক্ষণ নিতে পারতাম?

- সিনেমা আমাদের হাতে-কলমে অবাধ মেলামেশার তালিম দিয়েছে।
- সিনেমা আমাদের লজ্জা-শরমের পর্দা অপসারণ করেছে।
- সিনেমা আমাদের শিখিয়েছে পরের মেয়ে নিয়ে. কিভাবে নিরুদ্দেশ হতে হয়।
- সিনেমা শিখিয়েছে জীবনজ্বালা দূর করার জন্য বাঈজীদের আস্তানায় ভোগের মত্ততা নিয়ে কিভাবে ডুবে থাকতে হয়।
- সিনেমা শিখিয়েছে মুরুব্বীদের থেকে অধিকার আদায়ের জন্য কড়া কড়া ডায়লগ কিভাবে ছাড়তে হয়।
- সিনেমা শিখিয়েছে মানবিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে পাশবিকতা আয়ত্ত করে হিংস্রতা প্রদর্শন করে কিভাবে বীর হতে হয়।
- সিনেমা শিখিয়েছে বেশভূষা, চুল আর চেহারায় কিভাবে ঘন ঘন পরিবর্তনের রং লাগাতে হয়।
- সিনেমা শিখিয়েছে পরের কন্যাকে ছলেবলে-কৌশলে কিভাবে বশ করে নিতে হয়।
- সিনেমা শিখিয়েছে কিভাবে সমাজকে চমক লাগিয়ে দেয়ার মত প্রেম-কাহিনীর জন্ম দিতে হয়।
- সিনেমা শিখিয়েছে খুন-খারাবী করে কিভাবে হীরো হতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

– আপনার বর্তমান জীবনের জন্য সিনেমা দায়ী, তা স্বীকার করি। কিন্তু বর্তমান জীবন যে অত্যন্ত ভয়ংকর, এজীবন কেন ছাড়তে পারছেন না?

– জালে আটকা পড়ে গেছি।

– ইচ্ছা করলে বেরিয়ে আসতে পারেন।

– না, সম্ভব নয়।

– আমি মনে করি, ইচ্ছা করলে পারেন। আপনাকে আর বিরক্ত করছি না, এবার চলি। আবার দেখা হবে। বিদায়।

www.nagorikpathagar.org

মেলা প্রদর্শনী আমাকে মস্তান বানিয়েছে

এ আলোচনায় আমি যার জবানবন্দী পাঠকদের কাছে পেশ করছি, তিনি অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর মস্তান, কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে অমায়িক, সদালাপী, শান্ত এবং খোশমেজাজী, তবে এ্যাকশনে আর অপারেশনের যেন হিংস্র এক চিতা বাঘ।

চ্যানেল মাধ্যমে কয়েকদিন চেষ্টার পর সাক্ষাতের অনুমতি পেলাম, কিন্তু আলোচনার স্থান নিয়ে লাগলো গন্ডগোল।

একটি ছাত্রাবাসের যে কক্ষে তিনি বাস করেন, তিনি চান, আমি তার সংগে সাক্ষাৎ করি সেখানে। আমি রাজী হইনি। তিনি তার সিদ্ধান্তে অনড়। বাধ্য হয়ে আমার প্রয়োজনেই মাধ্যম ব্যক্তিটিকে সাথে নিয়ে গেলাম ছাত্রাবাসের সেই নির্দিষ্ট কক্ষে, নির্ধারিত দিনে এবং যথাসময়ে। কক্ষের চৌকাঠ পার হওয়ার আগেই দেখি, তিনি কক্ষে আছেন বটে, কিন্তু ১০/১২ জন সাথী পরিবেষ্টিত অবস্থায় আলোচনায় ব্যস্ত। চৌকাঠ আর ডিংগাতে পারলাম না। এখান থেকেই সালাম দিলাম। সালাম দেয়ার সাথে সাথে আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। বৈঠকের প্রত্যেকেই আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি যার সাক্ষাৎপ্রার্থী, তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে এসে আমার সংগে করমর্দন করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। একটা ইমার্জেন্সী মিটিংয়ে বসেছি। আপনার সঙ্গে আজ আর বসতে পারছি না। কষ্ট দিলাম। আপনাকে এখানে আর আসতে হবে না। আমিই আপনার বাসায় আসব আগামীকাল সন্ধ্যার পর। পাক্কা কথা দিলাম। আপনি কাল বিকালে ওকে (মাধ্যম ব্যক্তিটিকে) পাঠিয়ে দেবেন। সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। কারণ, আমি তো আপনার বাসা চিনি না।

আমি রাজী হলাম। অতঃপর বিদায় নিয়ে চলে এলাম। পরদিন তাকে আনার ব্যবস্থা করলাম। তিনি এলেন একা। সৌজন্যবোধ এবং সামাজিক আচার ও ভদ্রতা জ্ঞান তার টনটনে। দুই কেজি ওজনের মিষ্টির এক প্যাকেট নিয়ে এলেন ঠিক আত্মীয় বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমার বাচ্চাদের আদর করলেন। ছোট ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন, সোহাগ করলেন। গিন্নীকে শুধু এতটুকু পরিচয় দিলাম, এ ভদ্রলোক আমার খুবই চেনাজানা, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। রাতে তিনি আমার সঙ্গে আহার করবেন। সাধ্যমত ভাল আহারের ব্যবস্থা কর। আমি এখন তাকে নিয়ে নদীর ধারে

www.nagorikpathagar.org

বেড়াতে যাচ্ছি। এসে খাওয়া-দাওয়া করবো।

তখন আমার বাসা বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরেই ছিল। আমার বাসার পরিবেশ ইন্টারভিউ নেয়ার মত ছিল না, তাই নদী তীরেই মাধ্যম ব্যক্তিটিসহ তাকে নিয়ে গেলাম। তিনিও এ প্রস্তাবে আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন।

নদীর তীরে বসে জবানবন্দী নেয়ার শুরুতে তাকে প্রথমেই প্রশ্ন করলাম, 'এই বিপ্লবী' পথে কিভাবে আপনি আসলেন? ইচ্ছা করেই 'বিপ্লবী পথ' শব্দ দু'টি উচ্চারণ করলাম। কারণ, চোখে চোখ রেখে 'মস্তানী পথ' উচ্চারণ করতে বিবেক বাধা দিল, কিন্তু ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন যে, আমি 'মস্তানী পথ'ই বলতে চাই, কিন্তু সৌজন্যের খাতিরে 'বিপ্লবী পথ' বলছি।

তিনি অট্টহাসি দিয়ে বললেন, কিভাবে মস্তান হলাম তাই তো জানতে চাচ্ছেন? ঠিক বলিনি? আমিও তার সঙ্গে হাসলাম, আর বললাম, না না, তা বলতে যাবো কেন? যাহোক, এরপর শুরু হলো তার জবানবন্দী। এভাবে শুরু করলেন-

- আমি এক শ্রমিক নেতার ছেলে। আমাকে মস্তান বানিয়েছে আনন্দমেলা আর প্রদর্শনী। সংক্ষেপে সে কাহিনীই বলছি। ১৯৭৯ সালের কথা। কিছুদিন আগে কলেজে ভর্তি হয়েছি। এর আগে আমি কখনও কোন মেলায় বা প্রদর্শনীতে যাইনি। পড়াশুনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। বড় ভাই, বাবা এবং মায়ের শাসনও ছিল বেশ শক্ত। এসএসসি পরীক্ষায় খুবই ভাল রেজাল্ট করি। অভিভাবকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি একটা কিছু হবো। আমাকে নিয়ে তারা বিরাট আশা করতেন, হয়ত স্বপ্নও দেখতেন। কলেজে ভর্তির পর তাদের শাসনের রশি বেশ শিথিল হয়ে পড়লো। ফলে, নিজেকে খুব মুক্ত মনে হলো। শাসনের শিকল খুলে দেয়া হলো। আমি মুক্তির আনন্দ নিয়ে আপন মনের মুক্ত আকাশে যেন উড়তে শুরু করলাম।

একদিন মায়ের অনুমতি নিয়ে জিঞ্জিরার এক আনন্দমেলায় দু'জন বন্ধুর সঙ্গে গেলাম। যে স্থানটিতে আনন্দ মেলা হচ্ছে, তা দূর থেকে নজরে পড়ছিল। গল্পের স্বপ্নপুরীর মত। নানা রংয়ের বিজলী বাতিতে প্যাভেলিয়ানটি সাজানো হয়েছে। আলোয় আলোময়। অপূর্ব আলোকসজ্জা দূর থেকেই নজরে পড়লো। কোন কোন বাতি স্থিরভাবে আলো দিচ্ছে, কোন কোনটির আলো যেন লাফাচ্ছে, কোন কোনটি নাচছে, কোন কোনটি দৌড়াচ্ছে, কোন কোনটি যেন জোনাকি পোকার মত আলো-আঁধারে খেলা করছে। চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে মনটা আনন্দে নেচে উঠল। মনে হল,

www.nagorikpathagar.org

ভিতরে ঢোকার আগেই আমাদের মন অর্ধেক পরিতৃপ্ত। এ আলোক সজ্জার আকর্ষণ ছাড়াও মাইকযোগে প্যাভেলিয়ান থেকে ঘোষক মেলার বিভিন্ন আকর্ষণ চমৎকার ভাষায় এবং আকর্ষনীয় স্বরেও আকৃষ্ট করার ঢংগে নানাভাবে কাছের ও দূরের মানুষকে আহবান করছেন। যতই নিকটবর্তী হচ্ছি, ততই আনন্দবোধ করছি আর ভিতরে প্রবেশের কৌতূহলও তত বাড়ছে। তারপর প্যাভেলিয়ানের কাছে পৌছলাম, টিকেট করলাম, ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভিতরে প্রবেশ করে মনে হলো, দর্শক আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা ভিতরের চেয়ে বাইরেই যেন বেশী।

–ভিতরে প্রবেশ করে কি দেখলেন? প্রশ্ন করলাম আমি।

–দেখলাম অনেক কিছু। ভোগ করলাম, যোগও দিলাম অনেক কিছুতে। মেলার উদ্যোক্তাদের প্রচারিত বিজ্ঞাপনে আনন্দমেলা সম্পর্কে যা উল্লেখ আছে, তা তো অবশ্যই দেখলাম। তবে প্রচার বহির্ভূত বেশ কিছু আইটেমও ছিল মেলার অভ্যন্তরে। এসব আকর্ষণীয় আইটেমের প্রচার কালির কালো অক্ষরে কাগজে থাকে না বা সাধারণভাবে ঘোষণাও করা হয় না। মেলার আঙ্গিনায় প্রবেশের পর প্রথমেই নজরে পড়লো নৃত্য-গীতের আসর। ঘোষণা করা হয়, মক্ষীরাণীরা নৃত্য দিয়ে নাকি আমাদের চিত্ত ঠান্ডা করে দেবেন। তাদের নৃত্য-গান দর্শকদের জীবনের সকল জ্বালা, উৎকন্ঠা এবং পেরেশানী দূর করে দেবে।

জীবনে এসব দৃশ্য আর কোনদিন দেখিনি। তাই প্রচারণায় অস্থির হয়ে এবং মনে প্রচন্ড কৌতূহল নিয়ে চিত্তহারিণীদের নৃত্য-গান দেখতে ও শুনতে প্যানডালে প্রবেশ করলাম আমরা তিন জন। প্রবেশের দু'মিনিট পরই শুরু হল মক্ষীরাণীদের দর্শক সম্মুখে আগমন। একজনের পর একজন করে এলেন পাঁচ জন। শুরু হলো নৃত্য। নৃত্য তো নয়, বরং তা ছিল দেহ বিক্রির খদ্দের আকর্ষণের জন্য দেহের বিভিন্ন অংগের ঢেউতোলা জোয়ারের হুলস্থূলমার্কা বিজ্ঞাপন। হাততালি পড়ল। আমরাও জোরেশোরে হাত তালি দিলাম। নৃত্য কিন্তু শেষ হল না, চলতে লাগল। তালে তালে নাচ, নাচে নাচে একেবারে নেংটাই হল তারা। তাই পরিবেশন করা হল। এমনকি তাদের লজ্জাস্থানের কাপড়ও নাচের কলাকৌশল দেখাতে গিয়ে কৌশলে সরে গেল। দর্শকরা শীস আর কানফাটা হাততালি দিয়ে একথাই বুঝালো যে, আমরা যা দেখতে ইচ্ছা করেছিলাম, তাই দেখলাম। আমরা পরিতৃপ্ত হয়েছি। আমাদের জীবন সার্থক হয়েছে। চিত্ত আমাদের বিনোদিত হয়েছে। ভোগের সাগরে এভাবে নেংটা সাঁতার কাটতে চাই।

– আপনার প্রতিক্রিয়া কি ছিল? আমার প্রশ্ন।

– আমার জীবনে এধরনের দৃশ্য তো প্রথম দেখা। আমার কিন্তু ভাল

www.nagorikpathagar.org

লাগছিল না, অথচ আমার বন্ধু দুজন আনন্দিতই হয়। এই প্যানডেল থেকে বের হয়ে দেখি বিভিন্ন ধরনের জুয়ার আসর বসেছে এখানে সেখানে। আমার সাথী বন্ধু দুজন জুয়ার আসরে বসে পড়ল। তারা খেলল, আমাকেও খেলতে বাধ্য করল। আমি প্রথমে রাজী হইনি; কিন্তু আমাকে তারা চাপ সৃষ্টি করে জুয়া খেলতে রাজী করল। তারা দুজন যে পরিমাণ অর্থ দিয়ে খেললো, সবই হারালো, কিন্তু আমি কিছুই হারাইনি, বরং দ্বিগুণ পরিমাণ পেয়ে গেলাম। জুয়ার আসর থেকে উঠে দেখলাম, পতিতাদের একটি প্যানডেল। প্যানডেলের সামনে চায়ের দোকান। খদ্দেরদের এখানে প্রথমে বসতে হয়, চা খেতে হয়, লাইন করতে হয়। দু'বন্ধুর পীড়াপীড়িতে তিন জনই চায়ের দোকানে ঢুকলাম, লাইন ধরলাম, উপভোগ করলাম, জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। অর্থের বিনিময়ে নয়, চরিত্রের বিনিময়ে। গভীর রাতে বাসায় ফিরলাম। সকাল বেলায় আমার অভিভাবকরা আমাকে শুধু তিরস্কারই করলেন না, বাবা আমাকে প্রহার করলেন। মা বাধা দিলেন, বড় ভাই নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বাবাকেই সমর্থন করলেন। অভিভাবকরা সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাকে কলেজ হোস্টেলে দিবেন কঠোর শাসনে রাখার জন্য। হোস্টেলে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে পূর্ণ স্বাধীন হয়ে গেলাম। তারপর যত আনন্দমেলা হয়েছে, তার প্রায় সব কটিতেই আমি গিয়েছি। মেলায় গিয়ে যা দেখার বা করার আছে তাই দেখেছি এবং করেছি। কারণ, সুবিধা ও স্বাধীনতা প্রচুর। ঘুরাফেরার জন্য অনুমতি নেয়ার মত কোন অভিভাবক ছিলেন না। হোস্টেলে স্বাধীনভাবে নিজস্ব প্রোগ্রাম পালনের অবাধ সুবিধা থাকায় আমি সেই বহুমুখী সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি।

এইচএসসি পাস করলাম, কিন্তু রেজাল্ট তেমন ভাল হল না। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি। যা হবার হয়েছি, তা তো আপনি সবই জানেন। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ আনন্দমেলা আমার মত অনেকের জীবন শেষ করেছে। এখন ছাত্র নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে বাস করি বটে, কিন্তু পড়াশুনায় মন নেই, এখানে পড়াশুনার পরিবেশও নেই। এখন আমি অন্য মানুষ, যদিও এখন আমি মেলায় যাই না, কিন্তু এ মেলা আমাকে যে স্তরে পৌছে দিয়েছে, সে স্তরে আমার পরিচয় মস্তান। অতএব বুঝতে পারছেন, এসব মেলা বা প্রদর্শনী আমাদের কি করেছে?

– আপনি যখন ভাল–মন্দ বুঝতে পারছেন, তখন কেন এই পাপ–পঙ্কিল জীবন ত্যাগ করে ভাল জীবন বেছে নেন্ না?

– হাঁ, সবই বুঝি, কিন্তু পালাবদলের সকল পথ বন্ধ। জীবন পরিবর্তনের

www.nagorikpathagar.org

কোন পথই আমি খোলা দেখছি না। অভিভাবকরা আমাকে প্রায় ত্যাগই করেছেন। বাবা-ভাই যখন বাসায় থাকেন না, তখন মায়ের কাছে যাই। মা আমাকে সোহাগ করেন, কাঁদেন। তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। মাকে বলেছি, ভাই এবং বাবার সাথে আলাপ করে আমার বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। তাহলে আমি গত জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারব। দেশে থাকলে পরিবর্তনের কোন উপায় নেই। পরিবর্তনের চিন্তা করছি, একথা জানতে পারলে বন্ধুরা আমাকে তৎক্ষণাৎ শেষ করে দেবে। মা আলাপ করেছেন, অভিভাবক রাজী হয়েছেন।

– তাই করুন। তাহলে নিজেও বাঁচবেন এবং অভিভাবকদেরও টেনশন দূর হবে।

– হাঁ, সে চেষ্টাই চলছে অতি গোপনে। কথায় কথায় ব্যাপারটা আপনাকে বলে ফেললাম। আমার এ তৎপরতার কথা গোপন রাখবেন। আপনাকে কথা দিলাম, আমি দেশ ছাড়ার আগের দিন আপনার সঙ্গে দেখা করব। আসলে আমি ভাল থাকতে চাই। আমার মত অনেকেই আছেন, তারা ভাল থাকতে চান, কিন্তু পরিবেশ আর বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল ভাল থাকতে দেয় না। এ সত্য আপনারা হয়ত বুঝতে চান না এবং বুঝতে চেষ্টাও করেন না।

এ মস্তান যুবকের মধ্যে আমি এক চমৎকার মানুষ আবিষ্কার করলাম। যে মানুষের সঙ্গে বাইরের মানুষের কোন মিল নেই, তবুও বাধ্যতামূলক সহাবস্থান দুয়ের মধ্যে চলছে। এক পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত আবেগের সংগে বললেন, পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের ঠিক রাখতে পারিনি, তাই গালি শুনছি, কিন্তু পরিবেশের স্রষ্টারা কেন অভিযুক্ত হয় না?

এসব মেলা, আনন্দমেলা বা তথাকথিত প্রদর্শনীর আয়োজন কেন করা হয়, কেন বছরের অর্ধেকেই এসব মেলা-আনন্দমেলা চলে? এর দ্বারা জাতির লাভ-লাভ-লোকসান কি হয়? জাতীয় চরিত্রের কতটুকু এ মেলা আগে বাড়ায় বা পিছায়? সমাজে তার প্রভাব কতটুকু পড়ে এবং এর পরিণতি কি দাঁড়ায়? মেলার উদ্যোক্তারা, সমাজের মানুষ আর সরকার কি তা বুঝেন না? যদি বুঝে থাকেন, তাহলে এসবের কেন পৃষ্ঠপোষকতা করেন?

– এ প্রশ্ন তো আমারও।

বললাম আমি। হয়ত আরও দু'এক কথা বলতাম, কিন্তু তিনি আমাকে বাধা দিয়ে রীতিমত আবেগময় বক্তৃতা শুরু করলেন। আমি নীরব শ্রোতা হয়ে শুধু শুনতে লাগলাম। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতাম, তিনি উত্তর দিতেন।

www.nagorikpathagar.org

– (তিনি শুরু করলেন) আমি যদি বলি, এসব আনন্দমেলা কিশোর–যুবক তথা জাতির চরিত্র ধ্বংসের সুগভীর চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়, তাহলে কি ভুল বলা হলো? মোটেই ভুল বলিনি। যে আনন্দে নেই গোটা জাতির সম্পৃক্তি, যে আনন্দ মেলায় চরিত্রবান ও রুচিবান কোন মানুষ আসে না, যে আনন্দমেলায় থাকে চরিত্র বিনাশের সব রকমের আয়োজন, সে আনন্দমেলা তো চরিত্রহীনদের মেলা, এমন মেলা তো ম্যালাই হচ্ছে, সমাজ কি তা থেকে এক কণা ফায়দাও পাচ্ছে? যদি তা না পেয়ে থাকে, তাহলে সরকার কেন এসবে উৎসাহ দিয়ে থাকেন? উদ্যোক্তারা আর অনুমতিদাতারা কি বড় মস্তান নয়? তারা কি জাতীয় চরিত্র নাশের ভয়ংকর ভাইরাস নয়? জাতি কেন এদের গর্দানে হাত দেয় না?

– এতসব বুঝেও কেন এ পথে গেলেন? সরাসরি প্রশ্ন করলাম।

–তখন এতসব বুঝিনি। এখন বুঝি। সহজ ও সরল স্বীকৃতি।

–এখন তো বুঝলেন, তাই দলবলসহ এ্যাবাউটটার্ণ হওয়ার চেষ্টা করুন।

– আপনাকে তো আগেই বলেছি, দেশ ছাড়ার চিন্তা–ভাবনা করছি। হয়ত তা সম্ভবও হবে।

– আনন্দমেলা আর বিনোদনমূলক প্রদর্শনীর দর্শক হওয়া ছাড়া কি আর কোন ভূমিকা পালন করেননি?

–হাঁ, প্রথমে দর্শক হয়ে দর্শন করেছি, তারপর ভোগের ভাগী হয়েছি, অতঃপর দলবল গঠন করে বিনোদন ট্যাক্স আদায় করেছি।

– তা কিভাবে করলেন? বিনোদন ট্যাক্স তো সরকারের, আপনাদের নয়।

– আমরাই তো সরকারের দেয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করি। আমাদেরটা আমরা নিয়েছি, সরকারের অংশ সরকার নিয়েছে। ভাগ সমানে সমান, বুঝলেন তো? তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, আমিও হাসলাম। হাসি থামার পর বললেন, একটা ক্লাব গঠন করে ক্লাবের নাম দিয়ে রসিদ ছাপলাম। যেসব আনন্দমেলায় আমাদের অবস্থান ভাল, কোন বাধা আসলে মোকাবেলা করা সম্ভব মনে করেছি, সেসব আনন্দমেলায় সদলবলে প্রায়ই রসিদ পকেটে নিয়ে চলে যেতাম। প্রচুর অর্থ আদায় করতে পারতাম। মেলায় মোতায়েন আইনের লোকদের বখরা দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতাম।

– এভাবে কতদিন চলছিল?

– বেশী দিন চলেনি। প্রয়ি তিন বছর চলছিল। বখরার ভাগ–বাটোয়ারা নিয়ে আপোষে গোলমাল শুরু হলো। তারপর এ প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেল। দেশে সামরিক আইনও জারি হয়ে গেল।

-মেলায় কি পাওয়া যায়?

- একথা কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখেননি? মেলার পাশ দিয়ে কি কখনও যাননি? গিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন যে, মেলায় কি কি বস্তু পাওয়া যায়, তা মেলার ঘোষক সাহেব বিরতিহীন ঘোষণা করে যাচ্ছেন। এই তো হাউজি, জুয়া, ম্যাজিক শো, নৃত্য-গান, যাত্রা, নাটক এবং আরও অনেক কিছু। মেলায় অনেক কিছু পাওয়া যায়, যা মেলার বাইরে এত সহজে পাওয়া যায় না। মেলার যেদিকে হাত বাড়িয়েছি, সে হাত খালি ফিরে আসেনি। জীবন যেমন খুশী তেমন ভোগ করার অনেক উপকরণ মেলায় মওজুদ থাকে। পুলিশের ভয় নেই, পুলিশ আমাদের পাহারাদার। ভোগ-উপভোগ নির্বিঘ্নে যাতে করা যায়, সেজন্য পুলিশ আগন্তুকদের সহায়তা করে। রাষ্ট্রীয় আইন থাকে মেলা ব্যবস্থাপকের নিয়ন্ত্রণে, আইন সেখানে মেলার লাইনেই সোজা থাকে। সেখানে সুধা নয় সুরা গিলে ডুবে থাকা যায়, নির্ভয়ে জুয়া খেলা যায়, যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির অবাধ সুযোগ সেখানে। মেলায় যা হয়, সবই কানুনসিদ্ধ। মক্ষীরাণীদের নাচের দাপটে সব ব্যথা-বেদনা উপশম হওয়ার ব্যবস্থা আছে। চিত্তবিনোদনের জন্য বেচাকেনার এমন খুচরা ব্যবস্থা আনন্দমেলা ছাড়া আর কোথাও নেই। বিভিন্ন আমলের সরকার ছোট লোকদের বিনোদনের এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আর বড়লোকদের জন্য ক্লাবে বিনোদনের ব্যবস্থা করেছেন।

আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, বিনোদনের নামে চরিত্রবিনাশী এই নেটওয়ার্ক মস্তানরা গড়ে তোলেনি। গড়ে তুলেছে তারা, যারা মস্তানদের বাপের বয়সী। আমাকে এবং আমার সাথীদের প্রথমে বরবাদ করেছে এই আনন্দমেলা।

- জাল ফেলে রাখবেন, পাতানো জালে আটকা পড়লে গালিও দেবেন, এ কেমন ডবল স্টান্ডার্ড নীতি আপনাদের?
- মস্তানরা এই সমাজ ও সরকারের লালনে-যতনে তৈরী ফসল।
- যেমন তালিম, তেমন ইলিম।
- আগে এসব মেলা বন্ধ করুন, তারপর মস্তানদের উৎপাত বন্ধের কথা বলুন।
- বয়স্করা আগে নিজেদের অনুসরণযোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তুলুন, তারপর নীতিকথার তুবড়ি মারুন।

- রাত তো অনেক হলো। এবার উঠা যাক।

-চলুন, হলে ফিরে যেতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

দুজন গল্প করতে করতে বাসায় ফিরলাম, এক সাথে আহার করলাম। আহারের পর তাকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে বিদায় দিলাম। আমার মনে হল, আমি এক ভদ্র সন্তানের সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করলাম। কখনো মনে হয়নি যে, আমি মস্তানের সঙ্গে আলাপ করছি। অথচ এ যুবকের নাম পত্র-পত্রিকায় কয়েকবার ছাপা হয়েছে। তার দলবলের কুকীর্তির খবর প্রকাশিত হয়ছে। পরিবেশ কোন্ লোককে কি বানায়, এসব লোকের সঙ্গে না মিশলে বুঝা যায় না। যাদের আমরা হিংস্র, অভদ্র, আনকালচার্ড বলে দেখি এবং দূর থেকে গালি দেই, তাদের আমরাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা করে এমনভাবে গড়ে তুলেছি, তা কি উপলব্ধি করি? প্যারী চাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালরা শেষ হয়ে গেল অতি আহ্লাদ আর আশ্কারায়, কিন্তু আমাদের সমাজের দুলালরা শেষ হয়ে গেল রাষ্ট্র-প্রশাসন, সরকার আর নিম্নকৃষ্টির নব্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কারণে, যাদের মাথায় ক্ষমতা আর টাকার শিং গজিয়েছে।

এ সাক্ষাৎকারের প্রায় দুমাস পর একদিন সন্ধ্যায় দেখি ঐ মস্তান আমার বাসায় এসে হাজির। সালাম বিনিময়ের পর তিনি মাত্র পাঁচ মিনিট বসলেন, এক কাপ চা তৈরীর সুযোগও দিলেন না। আস্তে আস্তে বললেন, কাল আমি পশ্চিমের কোন এক দেশে চলে যাচ্ছি। দেশটির নাম বলছি না বিশেষ কারণে। বিমান বন্দরে আপনার যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। দোয়া করবেন। লেখাপড়া তো আর হলো না। দেশে থাকা সম্ভব নয়। আমার এ ব্যাপারটা শুধু আমার পরিবারের লোকজনই জানেন। পরিবারের বাইরে শুধু জানেন আপনি। কেন জানি না, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমশ বাড়ছে। চললাম। চিঠি দেব। চিঠি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমার ব্যাপারটা গোপন রাখবেন। তারপর তিনি আমার ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে সোহাগ করলেন। দেখলাম, দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে আবার একটা চুমু দিয়ে বললেন, বাবা, তুমি আমার মত হয়ো না, মানুষ হও, এই দোয়া করি। তারপর বিদায় নিলেন, বেবীট্যাক্সী নিয়ে এসেছিলেন। রাস্তায় বেবীট্যাক্সি দাঁড়ানো ছিল। তিনি বেবীতে গিয়ে উঠলেন। বিদায় দিলাম। এবার আমারও দুচোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ছেলে বল্ল, চাচা আর আপনি কাঁদলেন কেন? আমি তো কাঁদিনি। ছেলেকে বল্লাম, এ তুমি এখন বুঝবে না, যখন বুঝবে, তখন এমন হলে তুমিও কাঁদবে।

www.nagorikpathagar.org

নেশা আমাকে মস্তান বানিয়েছে

নেশার বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার পর মস্তান হতে হয়, না আগে মস্তান হয়ে নেশার বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত হতে হয়? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেয়া যায় না। আমি এই পুস্তক রচনার প্রয়োজনে প্রায় ৫০ জন ছোট বড় মস্তানের মুখোমুখি হয়েছি। পরোক্ষভাবে আমি আরও শতাধিক মস্তানের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছি। কে কি ভাবে এবং কি কি কারণে মস্তান হয়েছে, তাও সাধ্যমত জানার চেষ্টা করেছি। এছাড়া আমার পরিচিত মহলে, এমনকি আমি যেসব মহল্লায় বসবাস করেছি এবং এখন যে মহল্লায় বাস করছি, সেসব মহল্লায়ও অনেক মস্তান আছে, যাদের উত্থান পতন সম্পর্কে অনেক তথ্যই আমি জানি। আমার সরাসরি সাক্ষাৎকার নেয়া প্রায় ৫০ জন মস্তানের মধ্য থেকে মাত্র ১০ জনের জবানবন্দী এই পুস্তকে পেশ করেছি, যাদের মস্তান জীবনের শুরু হয় পৃথক পৃথক পথ ধরে। তাই একই পথের পথিক একাধিক থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ করেছি একজনকে। একই পথের যারা পথিক, তাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা মোটামুটিভাবে এক, কিন্তু আমার কাছে যার অভিজ্ঞতা বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে, তেমন একজনের জবানবন্দী নিয়েছি। এই দেড় শতাধিক ছোট বড় মস্তানের নেশা সংক্রান্ত যে তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি, তা হচ্ছে এই, অধিকাংশই আগে কোন না কোন নেশা ধরেছেন, পরে মস্তানীতে হাতেখড়ি নিয়ে ধীরে ধীরে হাত পাকা করে বড় বড় নেশাখোর ও মস্তান হয়েছেন। বিপরীত তথ্যও আছে। অর্থাৎ মস্তান হওয়ার পথ ধরার পরই অনেকে নেশায়ও বুঁদ হয়েছেন। সুতরাং দুপক্ষেরই তথ্য রয়েছে। এমন তথ্যও রয়েছে, যে তথ্যের প্রথম দিক আনন্দের, কিন্তু শেষ দিক দুঃখের। এ তথ্যটি হচ্ছে এই, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাওয়া এই দেড় শতাধিক মস্তানের মধ্যে মাত্র তিনজনকে পাওয়া গেছে, যারা সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণী থেকে সিগারেট টানার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। মস্তান হওয়ার আগে ধূমপানের অভ্যাস ছিল না অনেকের। কিন্তু মস্তান হওয়ার অনুশীলন শুরু করার সময় থেকে ধূমপান ও তরলপানি গিলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন প্রত্যেকে। অনুশীলন শেষ হওয়ার পর এমন একজনকেও পাওয়া যায়নি, যিনি নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েননি। এমন মস্তান আমি পাইনি, যে মস্তানের নেশার অভ্যাস নেই। মস্ত বড় এক মস্তানের অভিমত হচ্ছে এই, "নেশা আক্রান্ত মস্তানই কোন পথচারীকে একথা বলতে পারে, দে বেটা তোর কাছে যা

www.nagorikpathagar.org

আছে তাড়াতাড়ি দে, হাতের ঘড়িটা আগে খুলে ফেল, ম্যানিব্যাগটা দে, ব্রীফক্যাস দে। এই পাশবিক হিংস্র আচরণ তারাই দেখাতে পারে, যারা নেশা করে মানবিক গুণ হারিয়েছে।" আমি তাঁর এ মন্তব্যকে সমর্থন করি। এসম্পর্কে আমার মন্তব্য হচ্ছে এই, সকল মস্তানই নেশাকে তাদের অভ্যাসের আর পেশার অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়েছে। প্রত্যেক মস্তান নেশায় অভ্যস্ত, তবে কেউ কেউ সিগারেট ধূমপানে অভ্যস্ত আবার কেউ কেউ হেরোইন সেবনে অভ্যস্ত, পার্থক্য শুধু এই। মস্তানী পেশায় নেশা ঠিক এভাবে যুক্ত, যেমন সোনার সাথে সোহাগা যুক্ত।

নেশা যাকে মস্তান বানিয়েছে, এমন মস্তান তালাশ করতে থাকি। পত্র পত্রিকার মাধ্যমে অনেক নেশাখোর মস্তানের খবর জানতাম; কিন্তু তাদের সংগে সাক্ষাৎ করা, আলাপ আলোচনা করা, জবানবন্দী নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, লাইন ছাড়া তো মোলাকাত সম্ভব নয়। এই লাইন অনুসন্ধান করতে বেশ সময় গেল। লাইন পাওয়ার জন্য অনেকের সংগে কথা বলেছি, কিন্তু কেউই লাইনের সন্ধান দিতে পারেননি। শুধু একজন বললেন, আপনি টেলিভিশনের ম্যাগাজিন 'অনুষ্ঠান আইন আদালত'-এর উপস্থাপকের শরণাপন্ন হতে পারেন। তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। এ সপ্তাহে তিনি নেশাখোরদের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। শীঘ্রই এ ইন্টারভিউ টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হবে। আপনি শীঘ্রই তাঁর সংগে যোগাযোগ করুন।

তখন টেলিভিশনের আইন আদালত অনুষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। আজও হয়তো এই জনপ্রিয়তা শীর্ষেই থাকতো; কিন্তু উর্ধতন মহলের কারও কারও আঁতে ঘা লাগার কারণে এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়া হয়। আমি এই উপস্থাপকের সংগে দেখা করার জন্য তাঁর বাসায় ও টেলিভিশন অফিসে কয়েকবার গিয়েছি, কিন্তু সাক্ষাৎ পাইনি। বাধ্য হয়ে সে আশা ত্যাগ করলাম। এরপর প্রায় তিন সপ্তাহ পর এই আইন আদালত অনুষ্ঠানে দেখলাম একদল তরুণের চেহারা। তাদের জবানবন্দী সম্প্রচার করা হয় টেলিভিশনে। তারা কিভাবে নেশায় অভ্যস্ত হলো এবং এখন তাদের দিন কি ভাবে কাটছে, একে একে তারা বক্তব্য পেশ করে। শুনলাম তাদের বক্তব্য, চেহারাও দেখলাম, কিন্তু আমার মনের বিশেষ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ায় খুব একটা পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না।

তারপর অন্য অধ্যায়। আইন আদালত অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। রাজনীতির

www.nagorikpathagar.org

ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, এক শাসনের পতন ঘটে। অন্য শাসনের উত্থান ঘটলো।

নতুন শাসনামলেও টেলিভিশনে হেরোইন নেশাগ্রস্থদের উপর প্রতিবেদন পরিবেশন করা হয় কয়েকবার। যারা এ নেশায় মারাত্মকভাবে আসক্ত হয়, তাদের নেশা-মুক্তির জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সে সংবাদও জানলাম টেলিভিশনের মাধ্যমে। সেই সূত্র ধরে গেলাম নেশাখোর নিরাময় কেন্দ্রে। জনৈক দায়িত্বশীল চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করে আমার আগমনের উদ্দেশ্য সবিস্তারে খুলে বল্লাম। আমার বক্তব্য পেশ করার পর শ্রদ্ধেয় প্রবীণ চিকিৎসক বল্লেন, বেশ তো, আপনি তাদের স্টেটমেন্ট অনায়াসে নিতে পারেন। আমি আপনাকে দুটি নাম দিচ্ছি, তাদের যে কোন একজনের সংগে আলাপ করে আপনি যা জানতে চান, তা জানতে পারবেন। আমি বিশেষ দু'জনের নাম দিলাম. এজন্য যে, উভয়ই উচ্চ শিক্ষিত এবং অভিজাত পরিবারের লোক। তাছাড়া এখন তারা মোটামুটি ভাবে নিরাময়। ৩/৪ দিনের মধ্যে তাদের রিলীজ দেয়া হবে। এদের ছাড়া আর যারা আছে, তাদের অনেকে শিক্ষিত থাকলেও নতুন রোগী। প্রশ্ন করলে বরং বিরক্তি বোধ করবে। আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাবও হয়তো তারা দেবেনা।

ডাক্তার সাহেবকে সকৃতজ্ঞ সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে রোগীদের ওয়ার্ডে প্রবেশ করলাম। ডাক্তার সাহেব তাঁরই এক অধীনস্ত কর্মচারীকে আমার সাথে দিলেন সহযোগী হিসাবে। দু'জন রোগীর মধ্যে একজনকে দেখিয়ে তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। অন্যজনের সিট খালি দেখলাম। জানতে পারলাম, তিনি মিনিট দুয়েক আগে বাথ রুমে গিয়েছেন। তাঁর সংগেও আমার দেখা হয়েছিল বটে, কিন্তু অসময়ে, অর্থাৎ আমার বিদায় নেয়ার সময়।

প্রথম জনের কাছে আমার পরিচয় পেশ করলাম। তিনি নিজিকে এক শিক্ষকের সন্তান বলে পরিচয় দিলেন বেশ গর্বের সাথে। তবে ব্যবসায়ী পরিবার বলেও জানালেন। বড় ভাই ব্যবসা করেন। রাজধানীতে ৫/৬টি বাড়ী আছে। তিনিও ব্যবসা করতেন, কিন্তু নেশা তাঁকে শেষ করেছে। পিতা জীবিত নেই, মা আছেন। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই ডাক্তার সাহেব থেকে সব জেনেছেন। আমি এক নষ্ট মানুষ। অতঃপর তিনি নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত ইতিহাস তুলে ধরলেন। তাঁর অতীত জীবনের যে অধ্যায়টি তিনি খুবই কলুষিত মনে করেন, সেই অধ্যায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বার

www.nagorikpathagar.org

বার অনুশোচনায় ভেংগে পড়েন। নতুন ভাবে নব উদ্যোমে জীবন শুরু করার জন্য যখন আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম, তখন তিনি আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, নতুন জীবনতো শুরু করবো, কিন্তু জীবনের যে মূল্যবান অধ্যায় বরবাদ করেছি, তা কি আর ফিরে পাবো?

– তা অবশ্য ফিরে পাবেন না। যে সময় গত হয়ে যায়, তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। তবে কোন মহৎ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে মনটাকে সেভাবে মজবুত করে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করলে যা হারিয়েছেন তা অনেকাংশে ফিরে পাবেন। কথাগুলো বললাম আমি।

– দোয়া করবেন, এভাবে যেন যাত্রা শুরু করতে পারি। আত্মসমর্পিতকণ্ঠ তাঁর। আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর চোখে মুখে পবিত্রতার উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ছে। কলুষিত জীবনের শেষ ছায়াও যেন বিলীন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম–

– নেশায় আপনি কি ভাবে ডুবলেন, সে ইতিহাস যদি বলেন, তাহলে খুবই খুশী হতাম।

– সে ইতিহাস দুঃখ বেদনার ইতিহাস। আমি সে ইতিহাস ভুলতে চাই। আপনি যখন শুনতে চান, তখন শুনুন। এসএসসি পাস করার পরও আমি ধুমপান করতাম না। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর এমন ৫/৭ জন সহপাঠির সংগে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, তাদের প্রত্যেকেই ধূমপান করতেন। আমাকে তারা হাতের জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে বলতেন, 'দু একটান দে না। দু'একটান দিলে এমন কোন ক্ষতি হবে না।' তাদের এই অফার আর অনুরোধ বারবার প্রত্যাখ্যান করেছি। এজন্য তারা আমাকে প্রায়ই 'অসামাজিক' বলতেন। ধূমপান না করলে অসামাজিক হতে হয়, এ মন্তব্যের অর্থ আমি এ ভাবে বুঝতাম যে, আমি যাদের সংগে চলাফেরা করি, তাদের সব অভ্যাস আমার মধ্যে না থাকলে তাদের সমাজে আমি তো নিশ্চয়ই এক অসামাজিক মানুষ। কিন্তু ধূমপানের অভ্যাস রপ্ত করতে বিবেক আমার বাধা দিত। পরিবারের কেউ ধুমপান করেন না, আমি কিভাবে এ অভ্যাস করি।

একদিনের ঘটনা। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে আমরা ক'বন্ধু গাছের ছায়ায় বসে গল্প করছি। এক বন্ধু মনের সুখে সিগারেট টানছে। তার হাতের সিগারেট অর্দ্ধেক শেষ হওয়ার পর বাকি অর্দ্ধেক আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'খা বেটা খা, শাস্ত্র অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।' আমি হাত বাড়িয়ে নিলাম, দুতিন টানও দিলাম। বন্ধুরা হাত তালি দিয়ে আমার নতুন অভ্যাসকে বাহবা দিল। প্রায় ১০/১২ দিন এভাবেই শখের অনুশীলন চললো। এই অনুশীলনের পর একদিন একটা সিগারেট

www.nagorikpathagar.org

কেনার প্রয়োজন অনুভব করলাম। কিনলাম, টানলাম, পুরো একটি সিগারেটই ছাই করে ধূমপান করলাম। পরদিন দুটা, এর পর দিন তিনটা। শুরু হলো সংখ্যা বৃদ্ধির পালা। দিনে ১৫/২০টা পর্যন্ত হজম করতাম। ধূমপানের ব্যয় তো একটা আছে। এই ব্যয় বহনের জন্য মাকে বলে টিফিনের রেট বাড়িয়ে নিলাম। ডিগ্রী পরীক্ষা পর্যন্ত আমার নেশা সীমাবদ্ধ ছিল সিগারেটের ধূমপান পর্যন্ত। ডিগ্রী পরীক্ষার পর গাঁজার কল্কিতেও দম দিতে শুরু করলাম। তারপর আগে বাড়তে বাড়তে হেরোইন পর্যন্ত অগ্রসর হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার শেষ ঘাটটা কোন ভাবে পার হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, আমার মধ্যে আর আমি নামক ব্যক্তিটি নেই। হেরোইনের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়লাম। হেরোইন সেবনের অর্থ সংগ্রহের জন্য ছিনতাই রাহাজানিতে নামলাম। বাসা ছাড়লাম। মা বাবাকে ছাড়লাম। শুধু অর্থের জন্য বহু ঘটনাও ঘটিয়েছি, যা শুনলে আপনি শিউরে উঠবেন। এ সময় বাবার ইন্তেকাল হয়। আত্মীয় স্বজন আমাকে সংশোধনের অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু আমি নেশায় হলাম দিওয়ানা। তারপর তো এখানেই।

– মদ গিলেছেন?

– হাঁ, হাঁ, বাংলা মদ থেকে ইংলিশ ফ্রেঞ্চ পর্যন্ত কোনটিই বাদ দেই নি। ঔষধের লেবেলে ফার্মেসীতে যেসব নেশা জাতীয় লিকুয়িড, টেবলেট বা ক্যাপসুল বিক্রি হয়, তাও প্রচুর খেয়েছি। গাঁজা ও চরসের তৈরি এক জোড়া সিগারেট ৬ টাকা থেকে আট টাকা দিয়ে কিনে এসবের ধূমপান করেছি। হেরোইন তো ছিল আমার নিত্য সাথী। প্রতিদিন এবাবদে দেড় দু'শত টাকা পর্যন্ত ব্যয় হতো। দেহে প্যাথেডিন পুষ করেছি অনেক।

– নেশায় বুঁদ হয়ে যেসব অপকর্ম করেছেন, সে অপকর্মগুলো কি ধরনের?

– অপ্রকৃত অবস্থায় অনেক কিছুই করেছি, সব ঘটনা মনে নেই, তবে যা মনে আছে তার ফিরিস্তিও দীর্ঘ। এক কথায় বললে এই বলা যায় যে, জোর করে পথচারীদের থেকে অর্থ আদায় থেকে শুরু করে খুন খারাবী পর্যন্ত।

– অর্থের জন্য নিজ হাতে কাউকে খুন করেছেন?

– না, আমি সরাসরি করিনি, তবে সাথীদের কেউ কেউ তা করেছে।

– আপনি বাধা দেননি।

– না।

– আপনি তো বিত্তবান পরিবারের সন্তান। আপনার নেশা নিবৃত্তির অর্থ তো পরিবার থেকে নিতে পারতেন। তা না করে ছিনতাইয়ে নামলেন কেন?

– বলেন কি? পরিবার থেকে অর্থ পাবো? আমার বড় ভাই কট্টর নীতিবান,

নিষ্ঠাবান, ধার্মিক ব্যক্তি। বাধ্য হয়ে রাজপথে নামি।

– আপনাকে এখানে এনে দিয়েছে কে?

– আমার বড় ভাই। রোজ দুবেলা এসে আমাকে দেখে যান। আমার ভাই আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদেন। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজ শেষে আমার জন্য আল্লাহর পাকের কাছে মোনাজাত করেন। মায়ের অবস্থাও এক, শুধু আমার জন্য তাঁর কান্নাকাটি। আমি এই দুজনের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে ধ্বংসের গহবর থেকে এ যাত্রা মুক্তির কুলে উঠেছি। আর একজন আছেন, তিনি আমার স্ত্রী। বেচারী যেন বোবা হয়ে গেছে। আমার দিকে যখন তাকায়, তখন দেখি তার চোখে পানি। আমার বর্তমান নিরাময় অবস্থা দেখে সেও খুব খুশী।

– নেশা করে যারা ধ্বংস হয়েছে বা ধ্বংস হতে যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যে কি আপনার কোন উপদেশ আছে?

– আছে বটে, কিন্তু তারা কি তা শুনবে?

– নিশ্চয়ই শুনবে, আপনার অভিজ্ঞতালব্ধ কথার মূল্য আছে।

– উপদেশ শুধু একটি, সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে বাঁচতে হলে হেরোইন আর গাঁজার নেশা থেকে তো অবশ্যই বহু দূরে থাকতে হবে, কেউ যেন সিগারেটেরও ধারে কাছে না যান। ধ্বংসের গহ্বরে থেকে উঠে তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে একথা বললাম।

– আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম। এবার আসি।

– চা নাস্তা কিছুই দিতে পারলাম না। হাসপাতালতো, তাই মেহমানদারী করতে পারলাম না।

– আপনার অভিজ্ঞতা পরিবেশন করে যে মেহমানদারী করেছেন, তা চা নাস্তার চেয়ে হাজারগুন বেশী মূল্যবান।

– সিগারেটের প্রতি প্যাকেটে লেখা থাকে, "সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণঃ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর"–এসম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

– এ হচ্ছে মুনাফিকী নীতি। একদিকে নিষেধ, অন্যদিকে পৃষ্ঠপোষকতা। চোরকে বলা হচ্ছে চুরি কর, আবার গৃহস্থকে বলা হচ্ছে আজ রাতে চুরি হবে, সজাগ থাকবে কিন্তু। এই মুনাফিকীর কি কোন অর্থ হয়?

www.nagorikpathagar.org

– আমার একটি কথা কিন্তু রাখতে হবে। বই যদি প্রকাশ করেন, তাহলে একটা কপি যেন আমি পাই। এই নিন আমার নাম ঠিকানা। তবে নাম ঠিকানা বইতে উল্লেখ করবেন না।

– নিশ্চয়ই, বই প্রকাশিত হলে একখানা নয়, দুখানাই পাবেন।

– খুশী হলাম। দোয়া করি আপনার বইটি প্রকাশিত হোক।

– তাহলে আসি?

– হ্যাঁ আসুন। আস্‌সালামু আলাইকুম।

– ওয়া আলাইকুমুস্‌ সালাম।

www.nagorikpathagar.org

বেকারত্ব আমাকে মস্তান বানিয়েছে

এক চাঁদবাজ মস্তানের জবানবন্দী পেয়ে গেলাম আকস্মিকভাবে। এই আকস্মিক প্রাপ্তির পটভূমিও আচম্বিত। পটভূমি হচ্ছে এই, তখন দেশে চলছে চাঁদাবাজদের ভীষণ দৌরাত্ম্য। রাস্তাঘাটে চলাফেরা কঠিন। কখন কে চাঁদা চায়, তা বলা যায় না। চাঁদা দিতে হবে, নতুবা প্রাণটা চলেও যেতে পারে। রাস্তা ঘাটে চাঁদাবাজদের উৎপাত তো আছেই, বাসায় পর্যন্ত তারা হানা দেয়। তবে বাসায় বাসায় যারা চাঁদা আদায় করতে আসতো তারা কোন না কোন কারণ উল্লেখ করতো। যেমন নাটক করবে, এজন্য চাঁদা দিতে হবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে, চাঁদা দিতে হবে, সাময়িকী প্রকাশ করবে, এজন্য চাঁদা লাগবে। এভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে চাঁদাবাজরা বাসায় বাসায় হানা দিয়ে চাঁদা আদায় করতো। অনেকে কাল্পনিক নামের কোন ক্লাবের ছাপানো রসিদও নিয়ে আসতো। এই আপদদের বিদায়ের জন্য ৫/১০ টাকা দিলেই যে চলবে তা নয়, তারা যা চাইবে তা দিতে হবে। নির্দ্ধারিত চাঁদার কম দেয়া চলবে না।

জনগণ অতিষ্ঠ। চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে পত্র পত্রিকায় প্রচুর লেখা লেখি হয়, কিন্তু চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়নি। সংসদেও এ নিয়ে কথা ওঠে। কোন কোন এমপির স্ত্রীও চাঁদাবাজদের হাতে অপদস্ত হয়েছেন, এসব কথাও সংসদে আলোচনায় আসে। সরকার জনসাধারণকে বললেন, আপনারা চাঁদাবাজদের চাঁদা দেবেন না। তাদের ধরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করুন। ওদের প্রতিহত করার জন্য সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ হোন। সরকারের এ ঘোষণা কিছুটা কাজ হলো। কোন কোন এলাকায় চাঁদাবাজদের ধরে পুলিশে সোপর্দ করার আগে মনের মত উত্তম মধ্যম দেয়া হত। এরফলে কোন কোন চাঁদাবাজ মারের চোটে রীতিমত চেপ্টা হয়ে যেত।

আমি তখন যে মহল্লায় বাস করতাম, সেই মহল্লায়ও চাঁদাবাজদের উৎপাত ছিল বেশী। একদিন জোহরের নামাজের পর খানা পিনা সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে দিবা নিদ্রার চেষ্টা চালাচ্ছি, ঠিক এসময় শুনি 'ধর ধর' চিৎকার। ভীষণ চিৎকার। ঘুমাতে পারলাম না। বিছানা ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকারের উৎসস্থল অনুমান করে নিলাম। তারপর সেখানে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি ২৩/২৪ বছর বয়সের লম্বা চুলওয়ালা এক যুবককে ধরে ১০/১২ জন বেদম প্রহার করছে। কিল ঘুষি লাথি সমানে চলছে। মহল্লার দু'একজন প্রবীণ চিৎকার

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে বলছেন, আর মের না, মরে যাবে তো। শেষে আর এক কেলেংকারী হবে। কিন্তু কে শুনে কার কথা। চলছে কিল ঘুষি। এই ভীড়ের মধ্যে আমি এবং মহল্লার প্রবীণ ও গণ্যমান্য ৪/৫ জন ঢুকে যুবককে উদ্ধার করে পাশের এক বাসায় নিয়ে এক কক্ষে আটক করলাম। লোকজন থেকে জানলাম, ৪ জনের একটি দল চাঁদা সংগ্রহে আসে নাটক করার জন্য। অনেক বাসা থেকেই তারা অর্থ সংগ্রহ্‌ করেছে। কিন্তু একটি বাসায় প্রবেশ করে তারা ৫০০ টাকা দাবী করে। বাসার কর্ত্রী একশত টাকা দিয়ে বললেন, তাঁর কাছে আর টাকা নেই। কিন্তু চাঁদাবাজরা এমনই জিদ ধরে যে, পুরো পাঁচশত টাকা না হলে যাবে না। শুধু তাই নয়, তারা এমন হাবভাবও দেখাতে থাকে যে, বাকী টাকা না পেলে এই পরিমাণ অর্থের সমান কোন কিছু দিতে হবে। গৃহকর্ত্রী পড়লেন বিপদে। বাসায় সেয়ানা দুটি মেয়ে। তিনি অনন্যোপায় হয়ে কাজের মেয়েকে টাকা হাওলাতের জন্য পাঠালেন অন্য এক বাসার গৃহকর্ত্রীর কাছে। কাজের মেয়েটি গিয়ে সেই বাসায় সব কথা খুলে বললো। সব কথা শুনে সেই গৃহকর্ত্রী তার তিন যুবক সন্তানকে পাঠালেন। তারাও হাফ মস্তান। এতক্ষণে চাঁদাবাজদল বাসা ছেড়ে গেইটে এসে সলা পরামর্শ করছে। এমন সময় তিন যুবক তাদের ঘেরাও করে 'ডাকাত ডাকাত' বলে চিৎকার দিয়ে উঠে। তাদের চিৎকারে আশ-পাশের বাসার লোকজন দৌড়ে আসে। এ অবস্থা দেখে চাঁদাবাজরা পিস্তল তাক করে পালিয়ে যায়। উপস্থিত লোকজন তাদেরই একজনকে ধরে ফেলে। যাকে ধরে ফেলে তাকেও ধরা সম্ভব হতো না, যদি ঢাকনা বিহীন একটা ম্যানহোলে দৌড় দেয়ার সময় তার পা আটকা না পড়তো। তারপর শুরু হলো একজনের উপর দিয়ে বাকি তিন জনের প্রতিশোধ গ্রহণ। চাঁদাবাজরা এই মহল্লারও বাসিন্দা ছিল না। এই চাঁদাবাজের যে জবানবন্দী আমি নেই, তা এখানে পেশ করছি। নাম ঠিকানা জানার পর জিজ্ঞাসা করি–

– তুমি যদি সত্য কথা বল, তাহলে তোমাকে আর কেউ মারবে না। আমি যা জিজ্ঞাসা করবো, তাকি সত্য সত্য বলবে?

– জ্বি, সত্য বলবো, (প্রচন্ড মারের চোটে তখন সে কাঁপছিল)।

– তুমি কোথায় থাক আর তোমার সাথীরা কোথায় থাকে, তাদের নাম ঠিকানা কি? (জবাব দিল সে, সত্য মিথ্যা নিরূপণ করা হয়নি)।

– তোমরা কতদিন ধরে এই কাজ কর?

– আমি প্রায় একবছর ধরে তাদের দলে আছি। তারা অনেকদিন থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে।

www.nagorikpathagar.org

– তোমার কাছে একটি ক্লাবের নামে যে রসিদ আছে, সেই ক্লাব কি ঐ এলাকায় আছে?

– না।

– তাহলে এই রসিদও ভূয়া?

– জ্বী।

– কেন ভূয়া রশিদ?

– অনেকে রসিদ ছাড়া চাঁদা দেন না, তাই।

– তুমি কত পাও?

– ঠিক নেই, কোন মাসে এক হাজার টাকা, কোন মাসে দেড় হাজার টাকা, আবার কোন মাসে দু'হাজার টাকাও পাই। উস্তাদের মর্জি আর আয়ের উপর তা নির্ভর করে।

– বাড়ীতে কে কে আছে?

– মা এবং তিন ভাই আর দুই বোন, আব্বা নেই। দু'বছর আগে মারা গেছেন।

– ভাই বোনদের মধ্যে তুমি কত নম্বর?

– আমি সকলের বড়।

– জেল হাজতে কি কখনো গিয়েছ?

– না।

– লেখাপড়া জান?

– জানি।

– কি পর্যন্ত লেখা পড়া করেছ?

– কমার্স নিয়ে এইচ এসসি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছি। ফাইনাল পরীক্ষার পরই আব্বা মারা যান।

– আব্বা কি করতেন?

– নিজের কিছু জমাজমি ছিল, তা চাষবাদ করতেন, অন্যের জমিও বর্গা চাষ করতেন।

– জমি জমা কি এখন আছে?

– না,

– জমাজমি নেই কেন?

– আব্বা মারা যাওয়ার পর বিরাট সংসার আর চলে না। জমি বিক্রি করে

www.nagorikpathagar.org

সংসার চালাতে হয়েছে। ভাই বোনদের লেখাপড়ার খরচও জমি বিক্রির টাকা দিয়ে চালিয়েছি। এখন পৈতৃক ভিটা ছাড়া আর কিছুই নেই। মামারা কিছু কিছু সাহায্য করেন। তবে ছোট দুই ভাই ছাড়া সকলের লেখাপড়া বন্ধ।

– সংসার চলে কিভাবে? মামাদের সাহায্যে কি চলে?

– না, চলে না। আমি এখানে যা পাই, প্রায় সবই মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেই। আমি উস্তাদের বাসায় থাকি ও খাই। তার ছোট ভাইকে পড়াই।

– কোথাও কোন চাকুরী না নিয়ে এ পথে কেন এলে?

– বিশ্বাস করুন স্যার, কত জায়গায় চাকুরীর দরখাস্ত করেছি, ইন্টারভিউ দিয়েছি, কতজনের হাতে পায়ে ধরেছি; কিন্তু কেউ চাকুরী দেননি। ভাই বোন আর মার কষ্ট দেখে সহ্য করতে পারেনি। বাড়ী ছেড়ে ঢাকায় আসি। উস্তাদ আমাদের দেশেরই লোক, পাশের গ্রামে বাড়ী। তার ঠিকানায় প্রথম উপঠ। তারপর এ অবস্থা।

– তুমি যে দলে আছ, সেদলের প্রত্যেকের অবস্থা কি তোমার মত?

– দলে প্রায় ১৫ জন আছে। আমি ছাড়া আর একজন আছে, সেও আমার মতই। অন্যদের অবস্থা ভাল। বাকী সবাই অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলে। প্রত্যেকে মোটামুটি শিক্ষিত।

আমি এই জবানবন্দী নেয়ার সময় উপস্থিত লোকজনের, বিশেষ করে যুবকদের নানা মন্তব্য চলছিল। 'বেঈমান মিথ্যাবাদী' বলে তারা তাকে গালিও দিচ্ছিলেন। কেউ কেউ বললেন, কার জবানবন্দী নিচ্ছেন, ওকে ছেড়ে দিন, তাকে আরও সাইজ করি।

অনেক কষ্টে এ পর্যন্ত জবানবন্দী নিতে সক্ষম হই। পুলিশে দেয়ার জন্যও দাবী উঠে।

উপস্থিত জনতার মধ্যে একজন ছিলেন প্রথম শ্রেণীর কন্ট্রাক্টর, শিল্পপতিও বটে। তিনি এই মস্তানকে বললেন,

– তুমি যে জবানবন্দী দিয়েছ, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমাকে আমি চাকরী দিব, আর যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তোমার কপালে আরও দুর্গতি আছে।

– স্যার, আমাকে তিন দিন আটক করে আমার বাড়ীর ঠিকানায় খোঁজ খবর নেন। যদি কোন তথ্য মিথ্যা দিয়ে থাকি, তাহলে আমাকে যে শাস্তি দেবেন তা আমি মেনে নেব।

কন্ট্রাক্টর সাহেব উপস্থিত জনতাকে বললেন, ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি কালই সকালে তার বাড়ীতে লোক পাঠাবো। যদি তার দেয়া তথ্য

www.nagorikpathagar.org

সঠিক হয়, তাহলে আমার ওয়াদা আমি পালন করবো আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমি এই বেটাকে পুলিশে সোপর্দ করবো।

কন্ট্রাক্টর সাহেব খুবই ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাছাড়া মহল্লার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। সকলেই তাঁর কথা মানলো। চলে গেলেন সবাই, আমিও বাসায় ফিরলাম। তিনি মস্তানকে নিয়ে তাঁর বাসায় চলে গেলেন। পরদিন তিনি সত্যিই তার এক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে মস্তানের বাড়ী পাঠালেন। রাজধানী থেকে মস্তানের বাড়ীর দূরত্ব ৫০ মাইলেরও কম। তাই কন্ট্রাক্টর সাহেব দিনে দিনে রিপোর্ট পেয়ে গেলেন। যুবকের এই অভ্যাস সম্পর্কে তার গ্রামের কেউ জানেনা, কনট্রাক্টরের লোকও এঘটনা জানাননি। গ্রামের লোকজন এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছেলেটির স্বভাব চরিত্রের বরং তারিফই করলেন। রিপোর্ট সংগ্রহকারীকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন কেন তিনি এই যুবক সম্পর্কে তথ্য নিচ্ছেন। জবাবে তিনি বলেছেন, এক অফিসে তার চাকুরী হয়েছে, তাই অফিস আমাকে খোজ খবর নিতে পাঠিয়েছে। এ উত্তর শুনে সবাই খুশী হলেন। অনুসন্ধানকারী মস্তান যুবকের ঘরে গিয়ে তার মা এবং ভাই বোনদের স্বচক্ষে দেখেছেন করুণ অবস্থা। কনট্রাক্টর সাহেব রিপোর্ট সংগ্রহ করে যখন জানতে পারলেন, যুবকটি বেকারত্বের শিকার মাত্র, তখন তিনি আফসোস করলেন। পরদিন নিয়ে গেলেন তার কারখানায়। চাকুরী হয়ে গেল।

এ ঘটনার প্রায় ৩ মাস পরে আমি বাসা বদল করে রাজধানীর অন্য এলাকায় চলে যাই। ফলে ঐ মহল্লায় আর যাওয়া হয়নি, কনট্রাক্টর সাহেবের সংগেও দেখা হয়নি। দীর্ঘদিন পর এই কন্ট্রাক্টর সাহেবের সংগে দেখা হয়ে গেল রাজধানীর জিপিওতে। দুজনে ৫/৭মিনিট আলাপ করলাম, আলাপের এক পর্যায়ে ঐ মস্তানের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এখন সে অন্য মানুষ। চাকুরী ক্ষেত্রে তার কয়েক ধাপ প্রমোশন হয়েছে। সে আমার একান্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে প্রমাণ করেছে। দুই বোনের বিয়ে দিয়েছে এবং সেও বিয়ে করেছে। সে এখানেই আছে, দেখলে কি চিনবেন? সে এখন হুজুর হয়ে গেছে। বিয়ে আর বি'কম দুটোতেই পাস।

দুজনে হাসলাম। বিদায় নিতে যাচ্ছি, এমন সময় কনট্রাক্টর সাহেব বললেন, নতুন হুজুরকে দেখে যান। এমন সময় দেখলাম একজন হুজুর কয়েকখানা চিঠি রেজিষ্টি করে কনট্রাক্টর সাহেবের কাছে এসে বললেন, চলুন, কাজ শেষ হয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

আমি চিনতে পারিনি, কিন্তু নতুন হুজুর আমাকে চিনে ফেললেন। আমি শেষ অবস্থায় চিনলাম কপালে একটা কাটা দাগ দেখে। ঐ দাগটির কথা আমার মনে ছিল। দুজনে কোলাকুলি করলাম। অতীত নিয়ে একটি কথাও বললাম না। আমূল পরিবর্তনে অত্যন্ত খুশী হলাম। বিদায়ক্ষণে নতুন হুজুর আস্তে আস্তে বললেন, বেকারত্বই আমাকে মস্তান বানিয়েছিল। আল্লাহর রহমত আর কনট্রাক্টর সাহেবের দয়া না থাকলে আমার ভবিষ্যৎ যে কি হতো আর ভাইবোনদের অবস্থা কি দাড়াতো, তা আল্লাই ভাল জানেন।

কনট্রাক্টর সাহেব তার নতুন হুজুরের পিঠে সোহাগের হালকা একটা চাটি মেরে বললেন, থাক থাক এসব কথা, চল যাই।

দুজনে চলে গেলেন। পিছন থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাদের জন্য দোয়া করলাম। সত্যিই, মায়ের গর্ভ থেকে কেউ মস্তান হয়ে জন্ম নেয় না, পরিবেশই মস্তান বানায়।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় বিভাগঃ পরিশিষ্টঃ
সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ—১৯৯২

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৯২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩১শে ভাদ্র, ১৩৯৯/১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২

নং ৭১৭-পাব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদ্দ্বারা ৩১শে ভাদ্র, ১৩৯৯/১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ তারিখে প্রণীত এবং এতদসংগে সংযোজিত অধ্যাদেশটি সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হইল।

সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ, ১৯৯২

অধ্যাদেশ নং ৭, ১৯৯২

সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমনকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

মূল্যঃ টাকা ৩.০০

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**— এই অধ্যাদেশ সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে।

www.nagorikpathagar.org

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(১) "আপীল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আপীল ট্রাইব্যুনাল,

(২) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ৮ এর অধীন স্থাপিত সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল;

(৩) "সন্ত্রাসমূলক অপরাধ" অর্থ—

(ক) কোন প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা বেআইনী বলপ্রয়োগ করিয়া-

(অ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চাঁদা, সাহায্য বা অন্য কোন নামে অর্থ বা মালামাল আদায় বা অর্জন করা;

(আ) স্থলপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশ পথে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা কোন যান চালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যানের গতি ভিন্ন পথে পরিবর্তন করা;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন যানবাহনের ক্ষতিসাধন করা;

(গ) ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রতিষ্ঠান, আইনের অধীন গঠিত, স্থাপিত বা সৃষ্ট কোন সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বা কোন কোম্পানী, ফার্ম বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কোন দূতাবাস বা বিদেশী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি বিনষ্ট বা ভাংচুর করা;

(ঘ) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন অর্থ, অলংকার, মূল্যবান জিনিষপত্র বা অন্য কোন বস্তু বা যানবাহন ছিনতাই করা বা জোরপূর্বক কাড়িয়া লওয়া;

(ঙ) রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা উহার আশে পাশে বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন বালিকা, কিশোরী ও তরুণীসহ যে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা প্রাপ্ত বয়স্কা নারীকে উত্যক্ত বা হয়রানী করা;

(চ) কোন স্থানে, বাড়ীতে, দোকানে, হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, যানবাহনে বা প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পিতভাবে বা আকস্মিকভাবে একক বা দলবদ্ধভাবে শক্তির মহড়া বা দাপট প্রদর্শন করিয়া ভয়ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করা বা বিশৃংখলা বা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা;

(ছ) কোন প্রতিষ্ঠানের দরপত্র ক্রয়ে, গ্রহণে বা দাখিলে জোরপূর্বক বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা কাহারও দরপত্র গ্রহণে বিধি-বহির্ভূতভাবে বাধা করা;

(৪) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)।

৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য।— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। সন্ত্রাসমূলক অপরাধের শাস্তি। কোন ব্যক্তি কোন সন্ত্রাসমূলক অপরাধ করিলে তিনি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনাধিক বিশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

৫। অপরাধ সংঘটনের সহায়তার শাস্তি।— কোন ব্যক্তি কোন সন্ত্রাসমূলক অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করিলে, তিনি ধারা ৪ এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬। অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী বা তদ্দ্বারা সংগৃহীত অর্থ সম্পদ সম্পর্কে বিধান।— ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য ব্যবহৃত কোন দ্রব্যসামগ্রী বা উক্ত অপরাধের দ্বারা সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তির বা উহার বৈধ মালিক বা দখলদারের নিকট ফেরত দিবার আদেশ দিতে পারিবে।

www.nagorikpathagar.org

৭। অপরাধের বিচার।—অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এ অধ্যাদেশের অধীন অপরাধসমূহ কেবল ধারা ৮ এর অধীন স্থাপিত ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।

৮। সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন।—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেকটি জেলায় এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে, যাহা সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে।

(২) প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালে একজন করিয়া বিচারক থাকিবেন এবং কেবলমাত্র একজন চাকুরীরত বা অবসরপ্রাপ্ত সেশন জজ বা অতিরিক্ত সেশন জজ এই ট্রাইব্যুনালে বিচারক হইবার যোগ্য হইবেন।

(৩) ট্রাইব্যুনালের বিচারক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৪) সরকার প্রয়োজনবোধে একজন সেশন জজ বা অতিরিক্ত সেশন জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে কোন ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৫) কোন জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালের জন্য এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৬) প্রত্যেক ট্রাইব্যুনাল জেলা সদরে অবস্থিত থাকিবে, তবে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইলে উহা অন্য কোন স্থানে ও বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারিবে।

১। ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার।— (১) সাব-ইনসপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) যদি এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সংগে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটির বিচার এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধের সহিত একই সংগে বা একই মামলায় ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে।

(৩) যে ট্রাইব্যুনালের এলাকায় এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ বা উহার কোন অংশ সংঘটিত হইয়াছে অথবা যে ট্রাইব্যুনালের এলাকায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বা একাধিক অভিযুক্তের ক্ষেত্রে তাহাদের যে কোন একজনকে পাওয়া যায় সেই ট্রাইব্যুনালে উক্ত অপরাধের বিচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

(৪) ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনবোধে উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের জন্য উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশে তদন্তের রিপোর্ট প্রদানের জন্য অনধিক পনের দিনের সময়-সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার অধীনে অধিকতর তদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইলে নির্দেশে উল্লিখিত সময়-সীমা ধারা ১৬(৩) এ উল্লিখিত সময়-সীমার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) ট্রাইব্যুনাল এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অন্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) যদি ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (৫) এর অধীন মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে এবং অনুরূপ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোন আপীল দায়ের না করেন তাহা হইলে, মৃত্যুদণ্ডাদেশ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার জন্য, ট্রাইব্যুনাল, মামলার নথিপত্র আপীল দায়েরের তারিখ অতিবাহিত হওয়ার সাত দিনের মধ্যে আপীল ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবে এবং আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর হইবে না।

www.nagorikpathagar.org

১০। **বিচারকার্য পদ্ধতি।**—(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে সেশনস আদালত কর্তৃক কোন মামলার বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে ট্রাইব্যুনাল সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মামলার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবে।

(২) ট্রাইব্যুনালে মামলা শুরু হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন একটানা চলিবে, তবে ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ন্যায়-বিচারের স্বার্থে বিচারকার্য মুলতবী করা প্রয়োজন তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, স্বল্পকালীন সময়ের জন্য বিচারকার্য মুলতবী করিতে পারিবে, তবে কোন অবস্থাতেই এই সময় সাত দিনের অতিরিক্ত হইবে না।

(৩) যদি কোন মামলা ১৪(৫) ধারার অধীন এক ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহা হইলে স্থানান্তর করার পূর্বে মামলাটি যে পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায় হইতে তাহার কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(৪) যদি ট্রাইব্যুনালের বিচারক বদলী হইয়া যান, তাহা হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত বিচারক তাহার পূর্ববর্তী বিচারক কোন মামলার বিচারকার্য যে পর্যায়ে রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই পর্যায় হইতে উহা শুরু করিবেন এবং তাহার পূর্ববর্তী বিচারক যদি কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না।

১১। **আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার।** (১) যদি ট্রাইব্যুনালের এই মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে,-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারের জন্য সোপর্দকরণ এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন, এবং

(খ) তাহার আশু গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা নাই,

তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল অন্ততঃ দুইটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে বা কোন আদালতে হাজির হইবার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার পর পলাতক হন, তাহা হইলে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না এবং সেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।

১২। **ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যে কোন স্থানে জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষমতা।**—(১) কোন ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্তকারী কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা তদন্তকারী অন্য কোন ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল কোন ব্যক্তির জবানবন্দি অপরাধের ত্বরিত বিচারের স্বার্থে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অনুরোধ প্রাপ্ত হইবার পর চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অবিলম্বে একজন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করার নির্দেশ দিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২)-এর অধীন নির্দেশপ্রাপ্ত কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ম্যাজিস্ট্রেট অবিলম্বে ঘটনাস্থলে বা অন্য কোন যথাযথ স্থানে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করিবেন এবং উক্তরূপে গৃহীত জবানবন্দি তদন্ত রিপোর্টের সহিত সামিল করিবার জন্য অপরাধ তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তার বা ব্যক্তির নিকট সরাসরি প্রেরণ করিবেন।

(৪) যদি উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিচার কোন ট্রাইব্যুনালে শুরু হয় এবং দেখা যায় যে উপ-ধারা (৩)-এর অধীন জবানবন্দি প্রদানকারী

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তিনি সমন দেওয়া সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনালে হাজির না হন বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া না যায় বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তাহার উক্ত জবানবন্দী আদালতে তাহার সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৩। **আপীল।**—ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ বা খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ধারা ১৪-এর অধীন স্থাপিত সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

১৪। **সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আপীল ট্রাইব্যুনাল।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এক বা একাধিক আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিবে, যাহা সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আপীল ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে।

(২) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক আছেন বা ছিলেন এইরূপ দুইজন ব্যক্তি এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা রাখেন এইরূপ একজন কর্মরত জেলা জজ সমন্বয়ে আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হইবে এবং তাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক আছেন বা ছিলেন আপীল ট্রাইব্যুনালের এমন সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে সরকার উহার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন।

(৪) ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন হাইকোর্ট বিভাগ ফৌজদারী আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারে এবং যে পদ্ধতি অনুসরণ করে আপীল ট্রাইব্যুনালও, যতদূর সম্ভব, এই অধ্যাদেশের অধীন আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে সেই একইরূপ ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(৫) আপীল ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বা স্বতঃই কোন ট্রাইব্যুনাল হইতে কোন মামলা অন্য কোন ট্রাইব্যুনালে ন্যায়-বিচারের স্বার্থে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(৬) এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা হইতেছে যে, সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।

১৫। **অপরাধসমূহের আমলযোগ্যতা এবং অজামিনযোগ্যতা।**— (১) এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable) হইবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন আদালত তদন্ত পর্যায়ে জামিনে মুক্তির আদেশ দিতে পারিবে না।

১৬। **ফৌজদারী কার্যবিধি প্রয়োগ।**—(১) এই অধ্যাদেশের ভিন্নতর কোন কিছুই না থাকিলে, এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের, উহার তদন্ত, উহার বিচার এবং আনুষংগিক অন্যান্য সকল বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং ট্রাইব্যুনাল একটি সেশনস আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত তৎসম্পর্কে এজাহার প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে; যদি কোন অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না যায় তাহা হইলে ট্রাইব্যুনালের অনুমোদনক্রমে এই তদন্তকার্য অতিরিক্ত পনের দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) ট্রাইব্যুনাল কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করার তারিখ হইতে অনধিক ষাট দিনের মধ্যে উহার বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করা না যায় তাহা হইলে, ট্রাইব্যুনাল, উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধক্রমে, অতিরিক্ত ত্রিশ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি।

তারিখ: ৩১শে ভাদ্র, ১৩৯৯ বাং / ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইং

মোঃ আবদুর রহমান
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

www.nagorikpathagar.org

মস্তান এবং মস্তানী আইন

১৯৬০ ইংরেজী সনের ৪৫ নম্বর বিধির (দন্ড বিধি) ৩৮৩ ধারায় এক্সটরশন (Extortion) শব্দটির ব্যাখ্যা দেয়া আছে। ইংরেজীতে রচিত মূল দন্ড বিধির উল্লেখিত এক্সটরশন শব্দটির বাংলা ভাষান্তর হল বলপূর্বক গ্রহণ। আমাদের সমাজে বলপূর্বক গ্রহণ অথবা জোর করে গ্রহণের প্রবণতা এত বেশী বেড়েছে, যার ফলে জোরপূর্বক গ্রহণ অথবা জোর করে আদায়কে মস্তানী বলা হয়। দন্ড বিধির কোথাও 'মস্তানী' শব্দটি খুঁজে না পেলেও আমাদের সমাজে শব্দটি এত বেশী পরিচিত হয়েছে যে, এখন মস্তানী বললেই মানুষ সহজে বুঝে যায় ঘটনাটি কি। জোরপূর্বক আদায়কারীকে মস্তান আর আদায় করাকে মস্তানী এবং যার নিকট থেকে আদায় করা হয় তাকে মস্তানীর শিকার বলা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর দেশে ব্যাপকভাবে ছিনতাই আরম্ভ হয়। তার সাথে এখন যোগ হল মস্তানী। ছিনতাই আর মস্তানীর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। ছিনতাই করে ছিনতাইকারী ঘটনাস্থলে থাকে না। কিন্তু মস্তানী করার পর মস্তান ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তার বাহাদুরি বা শক্তি জাহির করতে থাকে। ছিনতাইকারীরা নিজকে অপরাধী মনে করে ঘটনার পর পরই আইনের ভয়ে পালিয়ে যায়। অপরদিকে মস্তানরা কিন্তু নিজদের অপরাধী না ভেবে বাহাদুর ভাবে। দু'টি অপরাধই খুব কাছাকাছি এবং প্রায় একই ধরনের হলেও দন্ডবিধিতে পৃথক ধারায় অপরাধের ব্যাখ্যা ও শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

আমাদের দেশে বর্তমানে মস্তানী এত বেশী বেড়ে গেছে এবং মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়ার ফলে মস্তানী আইনের সংশোধন এনে শাস্তির মেয়াদ বাড়িয়ে বিচার পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়েছে। দণ্ডবিধির ৩৮৩ ধারা থেকে ৩৮৯ ধারায় বলপূর্বক গ্রহণ সম্পর্কে অপরাধের ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন ধরনের শাস্তির মেয়াদ উল্লেখ আছে। বলপূর্বক আদায়কারীর শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ অপরাধটির সাথে আরও কিছু কার্যকলাপকে অপরাধের আওতায় এনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ বিগত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯০ ইংরেজী সনে ২৯/১৯৯০ নম্বর অধ্যাদেশে দণ্ডবিধির ৩৮৩/৩৮৫/৩৮৭ ধারার সংশোধনের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন এনেছেন। দন্ডবিধি সংশোধনের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৯১ ইংরেজী সনের ২রা জানুয়ারীতে ১/১৯৯১ নম্বর

www.nagorikpathagar.org

অধ্যাদেশে ১৮৯৮ ইংরেজী সনের ৫ নম্বর ফৌজদারী কার্যবিধির দ্বিতীয় তফসিলে সংশোধন আনেন। উক্ত সংশোধনের পূর্বে দণ্ডবিধির ৩৮৫/৩৮৭ ধারার অপরাধীকে আদালতের গ্রেফতারী পরওয়ানা ব্যতীত গ্রেফতার করা যেত না এবং সংশোধনের ফলে অপরাধীকে আদালতের গ্রেফতারী পরওয়ানা ব্যতীত গ্রেফতার করা যাবে। সংশোধনের পূর্বে দণ্ডবিধির ৩৮৫ ধারার অপরাধটির বিচার যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এবং দণ্ডবিধির ৩৮৭ ধারার অপরাধটির বিচার মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালত অথবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হত। উল্লেখিত দন্ডবিধির ৩৮৫/৩৮৭ ধারার অপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে করার জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯০ ইংরেজী সনে ৩০/১৯৯০ নম্বর অধ্যাদেশ ১৯৭৪ ইংরেজী সনের ১৪ নম্বর বিশেষ ক্ষমতা নম্বর বিশেষ ক্ষমতা আইনের তফসিলের ৪শ' অনুচ্ছেদে সংশোধন এনে অপরাধীদের বিচার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আওতায় এনেছেন। এদের আমাদের দেখতে হবে দণ্ডবিধির ৩৮৩/ ৩৮৫/ ৩৮৭ ধারাগুলোর সংশোধনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি দাঁড়াল।

সংশোধনের পূর্বে উল্লেখিত দণ্ডবিধির ধারাগুলো নিম্নরূপ ছিলঃ ৩৮৩ ধারাঃ- যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে, উক্ত ব্যক্তি বা অন্য কাহারও প্রতি ক্ষতির ভয় দেখায় এবং তদ্বারা উক্ত ভয় প্রদর্শিত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত কিংবা স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরকৃত কোন কিছু-যা মূল্যবান জামানতে রুপান্তরিত হতে পারে-হস্তান্তর করতে প্রলুব্ধ করে, সে ব্যক্তি 'বলপূর্বক গ্রহণ' করে বলে গণ্য হবে।

৩৮৫ ধারাঃ- যে ব্যক্তি বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতিব ভীতি প্রদর্শন করে বা কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতির ভীতি প্রদর্শনের উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে যাব মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩৮৭ ধারাঃ- যে ব্যক্তি বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তির বা অপর কোন ব্যক্তির প্রতি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখায় বা দেখাবার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে-যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং অর্থদন্ডেও দণ্ডণীয় হবে।

সংশোধনের পর ধারাগুলো এইভাবে দাঁড়ালঃ ৩৮৩ ধারাঃ- যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা অন্য কারও প্রতি ক্ষতির ভয় দেখায়

www.nagorikpathagar.org

এবং তদ্বারা উক্ত ভয় প্রদর্শিত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট অনুদান অথবা যে কোন ধরনের চাঁদা অথবা কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত, কিংবা স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরকৃত কোন কিছু যা মূল্যবান জামানতে রুপান্তরিত হতে পারে- হস্তান্তর করতে প্রলুব্ধ করে, সে ব্যক্তি 'বলপূর্বক গ্রহণ' করে বলে গণ্য হবে।

৩৮৫ ধারাঃ যে ব্যক্তি বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতির ভীতি প্রদর্শন করে বা কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতির ভীতি প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ চৌদ্দ বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং পাঁচ বছরের নীচে হবে না অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩৮৭ ধারাঃ যে ব্যক্তি বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির প্রতি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখায় বা দেখাবার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে-যার মেয়াদ যাবজ্জীবন কারাবাস এবং সাত বছরের নীচে হবে না এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

এখানে একটু নজর করলে দেখা যাবে যে, ৩৮৫/৩৮৭ ধারার অপরাধীদের শাস্তির মেয়াদ যেমনি বাড়ান হয়েছে, তেমনি আবার নিম্ন শাস্তির মেয়াদও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। মূল দণ্ডবিধিতে সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত কোন ধারাতেই নিম্ন শাস্তির মেয়াদ উল্লেখ নেই। যদিও সর্বোচ্চ মেয়াদ উল্লেখ আছে। সর্ব নিম্ন কি পরিমাণ শাস্তি দেয়া হবে, তা বিচারকের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। একমাত্র অপরাধের গুরুত্ব দেখে সরকার সংশোধনীর মাধ্যমে অপরাধীর জন্য নিম্ন শাস্তির মেয়াদ উল্লেখ করে থাকেন। দন্ডবিধির ধারাগুলোর সংশোধন থেকে অতি সহজে বুঝা যায় যে, মস্তানী সমাজে কত বড় মারাত্মক অপরাধ। সমাজের আনাচে-কানাচে বিভিন্ন ধরনের মস্তানী চলে। মস্তানীর শিকার যারা হয়, তারা সহজে মুখ খুলতে চায় না ভয়ে। জোরপূর্বক কিছু করা বা করতে বাধ্য করাকে মস্তানী বলা হয়। মস্তানরা সমাজে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কি ধরনের কাজ করে তাদের কু-কীর্তির ছাপ রাখে, তার বিস্তারিত বিবরণ এই স্বল্প পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরা যাক-একদল যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাবা, মা, ভাই-বোনদের সামনে যুবতী মেয়েকে জোরপূর্বক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেড়ে নিয়ে গেল পাশবিক অত্যাচারের জন্য। যুবকদের এই কাজটিকে মস্তানী বলা হয়। অস্ত্র শস্ত্রের ভয়ে মেয়েটির বাবা, মা, ভাই ও বোন নীরব থাকতে বাধ্য হন। ইজ্জতের খাতিরে অথবা ভয়ে কেউ ঘটনাটি প্রকাশ না করলেও নীরবে জ্বলে

www.nagorikpathagar.org

পুড়ে মরছে। যেমন রাস্তায় চলার সময় একজন যদি কারও সামনে দাড়িয়ে ভয় দেখিয়ে হাতঘড়িসহ পকেট পরিষ্কার করে আস্তে ধীরে চলে যাওয়ার সময় বলে গেল, চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করলে জীবন নিয়ে বাসায় যেতে পারবে না। লোকটি হাতঘড়ি আর পকেট উজাড় করে দেয়ার পরও জীবন নিয়ে বাসায় ফিরতে পারলে অনেক বেশী পাওয়া হয়ে গেছে মনে করে। কিন্তু দুঃখটি লালন করেই যাবে। যেমন বাড়ীর কাছের লোকটি যদি জোর করে অপরের চলার পথটিকে বেড়া দিয়ে দেয়, তাহলে কাজটি আর কিছু নয়, মস্তানীর পর্যায়ে পড়ে। যেমন আবার ধরা যাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রটির নামে ছাত্রাবাসের সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, সে ছেলেটি কিন্তু সিটে থাকতে পারে না, কারণ সিটটিকে আরেকজন ছাত্র জোর করে দখল করে রেখেছে। বে-আইনী জোর করে সিটটি দখল করে রাখার কাজটিই মস্তানী। মস্তানদের মধ্যে বড় মস্তান, ছোট মস্তান আর মাঝারি মস্তান আছে। এরা কিন্তু একে অপরকে খুব মানে। দলের মধ্যে জেষ্ঠ্যতার নির্দেশ অলংঘনীয়। এদের কাছে জীবন অতি তুচ্ছ। কু-কর্ম এদের কাছে সবচেয়ে প্রাধান্য পায় বলে কু-কর্ম সমাধানে এদের জুড়ি নেই।

মস্তানী আমাদের সমাজে নতুন কিছু নয়। মস্তানীর ইতিহাস বহু পুরাতন। রাজা বাদশারা তাদের অন্যায় নির্দেশ মানার জন্য প্রজাদের বাধ্য করানোর জন্য মস্তানদের লালন পালন করত। ক্রমে সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে মস্তানীর স্টাইলেরও পরিবর্তন ঘটল। সমাজে মোড়লেরা গরীবের সুন্দরী বউকে জোর করে এনে বিয়ে করত মস্তানদের সহযোগিতায়। সহজ কথায়, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মস্তানদের সাহায্যে মোড়লেরা মোড়লগিরি টিকিয়ে রাখত। এখনও চর অঞ্চলে জোতদারগণ মস্তানদের সাহায্যে অপরের ক্ষেতের পাকা ধান কেটে আনে অতি সহজে। মস্তানী এখন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কায়দায় চলে। যেমন সরকারী দল ও বিরোধী দল ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতি সুঁচের মত প্রবেশ করিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয় অতি সহজে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের দলে নিয়ে শিক্ষকগণ টিকে থাকার চেষ্টা করেন। ভিসি, প্রিন্সিপাল, হেড মাস্টারসহ সকল শিক্ষক একই কাজে খুব বেশী ব্যস্ত। মস্তানদের কাজের বিভিন্নতা আছে। তাদের সব কাজ মস্তানীর আওতায় পড়লেও ইদানীং যে কাজটি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে তাহলো জোর করে চাঁদা আদায়। চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে মস্তানদের আনাগোনা বেশী ব্যবসায়ী এলাকায়। দোকানে গিয়ে চাহিদা মত চাঁদা দিতে হবে। চাঁদা চাইলে দোকানদার যত তাড়াতাড়ি চাঁদা দিয়ে মুক্তি পাবে তার চেষ্টা করে। একদল

www.nagorikpathagar.org

বিদায় হলে আরেক দল আসে চাঁদা আদায় করার জন্য। বাসে চলার সময় দেখা যাবে হঠাৎ বাস থেমে গেল। জিজ্ঞেস করলে জানবেন চাঁদা আদায় করার জন্য মস্তানরা বাস থামিয়েছে। কেউ অতিষ্ঠ হয়ে চাঁদা না দিলে ফলাফল কিন্তু মারাত্মক আকার ধারণ করে। নির্বাচনের সময় মস্তানদের কাজ খুব বেড়ে যায়। কথায় আছে, নির্বাচনে জিততে হলে মস্তান ভাড়া করতে হবে। যে যত বেশী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মস্তান ভাড়া করবে, নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা তার তত বেশী থাকবে। সহজ কথায়, মস্তানদের কার্যকলাপে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। মস্তানদের কেউ চায় না বলে নিরীহ মানুষ মস্তানদের ঘৃণা করে। মস্তানদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তির জন্য ব্যবসায়ী এবং জনগণের প্রবল দাবীর ফলে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। জনগণের জান মালের নিরাপত্তার জন্য সরকারকে দন্ডবিধির ধারাগুলোর সংশোধন করতে হয়েছে। উক্ত সংশোধনে মস্তানীর অপরাধের জন্য শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সমাজ ও জনগণকে মস্তানদের হাত থেকে বাঁচাতে হলে শুধু আইন সংশোধনে কাজ হবে না। আমাদের সকলকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সাহায্য করতে হবে। মস্তানদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট অভিযোগ দায়ের করতে হবে এবং সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে আদালতে মামলা প্রমাণে সাহায্য করতে হবে। মস্তানদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে শুধু আইনের সংশোধনে কাজ হবে না, সঠিক প্রয়োগের একান্ত প্রয়োজন। আইনের সঠিক প্রয়োগে মস্তানদের শাস্তির ব্যবস্থা করে দেশবাসীকে বাঁচাতে হলে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের সকলের সহযোগিতা না পেলে একা সরকারের পক্ষে মস্তানদের দমন করা সহজ নয়। মস্তানী দমনে সরকারের সদিচ্ছার সাথে আমাদের সকলকেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমরা কেউ মস্তানদের আশ্রয় দেব না এবং প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট ধরিয়ে দেব। আজকের দিনে আমরা এই প্রতিজ্ঞা করতে ব্যর্থ হলে মস্তানী সমাজে ক্যানসারের মত বেড়েই যাবে। তাই প্রয়োজনে মস্তানদের বিচারের জন্য সরকার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সৃষ্টি করতে পারেন যেমন চোরাচালান প্রতিরোধ ট্রাইব্যুনাল। মস্তানদের এবং তাদের আশ্রয়দাতাদের নির্মূল করতে না পারলে জাতির অভিশাপ থেকে আমরা মুক্তি পাব না। আপনি, আমি, আমরা সবাই যেখানে মস্তানদের ঘৃণা করি, সেখানে মস্তানী কিছুতেই চলতে পারে না। চলুন আমরা সবাই দেশটিকে মস্তানীর অভিশাপ হতে বাঁচানোর চেষ্টা করি। রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী। চিত্রবাংলা/আগষ্ট ১৯৯১।

www.nagorikpathagar.org

মস্তান সম্পর্কে ৫২৩ জনের অভিমত

মস্তানদের মস্তানীর শিকার না হলেও 'মস্তান' শব্দটির সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। মস্তানদের সম্পর্কে বিভিন্ন পেশার লোকজন কি ভাবছেন, এ নিয়ে ১৯৮৯ সালে এক জরীপ চালানো হয়। জরীপ কার্য পরিচালনা করেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল মানসিক স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ সংস্থার সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ দেওয়ান ওয়াহিদুন নবী'র নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট মানসিক রোগ চিকিৎসকের একটি দল। দলের সদস্যরা ছিলেন ডাঃ রেজওয়ান কাদেরী, ডাঃ ধীরাজ মোহন বিশ্বাস, ডাঃ ঝুনু শামসুন নাহার ও ডঃ ওয়াজিউল আলম চৌধুরী।

জরীপের উদ্দেশে বিভিন্ন পেশার পাঁচ শতাধিক লোকের মধ্যে ২১টি প্রশ্ন সমেত নির্দিষ্ট ফরম বিতরণ করা হয়। ৫২৩ জন ফরম পূরণ করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ১৮জন মেডিক্যাল শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-১৫জন, কলেজের শিক্ষক-৩১, প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-১৪, ছাত্র-৩৭, স্কুল শিক্ষক-১০, ব্যবসায়ী-২৯। গৃহবধু-২২, মৌলভী-১২, আইনজীবী-১৫, বিচারপতি-৫, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার-৫, অবসর প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার-৭, জেল কর্মচারী-৬, সাংবাদিক-৩০, শিল্পী-১৫, ব্যাংক কর্মচারী-৯, নার্স-১২, উপজেলা ডাক্তার-৪৫, শ্রমিক-২০, লেখক-৫, রাজনীতিবিদ-২৫, ক্লিনিকের মালিক-৬, সরকারী চাকরিজীবী-৭, বেসরকারী চাকরিজীবী-৩০, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ-৬, প্রশিক্ষণরত মানসিক রোগ চিকিৎসক-৮, মনোবিদ (সাইকোলজিস্ট)-৭, খেলোয়াড়-৪, গ্রামবাসী-১০ ও অন্যান্য পেশার-৫৮ জন।

জরীপের ফলাফল থেকে দেখা যায়ঃ উত্তরদাতা ৫২৩ জনই 'মস্তান' শব্দটির সাথে পরিচিত। তাদের মধ্যে মাত্র ১০জন মস্তান বলতে কেবল ফকির, দরবেশ বা সন্ন্যাসী বুঝিয়েছেন।

মস্তানদের আগে গুন্ডা বলতেন এবং এখনও বলেন এমন সংখ্যা ৩৪৬ জন। ৪৫৮ জন উত্তরদাতাই মস্তানকে দেখেছেন, ৫২ জন মস্তান দেখেননি এবং ১৩ জন কোন উত্তর দেননি। উত্তরদাতাদের শতকরা প্রায় ৩৩ জন বিভিন্ন সময়ে মস্তানদের খপ্পরে পড়েছেন। অধিকাংশই বলেছেন মস্তানদের বয়স ২০ থেকে ২৪ এর মধ্যে। তবে ১৫ থেকে ১৯ এবং ২৫ থেকে ২৯ বছর বয়সের পক্ষে অনেকে মত দিয়েছেন। -সাপ্তাহিক বিচিত্রা ২৪/২/৮৯ প্রতিবেদকঃ সুমন মোদক।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

আল হেরা প্রকাশনী